আমার বাল্যকথা

ও

আমার বোম্বাই প্রবাস

(সচিত্র)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য দুই টাকা আট আনা

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

স্নেহের ভগিনী!

তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি—তুমি নাছোড়বন্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তা ছাড়া, আমার বোম্বাই কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত; তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাতে যে সকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সুপরিচিত কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস-সঙ্গিনী হয়ে কত আদর যত্নে প্রবাস যন্ত্রণা যে কি তা আমাকে জান্‌তেই দাওনি;—এই সকল কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায়? তাই ভাই এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

রাঁচী
৫ই আগষ্ট
১৯১৫

তোমার
মেজদাদা

ভূমিকা

'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' সমস্তটাই ভারতী পত্রিকায় প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে বাহির হইয়াছে, এইক্ষণে এই দুই খণ্ড একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে আমার বাল্যজীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত এবং সেই সঙ্গে বোম্বাই মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশের ইতিহাস, পারসী জাতি, জৈন স্বামী নারায়ণ প্রভৃতি গুজরাতের ধর্ম্ম সম্প্রদায়, আর্য্য সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিবরণ অল্পবিস্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সকল লেখার ভাষা সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বলিবার আছে। বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কথিত ভাষার ব্যবহার নানা কারণে দূষ্য বিবেচনা করেন, আবার 'বীরবল' প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন যাঁহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন মত এই দুই প্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভাষারও তারতম্য আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, ভাষাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। পাঠকবর্গ এই তর্কের মীমাংসা করিবেন। আমি গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিচারাসনে আনিয়া এখনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রাঁচী
৬ই আগষ্ট, ১৯১৫

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচী

আমার বাল্যকথা

আমার বোম্বাই প্রবাস

চিত্র-সূচী

আমার বাল্যকথা

ছেলেবেলায় আমরা বাবামহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁসতাম না। তিনি কখন কখনও আমাদের ডেকে ইংরেজি বাঙলায় পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে গিয়ে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম। আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার বেলায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়াবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রত্যহ আমাদের পারিবারিক উপাসনা হ'ত, তাতে আমরা সকলে যোগ দিতুম। আমি মুখে মুখে প্রার্থনা আবৃত্তি করতুম। একটি স্তোত্রমালার পুস্তকে কতকগুলি ভাল ভাল স্তবস্তোত্র সন্নিবিষ্ট ছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু আরও অন্য কারকারও বিরচিত। তার প্রায় সকলগুলিই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ফরাসী ব্রহ্মবাদী Fenelon হ'তে অনুবাদিত যে প্রার্থনাটি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেওয়া হয়েছে সেটিও তার মধ্যে ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের একটি প্রার্থনা ছিল তা এখনো আমার কিছু কিছু স্মরণ আছে। তাঁর ভাষার বিশেষত্ব তা হ'তে স্পষ্ট ফুটে বেরচ্ছে। আরম্ভ এই—

"হে ধ্রুবসত্য সনাতন! কালসহকারে কত বিষয়ের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তোমার অপরিবর্ত্তনীয় অপার কারুণ্য-স্বরূপের কদাচ পরিবর্ত্তন নাই। নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নগর সকল পুরাতন হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, মাস ও পক্ষ অতীত হইতেছে, শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে, বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে কিন্তু তোমার সেই কারুণ্য-স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন নাই, ইত্যাদি।"

তখন ১১ই মাঘের উৎসব খুব ধুমধামে সম্পন্ন হ'ত। বিস্তর লোকজনের সমাগম আর রাত্রে এক বৃহৎ বৈঠকী ভোজ। তাতে আমরাও যোগ দিতুম। সেই একদিন যেদিনে ছোট বড়র কোন প্রভেদ থাকৃত না। ঐ উপলক্ষে একবার একদল মিলে

পলতার বাগানে গিয়ে বড়ই আমোদ আহ্লাদ করা গিয়েছিল; সেদিনের ব্যাপার আমার বেশ মনে পড়ে। ভোজের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন জগমোহন গাঙ্গুলী। লোকটি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ—তাঁর ভুঁড়িটিও অতুলনীয়। এমন সৌখীন আমুদে অথচ কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। খাওয়া, পরা, ওঠা, বসা, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁর কারিগিরি প্রকাশ পে'ত। রান্না বান্না ঘর কন্না—পোষাক সাজ সজ্জা, কারুকার্য্য, ছুতরের কামারের কাজ—সকল কর্ম্মেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা ছেলের দল তাঁর বড় নেওটা ছিলুম—তাঁর ঘরে গিয়ে খেলা করতুম,—তাঁর কাছে গল্প শুনতুম; তাঁর খুঁটিনাটি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে কোনওটা আবদার করে আদায় করতুম;—তাঁর মুখের পান কি মিষ্টি লাগত! তিনি আমাকে উর্দ্দুর প্রথম কেতাব "চাহার দরবেস" শেখাতেন—"সুভান আল্লা ক্যা সানে হ্যায় কি জিসনে এক মটি খাকসে ক্যা ক্যা সুরতে আওর মিট্টিকি মুরতে পয়দা কিয়া।"

তাঁর ভুঁড়িটি আমাদের আদরের সামগ্রী ছিল আর তিনি সকালে যে নাকডাকানী গম্ভীর আওয়াজে দিগ্বিদিক ধ্বনিত করতেন আমরা ভোরে উঠে তাই শুনতে যেতুম। তিনি একপ্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বারপাল ছিলেন। একবার একদল পুলিস ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে বলপূর্ব্বক আমাদের একটা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার যোগাড় করছিল—তিনি একলা সেই গাড়ী ধরে রেখে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। আমাদের জগমোহন সেকালের বীরমূর্ত্তি।

সেই গাঙ্গুলীমশায় পলতার বাগানে আমাদের বনভোজনের আহার সামগ্রী প্রস্তুত করলেন—সে মাছের ঝোল ভাত আর ভুলব না! আমাদের বাহনগুলি সারি সারি চলেছে—৮৷১০টা বোট—আমরা রাত্রিশেষে পলতার বাগানে দলবলে গিয়ে উপনীত হলুম। বোটে আমাদের বিদূষক ছিলেন নবীনবাবু; তাঁর হাস্যপরিহাসে সন্ধ্যাটা খুব আমোদে কেটে গেল। তাঁর বিদ্রূপের বাণ বিশেষরূপে যাঁর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল সে লোকটি বে—বাবু। আমি তাকে হাবু বলব। বাবু শব্দের নবীনবাবু এক ছড়া বেঁধেছিলেন তা হাবুবাবুতে বেশ খেটে যায়—

বাববো বহবঃ সন্তি বাবুয়ানা পরায়ণা হাবুবাবু সমো বাবু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

তিনি একজন কফ্প্রধান লোক—ঠাণ্ডার ভয়ে গলায় সালের গলাবন্ধ ও গায়ে গরম কাপড় জড়িয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে ঝিমচ্ছেন। বোটের ভিতর একপাশে একটা ছোট কাচের আলমারী ছিল। নবীনবাবু যখন হাবুর প্রতি লক্ষ্য করে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব করলেন যে ঐ কাপড়ের পার্সেলখানা তুলোয় জরিয়ে এই গ্লাসকেসে পুরে রাখলে ভাল হয়, তখন আমাদের হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল। পলতায় নেমে আমরা

দলে দলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লুম। প্রধান দুইদল—একদল চড়ুইভাতী রান্নার চারিদিকে, অন্য দলের কেন্দ্র হচ্ছেন—চাটুয্যেমশায়। ভবিষ্যতে তিনি আমাদের একজন পরম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়ত ৪০ পেরিয়ে থাকবে কিন্তু বালকের মত তাঁর ভাবভঙ্গী উৎসাহ কলরব, নৃত্যগীত লীলাখেলায় আমাদের সকলকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর তখনকার গান মনে পড়ছে—

ব্যাটাছেলের (মুখে)* কড়ি সর্ব্বলোকে কয়,
সাহসের কার্য্যে ব্যাটাছেলের পরিচয়।
কলম্বস নাবিক ছিল, সাহসে আমেরিকা গেল,
দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয়।
ব্যাটাছেলে হবে যদি, সাহস কর আজ অবধি,
বিধবা বিবাহে কর আনন্দ উদয়।

উপরে আমি পারিবারিক উপাসনার কথা উল্লেখ করেছি। কোন কোন দিন উপাসনান্তে বাবামশায় আমাদের উপদেশ দিতেন। আমাদের যা কিছু দোষ দেখতেন কোন কোন দিন উপদেশে তার উল্লেখ করে শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে ইংরিজি রকম চাল চলনের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলুম তখন তিনি একদিন দালানে উপাসনার সময় ইংরাজি রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ—অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন—সে উপদেশটি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকবে। বিলেতে থাকতে আমি তাঁকে একবার নাচ-মজলিসে বিবিসাহেবের একসঙ্গে নৃত্য বর্ণনা করে পত্র লিখেছিলুম—তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি সেই রাক্ষসী মায়ায় মত্ত হয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না যাই।

বাবামহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়েছিলেন; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটী পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স—আমি ছিলুম ঘোর Radical.

* কথাটির সামান্য একটি অক্ষর বদল করিলাম।

এই সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পর যতই মতভেদ থাক্ না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক দূর ইচ্ছামত চলতে দিতেন।

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হ'ত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয় মুসলমান রীতির অনুকরণ। অনুকরণ এবং মুসলমান অত্যাচার হ'তে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হ'তে তার উৎপত্তি হ'তে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু-আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হ'ত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম এখন মনে হ'লে হাসি পায়। John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম। বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলা মেশা করছে!— গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন। আমি একবার একটি সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবার মধ্যে অতিথিরূপে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলুম। গৃহে অনেকগুলি কন্যা কুমারী ছিলেন—সমস্ত গৃহকার্য্যে তাঁহাদেরই আধিপত্য। বিদায় নেবার সময় তাহাদের খাতায় স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ আমার হস্তাক্ষর রেখে যেতে অনুরোধ করাতে আমি লিখেছিলুম—

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

তাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীরা পর্দ্দার অন্ধকারে কি খর্ব্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন,—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ,—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবল-ক্রিয়া কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্ব্বপশ্চিমের পরস্পর বিপরীত ভাব আমাদের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হ'ল—পর্দ্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল। কিন্তু তখন ভাল করে দেখতে পেলুম আমার সামনে যে পর্ব্বত সমান বিঘ্নবাধা রয়েছে তা অতিক্রম করা কি কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়। তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে ফিরে এসেছি—বোম্বাই আমার কর্ম্মস্থান নিয়োজিত হয়েছে—বোম্বাই যেতেই হবে, আর আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে

নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তখন আবার কলকাতা ও বোম্বায়ের মধ্যে রেলপথ প্রস্তুত হয়নি—জাহাজে করে যেতে হবে। বাবামহাশয় তাতে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। এখন কথা হচ্ছে ঘাটে উঠা যায় কি করে? গাড়ী করে ত যাওয়া চাই? আমি প্রস্তাব করলুম বাড়ী থেকেই গাড়ীতে উঠা যাক্। কিন্তু বাবামহাশয় তাতে সম্মত হলেন না—বল্লেন মেয়েদের পাল্কী করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা হোক্। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ কর্ম্মচারীদের চ'খের সামনে দিয়ে বাহির দেউড়ি ডিঙ্গিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এ তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হল না। এই ত গেল পর্দ্দা ভাঙ্গার প্রথম অবস্থা। আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজমহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা—তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্য-স্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। এখন এসব কথা গল্পের মতই মনে হয়। এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিষ্কৃত হয়ে এল। ক্রমে আমাদের বাড়ীর লোকেরা (মেয়ে পুরুষ) আমার ওখানে গিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রবাস-যাপন করতে লাগলেন। ওদেশে বোম্বাই মান্দ্রাজে কোথাও বাঙ্গালা দেশের মত মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন ক'রে তাঁদের মনোভাব অনেক পরিমাণে বদলে গেল। পর্দ্দার উচ্ছেদ সাধন আমার যে চিরকালের সাধ তা ক্রমে মেটবার মত হয়ে এল। আমি বোম্বাই থেকে ছুটির সময় মাঝে মাঝে বাড়ী আসতুম—তখন দেখি পর্দ্দার তেমন কড়াক্কড় বাঁধুনি নেই, অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তারপর এখন!

সেকাল আর একাল—কি তফাৎ! কলকাতা সহরের ভদ্র মহিলারা রাস্তা ঘাটে গাড়ীতে মোটরে ইচ্ছামত বেড়িয়ে বাড়াচ্ছেন এ দৃশ্য কারও নূতন ঠেকে না। যা কিছুকাল পূর্ব্বে কল্পনারও অতীত ছিল এক্ষণে তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। সত্যি সত্যিই অন্তঃপুরবাসিনীগণ এখন মেমের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। এতদিনে আমার মনস্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে।

আমি আমার বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে-কালের কথা পেড়েছি সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল। তখন আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার স্মৃতি তারও ঊর্দ্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়; এবার যতটা পারি সুদূর অতীতের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে মনে পড়ে কি না? তার উত্তরে বলতে পারি একেবারে মনে পড়ে না তা নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে তাও নয়। একদিন তিনি আমাদের তিন ভাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু দিয়েছিলেন, দুচারটি হাসির কথা বলেছিলেন, সে ঘরটি মনে আছে আর তাঁর চেহারাও মনে পড়ে, তবে ঝাপসা ঝাপসা। তাঁর যে চেহারা আমার মনে অঙ্কিত আছে তা সে-সময়কার চাক্ষুষ জ্ঞান থেকে কিম্বা তাঁর যে সকল চিত্র আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তার প্রতিচ্ছবি তা ঠিক বলা যায় না—খুব সম্ভব শেষটাই হবে।

কর্তাদাদা যখন আমাদের ছেড়ে বিলাত যাত্রা করেন তখন আমরা নিতান্ত শিশু, সে সব ঘটনা কিছুই মনে নাই। এদেশে যখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আসে তখন আমরা বোটের মধ্যে গঙ্গার উপরে ভাসছিলুম—ভয়ানক ঝড় তুফান উঠেছে আর বড়দাদা হেমেন্দ্র ও আমি মার কাছে ভয়ে জড়সড়,—সেই তুফানের মধ্যে আমাদের একজন ভৃত্য কর্তাদাদার মৃত্যু সংবাদ এনে বাবামশায়ের হাতে দিলে। এই ঘোর দুর্যোগে আমরা পলতার বাগানে নেমে, সেখান থেকে গাড়ীতে উঠে কোন প্রকারে বাড়ী পৌছলুম—পৌছেই দুধ দুধ করে অস্থির। এইটুকু আমার মনে আছে। পিতার আত্মজীবনীতে ঘটনাটির বর্ণনা এইরূপ :—

"আমাদের স্বরূপ খানসামা আমার হাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ আনিয়া দিয়া বলিল, কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমাদের বোট ও পিনিস কালনা ছাড়াইয়া কতকদূর গিয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতার অভিমুখে ফিরিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টি ও বাতাসের কোলাহল। পলতায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। পলতায় পৌছিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এখানে আসিয়া বোট কাৎ হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত জল দাঁড়াইয়াছে, সকলি বৃষ্টির জল। যদি পলতায় গাড়ী না থাকিত তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; একথা আর কাহাকেও বলিতে পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতর গাড়ীর চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতিকষ্টে বাড়ী পৌছিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতর

স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতলায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।" পৃঃ ৬০—৬১

দ্বারিকানাথ ঠাকুর দুবার ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বারে লণ্ডন নগরে ১৭৬৮ শকে (August 1846) তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও অপর একজন আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্ত্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। আমি প্রথম যখন সেই সমাধি মন্দির দেখি তখন তার নিতান্ত ভগ্নাবস্থা, পরে তার জীর্ণসংস্কার হয়েছে। বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় দুই মহাত্মা যাঁরা ঐ সুদূর পশ্চিমে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন যাতে বিলুপ্ত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, একথা বলা বাহুল্য।

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বিলাত যাবার সময় তাঁর অগাধ জমিদারী বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে যান তা তাঁর মনের মতন হয়নি। যে সকল কর্ম্মচারীর উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাঁদের কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কর্ত্তা নিজে তত্ত্বাবধান না করলে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়' এ এক প্রকার ধরা কথা। আমার পিতা যদি তেমন মনোযোগ করে বিষয় কর্ম্ম দেখতেন তাহলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু করতে হ'ত তাই করতেন। কর্ত্তাদাদা তাঁকে লণ্ডন থেকে এই বিষয়ে এক পত্র লিখেছিলেন তার এই উদ্ধৃতাংশ থেকে দাদামশায়ের মনোভাব কতকটা জানা যায়ঃ—

"আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।"*

From Dwarkanath Tagore to Debendranath Tagore
London 19th May 1846.

* It is only a source of wonder to me that all my estates are not ruined. Your time, I am sure, being more taken up in writing for the newspapers and in fighting with the missionaries than in watching over and protecting these important matters which you leave in the hands of your favourite Amlas—instead of attending to them yourself, most vigilantly.—If I was strong enough to bear the heat and climate of India, I should immediately have left London personally to superintend &c.

আমি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্রের উপকূল Worthing নামক বন্দরে গিয়া কিছুদিন বাস করি। উহা আমার নিকট এক প্রকার তীর্থস্থানের ন্যায় মনে হয়েছিল, কেননা ঐখানে আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একমাস কাল যাপন করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন, এ অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক মার্টিনের পরামর্শে রোগ শান্তির জন্যে এই বন্দরে গিয়ে অবস্থিতি করেন। তিনি যে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করি; সাহেবটির নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক খবর শুনতে পাই। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জর্ম্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোট কাকা নগেন্দ্রনাথ আর দূর সম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীনবাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোট কাকার গায়ে এক বহুমূল্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর তাঁর জ্বলজ্বলে কাল' চোখের প্রশংসা সর্ব্বত্র শোনা যেত। তার কথা আর বেশী কিছু জানতে পারলুম না। আমার পিতামহের শরীর শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন—তারপর আহার; তাঁর ভৃত্য হুলির তয়েরি কারি-ভাত আর একটু কমলানেবুর জেলী, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন—Duchess of Inverness রোজ পত্রদ্বারা তার সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (Tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হ'ত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফজল ভাল বাসতেন। দিনরাত তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত প্রিয়ভৃত্য হুলি তাঁর

ম্যাক্স মূলার (৯ পৃষ্ঠা)

শোবার ঘরের বাহিরে শুয়ে থাকত। অনেক সময় তাঁর বিছানার পাশে মাদুরের উপর বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হ'তে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ১৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্টে তিনি পরলোক গমন করেন। *

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাক্সমূলার সম্বন্ধে কথোপকথন

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় প্রোফেসার ম্যাক্সমূলার আমার সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষান্তে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও আমার স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতৃদেব সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলেন।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রেমাকর্ষণ সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে হয়, সে বিষয়ে তিনি বলেন যে, অতি শৈশবকাল হইতে লোকমুখে ভারতবর্ষের নানা প্রকার বিবরণ শুনে তিনি সেটাকে একটা স্বপ্ন-রাজ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রূপকথায় যেমন থাকে যে, যোদ্ধা একদিন হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন অজানা দেশে এক পরমাসুন্দরী কন্যা বন্দিনীভাবে বাস করছে, তাই দেখে যোদ্ধার মন এমন বিচলিত হ'ল যে, কত খোঁজ করে যুদ্ধ করে যতদিন না তার উদ্ধার সাধন করতে পারতেন, ততদিন যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন না; তেমনি ভারতবর্ষকেও তিনি তাঁর স্বপ্ন-রাজ্যের সুন্দরী বলে কল্পনা করতেন। তারপর যখন তাঁর দশ বৎসর বয়স তখন তাঁর ইস্কুলের কপিবুকের মলাটে হঠাৎ একদিন কাশীর স্নানের ঘাটের চিত্র দেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই দিকে চেয়ে বসে রইলেন। চিত্রটী যদিও বিশেষ পরিস্ফুট ছিল না, তবুও সে ছবিখানি তাঁর বেশ মনে ছিল। তিনি বল্লেন, "কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক তখন আমার কতটুকু জ্ঞান ছিল? কেবল এই শুনেছিলাম যে ভারতবাসীরা কৃষ্ণকায়, তারা বিধবাদের জ্বলন্ত চিতায় অর্পণ করে, আর স্বর্গলাভ করবার জন্য জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে

* গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত। Worthing—25th August, 1862.

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু

1st August, 1846.

নিজেদের নিক্ষেপ করে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। আমার কপিবুকের চিত্রে কিন্তু দেখলাম যে তারা বেশ লম্বা এবং সুশ্রী। আর গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দিরাদি অঙ্কিত ছিল তাদের সৌষ্ঠব ও উচ্চ চূড়াগুলিতে এমন একটি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছিল যে, আমার স্বদেশের গির্জ্জা ও প্রাসাদগুলি তাদের নিকট হীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের কল্পনায় মগ্ন হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার শিক্ষক-মশায় এসে কানটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বল্লেন যে, এতক্ষণ কুঁড়েমি করে বসে থাকাব দরুণ আমাকে আরও অনেকগুলি পাতা কাপি করতে হবে। এই তো গেল ভারতের সঙ্গে আমার প্রথম সকরুণ পরিচয়!

"তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। ১৮৪১ সালে আমি যখন লিপ্‌সিগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন আমার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার লক্ষণ দেখা গেল। একদিন শুনলাম যে সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা হয়েছে এবং প্রোফেসার ব্রকহস্ ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবেন। আমি রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করে দিলাম এবং নলোপাখ্যান, শকুন্তলা ও ঋগ্বেদের কতক অংশ পড়তে শিখবার পর বার্লিন ও তৎপরে প্যারিসে সংস্কৃত-চর্চ্চা করতে যাই।

"সেই সময় ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা আমার বড়ই প্রবল হয়েছিল। ইয়োরোপীয় ছাত্রদের যেমন রোম অথবা এথেন্স দেখবার একটা তীব্র স্পৃহা থাকে, আমারও তেমনি একবার ভারতবর্ষ দর্শন করে কাশীর পবিত্র গঙ্গায় স্নান করবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন তাহা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, কারণ একে ত তখন ভারতবর্ষ ছিল ছয় মাসের পথ, তার উপর অধিক ব্যয়সাধ্য। ভারতের মুখ দর্শন করা জীবনে আমার ভাগ্যে ঘটিল না। যৌবনকালে অর্থাভাবে যাওয়া ঘটে নাই, এবং পরে যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুদের দ্বারা বার বার নিমন্ত্রিত হয়েছি, কিন্তু একে বৃদ্ধকাল, তায় নানা কর্ত্তব্য-কর্ম্মে জড়িত হ'য়ে প'ড়ে এই সব ছাড়িয়ে যাওয়া দুর্ঘটন হ'ল। তা ছাড়া শুধু ভারতবর্ষ একবার বেড়িয়ে এলেই তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ত না। অন্ততঃ দুই তিন বৎসর সেখানে বাস করতে না পারলে, ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিখতে না পারলে এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে না পারলে আমার পক্ষে ভারতভ্রমণ বৃথা হ'ত। আমার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো শুধু উপর থেকে নয়, তাহা বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে। কেবল যদি কলিকাতা বা বোম্বাই ঘুরে আসা আমার উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলে তো বিলাতের অক্সফোর্ড বা বণ্ড ষ্ট্রীট একবার বেড়িয়ে এলেই হয়!

"কিন্তু যদিও আমি কোন দিন ভারতে পদার্পণ করিনি তথাপি আমার

সৌভাগ্যবশতঃ য়ুরোপে ভারতের কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও সুযোগ্য সন্তানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অনেকে আমাকে বলেন যে, এই সকল মহৎ-চরিত্র ব্যক্তিগণেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ায়, ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা জন্মেছে; কারণ সর্ব্ববিষয়ের উৎকৃষ্টতা দেখলাম কিন্তু নিকৃষ্টতা কিছু জান্‌তে পারলাম না। আমার মনে হয়—তাতে ক্ষতি কি? ভারতবাসীর চরিত্রের চরমোৎকর্ষ যে কতদূর হইতে পারে তাহা তো দেখলাম। অবশ্য আমি এমন আশা করি না যে, একটা সমগ্র জাতি কেবল রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মালাবারী বা রমাবাইয়ের ছাঁচে ঢালা হবে, কিন্তু তা বলে, যে দেশের মধ্যে থেকে এই সব মহচ্চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশের জাতীয় চরিত্র উপেক্ষা করবাব নয়।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভাবতবাসীরা এমন অবাধে ভ্রমণ কবত না। কালাপানি পার হওয়ার বিভীষিকা তখন খুব প্রবল ছিল; সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থূল পড়ে গেল এবং আমাবও তাঁর সঙ্গে আলাপ কববাব জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসারেব কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'তে বড় বেশী বিলম্ব হ'ল না। প্রোফেসার বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাবপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'ল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হ'লেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তখন তিনি ইনষ্টিট্যুট্-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসাব তাঁকে নিজেব ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জ্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে ফরাসী তর্জ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গুলীগুলি ফরাসী তর্জ্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা! এইগুলি যদি আমি পড়তে পারতাম!' তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হ'ল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন

এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হ'ত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাতে বিশেষ কোন মাধুর্য্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলিতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল যে, গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন, 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হয়নি; আমি ক্রমাগত চর্চ্চা করতে লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জানতে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।

এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন; তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতারণা করে বল্লাম যে, 'আমি শুনেছি যে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি অঙ্কশাস্ত্র হইতে। আমি একবার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা সংস্কৃত খস্‌ড়া দেখেছিলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রোফেসার উইল্‌সন্‌ একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক এবং তিনি বহুবৎসর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন, সেইজন্য তাঁকে

আমি ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা শিখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। তিনি বল্লেন যে, তিনি গান শিখবার জন্য একবার একজন কালোয়াতের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কালোয়াত বলেন যে, ছয়'মাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন করে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে পর তিনি বলতে পারবেন যে এই ছাত্র সঙ্গীত-বিদ্যা শিখবার উপযুক্ত কি না এবং তারপর একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করলে তবে পারদর্শী হ'তে পারবেন। এই কথা শুনে প্রোফেসার উইল্‌সন্ সেইখানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দেখে আমার বড়ই লোভ হ'ত শিখবার জন্য, কিন্তু প্রোফেসার উইল্‌সনের মুখে ঐ কথা শুনে পর্য্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা দমন করতে হ'ল। তোমাদের ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে আর একজন সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছেন—তিনি হচ্ছেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না, তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণকে পোষণ করে আসছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত!' কিন্তু তিনি যে কেবল দেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়—তিনি যাদের নামকরণ করেছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ',—তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাদ্রিকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও পারমার্থিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্ন সহকারে পাদ্রিদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত সংগ্রহ—অনেক সময় আমি ভাবি যে সে খাতাখানির কি দশা হ'ল। তোমার ঋষিপ্রতিম পিতা কখনই সে খাতা লয়ে রহস্য করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ বের করতেন। অবশ্য আমি বলতাম যে, কোন দেশেরই ধর্ম্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে ধর্ম্মের বিচার করা চলে না।

দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্ত্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ

ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা কবতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হ'ল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন!

ইংলণ্ডে বাসকালীন দ্বারকানাথ একটি মহা পুণ্যকর্ম্ম করেন। ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়েব ভস্ম ব্রিষ্টলেব গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল; দ্বারকানাথ সেই স্থানেব উপর সুন্দর মন্দিব নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। হায়! তখন তিনি কল্পনাও করেন নি যে, অল্পকালের মধ্যে তাঁকেও এইরূপ বিদেশে প্রাণত্যাগ করতে হবে।

বেদ

আমাব বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হয় যে, যে দেশে বেদেব এত মাহাত্ম্য এবং যা প্রধান ধর্ম্মপুস্তক বলে গণ্য, সে দেশে কি না আজ পর্য্যন্ত বেদ ছাপানো হয়নি এবং সকলের তাতে অধিকারও নেই, কেবল অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেব নিকট বেদের কতকগুলি খস্‌ড়া আছে মাত্র এবং তাই থেকে কেহ কেহ কণ্ঠস্থ করেছেন। সুতরাং পরলোকগত জে, মিয়োর যখন বেদের একটা সংস্করণ প্রকাশ করবাব জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন, তখন কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করলেন না।

আমি যখন বেদের সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য প্যারিস, বার্লিন ও লণ্ডনের পুস্তকালয়ে বেদের যত খস্‌ড়া আছে, নীরবে সব সংগ্রহ করে, তা থেকে নকল করে ধারাবাহিকরূপে গোছ করিতেছিলাম, তখন দ্বারকানাথ খুব আগ্রহ সহকারে আমার কার্য্যাবলী দর্শন করতেন। ঠিক সেই সময়েই তোমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ চারজন ব্রাহ্মণকুমারকে চতুর্ব্বেদ শিক্ষা করবার জন্য কাশীতে পণ্ডিতদের কাছে পাঠান। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, বুঝি দ্বাবকানাথ আমার বেদ প্রকাশ সম্বন্ধে পুত্রকে কিছু লিখে থাকবেন, এবং তাই থেকে কাশীতে ছাত্র পাঠাবার কল্পনা তাঁর মাথায় আসে, কিন্তু পরে তাঁর কাছে থেকে যে চিঠি পাই, তাতে জানলাম যে আমার ভ্রম হয়েছিল; দেবেন্দ্রনাথের বহুদিন থেকেই এরূপ মানস ছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, কোন ছাত্রই পরে কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারে নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি কখনও তোমার পিতাকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে আমি অনেকগুলি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাঁর দেশের ধর্ম্মোন্নতির জন্য তিনি যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান করেছেন তাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদিও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মবিচ্ছেদ ঘটেছিল, তবু তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

বিদায়কালীন পূর্ব্বকথা স্মরণ করে তিনি বল্লেন, "Oh! I have smoked many a Hookah with your grandfather in Paris!"

কর্ত্তাদাদামশায়ের স্মৃতি যতই অস্পষ্ট হোক্ না কেন, মেজকাকা ও ছোটকাকাকে (গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আমার বেশ মনে পড়ে। তাঁদের মুখশ্রী জীবন্তভাবে দেখছি, তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছি, এখনো মনে করতে পারি। বাবামশায় অনেক সময় বাড়ী থাকতেন না। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাই, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় কোন না কোনখানে ভ্রমণে বেরোতেন। যখন গঙ্গায় বেড়াতে যেতেন তখন কোন কোনবার আমাদের সঙ্গে নিতেন, নইলে বাড়ীতে রেখে যেতেন। মার কাছে আমরা বেশীক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজ কাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রাম-স্থান। বলতে গেলে মেজ কাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন; তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম, তাঁর সঙ্গে তাস খেলতুম, তাঁর কাছ থেকে বেছে বেছে নিয়ে বই পড়তুম—হাতেমতাই, লয়লা-মজনু, নবনারী, আরব্য উপন্যাস, ল্যাম্বস্ টেল, পল ভার্জ্জিনিয়ার অনুবাদ, এই রকম কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল। আমাদের অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চ শিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বাঙ্গালা বেশ জানতেন, তাঁরাই আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিন্তু অন্য সময় যাই হোক্ ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতুম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম জ্বর হ'ত তা ম্যালেরিয়া বলতে পারি না, কেননা তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। জ্বর হ'লেই ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। তাঁর ব্যবস্থা ছিল—প্রথম দিন তেল (Castor Oil) ও তেলের চেয়েও বিস্বাদ জলের সাগু; দ্বিতীয় দিন এলাচদানার মত সামান্য কিছু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত—সেই জ্বরের এই ক্রম ছিল। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাহনগর প্রভৃতি কাছাকাছি গঙ্গার ধারের জায়গা

ও হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি দূরের কোন কোন স্থান স্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হ'ত। এইক্ষণে সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি বলে পরিত্যজ্য। তেমনি আবার কলকাতা এখন জলের কলে, নালানর্দ্দমার সংস্কারে ও আর আর ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নাই; এমন কি, কলকাতাই এক্ষণে পল্লীবাসীদের বায়ু-পরিবর্ত্তনের ও স্বাস্থ্য-অর্জ্জনের প্রধান স্থান বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষায় কলিকাতা ইউরোপেরও প্রধান প্রধান নগরীর সমকক্ষ দেখা যায়। অনেক ইংরাজে বলেন দুই একমাস ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যের হিসাবে কলিকাতার সমতুল্য স্থান ভারতবর্ষে মেলা দুষ্কর।

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটকাকা)

ছোটকাকার কাছে আমরা অনেক সময় যেতুম। তিনি গৌরবর্ণ তেজীয়ান্ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হ'ত, আমরা তাঁকে ভয় করে চলতুম। তাঁর বৈঠকখানায় নানা রকম লোভনীয় জিনিস ছড়ান থাকত। একবার মনে আছে ছোট ছোট ছর্‌রা-ভরা মকমলের কাপড় মোড়া একরকম সর্পাকৃতি কাগজ চাপা তাঁর লেখবার টেবিলে ছিল, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। কাপড় ঢাকার ছিদ্র দিয়ে সীসার গুলিগুলা ঝরে পড়ছে, তাই এক মুঠা কুড়িয়ে নিয়েছিলুম। একটু পরে আমায় তলব পড়ল, চোরামাল শুদ্ধ ধরা পড়ি আর কি! তখন কি করি, সীসার গুচ্ছ মুখে পুরে রেখে ছোটকাকার কাছে হাজির। তার কিয়দংশ গলাধঃকরণ হয়েছিল কি না মনে নাই, আর গেলবার দরুণ পরে কোন অসুখ ভোগ করতে হয়েছিল কি না বলতে পারি না।

ছোটকাকা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেছিলেন।' তিনি সেখান থেকে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন তা দেখে বোধ হয় তিনি সে দেশে বেশ আমোদে ছিলেন, আর তাঁর প্রবাসকালে ইংলণ্ড স্কটলণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করে ব্যাড়াতেন। তাঁর রূপ লাবণ্যের দরুণ তিনি সাহেব বিবিদের, বিশেষতঃ বিবিদের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে স্বদেশে সহজে ফিরতে চাইতেন না। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবু তাঁকে দেশে ফেরবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পত্র লেখেন, তাতে তাঁকে এইরূপে লোভ দেখাচ্ছেন—

"আগামী মাসে অক্সফোর্ড কেম্বিজের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা বিধান উদ্দেশে কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহাতে তুমি প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছামত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বিদ্যার্থীগণ কৃতিত্ব

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৬ পৃষ্ঠা)

দেখাইতে পারিলে উপাধি ও সম্মানের বিবিধ চিহ্ন সকল লাভ করিতে পারিবে। অতএব বাড়ী ফিরিলে তোমার শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিবার যে আপত্তি তার গুরুত্ব অনুভব করিবে না।" (21st September 1846.)

ছোটকাকা সেই সময় তাঁর এক বন্ধুকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে এইরূপ লিখেছেন—

"তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার এখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা নাই, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না। তুমি জান, আমি সাধারণতঃ ইংরাজ জাতিকে ভালবাসি না, তাদের চাল-চলন দুচক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাদের সকল বিষয়ে বণিকবৃত্তি আমি মনের সহিত ঘৃণা করি, তথাপি একটা কি আছে যাহা এই সকল বিরুদ্ধভাবকে খণ্ডন করিয়া দিতেছে; ইংলণ্ড ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে কোন মতেই আমার মন উঠিতেছে না।"

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হ'ল; যেদিন ফিরে এলেন আমার বেশ মনে পড়ে, ছেলেদের সে মহোৎসবের দিন, কেননা তিনি আসবার সময় তাদের জন্যে নানা রকম খেলনা নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ল, আমি একটা কলের ময়ূর পেয়েছিলুম।

ছোটকাকার কাছে অনেকানেক লোক যাওয়া আসা করত—রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র—পূর্বকালের সব খ্যাতনামা পুরুষ—এ সবার মধ্যে তাঁর দুজন মুসলমান বন্ধু ছিল, রজলুল করীম ও রজলুল রহীম। তাঁদের নিয়ে অনেক আমোদ প্রমোদ হ'ত, কখনও বা ইংরাজি মোগলাই মিশ্রিত খানা দেওয়া হ'ত। তার ভাগ আমরাও কিছু কিছু পেতুম। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, তখনকার কালে হিন্দু মুসলমানে যেমন হৃদ্যতা ও মেলামেশা ছিল এখন তা দুর্লভ-দর্শন।

বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরে ছোটকাকা দেখলেন আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি হাউস তখনো বেশ চল্‌ছে। ভিতরে ভিতরে তার যে অসার টলমল অবস্থা তা বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষে সেই হাউস ফেল হওয়াতে তিনি অশেষ ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। এই বিষয় পিতার জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আমার আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন

তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়, এমন কি, ১০০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর একজনের আনুকূল্য করিতেন—তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয়ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল।" (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

তিনি উল্লিখিত নানা কারণে বিলাত থেকে ফিরে এসে অবধি একটা উচ্চ পদের সরকারী চাকরীর সন্ধানে ফিরছিলেন। যে সকল বড় বড় সাহেব তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি ৬ই মার্চ্চ ১৮৫৪ সালে কষ্টম্‌স কলেক্টরের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে পদ তাঁকে অধিক দিন ভোগ করতে হয় নাই। ১৮৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইস্তফা পত্র দিয়ে তাঁর কলেক্টর Young সাহেবকে লিখছেন—

"আজ আমার অবকাশের দিন সমাপ্ত হইল। দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি, গত তিন মাস ধরিয়া আমার বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট মিটাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাতে যদিও অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হইতে পারি নাই। আরো তিন সপ্তাহকাল সময় না পাইলে এই সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া আমার কর্ম্মে ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। আপনি আমার পুনঃ পুনঃ ছুটির আবেদন গ্রাহ্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন; পুনরায় ছুটির দরখাস্তে (একদিনের জন্যও) আপনাদিগকে বিরক্ত করা আমি নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করি, অতএব একান্ত বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার এই চাকরীর ইস্তফা-পত্র প্রেরণ করিতেছি। যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেণ্টের এই চাকরী স্বীকার করি, তখন তাহার বেতনের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল না কিন্তু এইক্ষণে আমার যেরূপ বৈষয়িক অবস্থা এখন তাহাতে আমার ঔদাসীন্য করা ঠিক হয় না। আমার এই যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিজের দোষে নয় কিন্তু আমার স্বর্গগত দাতার ঋণভার আমার উপরে পড়িবার দরুণ আমি একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় সেই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন।"

Young সাহেব এই পত্রের উত্তরে লেখেন—"তুমি লিখিতেছ যে তিন সপ্তাহ সময় পাইলে তুমি তোমার পাওনাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইতে পার। তা যদি হয় তাহা হইলে আমার পরামর্শ এই যে একেবারে ইস্তফা না

দিয়া তুমি আর এক মাসের অবকাশ প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত কর; উত্তর পাইলে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবে। আপাতত আমি তোমার এই ইস্তফা-পত্র গবর্ণমেণ্টে না পাঠাইয়া আগামী কল্য পর্য্যন্ত তোমাকে মনঃস্থির করিবার সময় দিতেছি।”

কলেক্টর সাহেবের পরামর্শ অনুসারে ছোটকাকা কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কয়েক মাস পরেই দেখা যায় তাঁর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও স্বাস্থ্যলাভ-মানসে তিনি বোম্বাই নাসিক ইন্দোর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হন।

কলিকাতা হ'তে বিদায় নিয়ে তিনি বিদেশ থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের যে সকল পত্র লিখেছিলেন তা হ'তে তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তটাই পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এই :—

বোম্বাই, ১০ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

তিনি সমুদ্র-পথে দিয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই পৌঁছিয়া Elephanta ও সালসেটের গুহামন্দির ও অন্যান্য হিন্দুকীর্ত্তি দর্শন করিয়া তলঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পিম্পলগামে উপনীত হন।

পিম্পলগাম, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৬

“মারওয়াড় প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতেছি—এই দেশ রাজপুতবীর ও বীরাঙ্গনাগণের রঙ্গভূমি। কিন্তু হায়! সে সব কীর্ত্তি কোথায়? যাইতে যাইতে মনে হইতেছে, “'Tis Greece but living Greece no more”—গ্রীস বটে কিন্তু সে জীবন্ত ভাব তাহাতে নাই।

পরে তথা হইতে নাসিকে উত্তীর্ণ হইলাম, যাহা শিবাজীর অযোগ্য প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বাসস্থান। সঙ্গে কোন ভৃত্য নাই, বন্ধু নাই, মনে অশান্তি, শরীর অপটু এই অবস্থায় ডাঙ্গা পথ দিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারিব এরূপ আশা করি নাই।”

মালেগাম, ২১এ ডিসেম্বর

“চান্দোর দেখিলাম। অত্যুচ্চ পর্ব্বত পরিবৃত মনোজ্ঞ দুর্গম স্থান। যে সকল প্রদেশ মরাঠী ও পিণ্ডারী যুদ্ধে ব্রিটিষ সৈন্যের গোলাগুলি বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা অন্যতর, ইহার গাত্রে সেই ক্ষতচিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান। রাজবাটী (রঙ্গমহল) দর্শন করিলাম। ইহার ভিতর প্রথম হোলকারের গদী রক্ষিত আছে, একটি সামান্য কঠোর গদা, সেই অশ্বারোহী বীরসেনার যোগ্য আসন বটে। চান্দোর ত্যাগ করিয়া দিনের আলো থাকিতে থাকিতে তলঘাটের শোভা সন্দর্শন করিলাম। চারি-দিকে পাহাড় শ্রেণী - কি চমৎকার দৃশ্য! এই পর্ব্বতমালার উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার নির্ম্মাণ কৌশল কি আর বর্ণন করিব—যে কারিগরের ইহা মনঃকল্পনা তাহার

প্রতিভা স্মরণ করিয়া দিতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির উপরে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে। ঘাট হইতে নামিয়া দেখি উপত্যকা ভূমির দৃশ্যও অতি মনোহর—শ্যামল শস্যক্ষেত্রে যেন মখমল বিছাইয়া দিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ কুঞ্জবন আবার বিহঙ্গদলের মধুর গানে প্রতিধ্বনিত—এ সকলি যারপর নাই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ভাই সে যাহাই হোক্, বাড়ীর দিকে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে—মনে হইতেছে আমার সেই কোণের ঘরটি পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে সেরা।”

ইন্দোর, ২৮এ ডিসেম্বর

ইন্দোর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তলঘাটের শোভা সৌন্দর্য্য পুনর্ব্বার উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন, “আমি Alps পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার উপর দিয়া যে পথ কাটিয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসাযোগ্য, তবুও এই গিরিপথের নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়। এই সকল পথ দিয়া ভ্রমণ করা অতিশয় শ্রান্তিজনক। আমি বাল্যকাল হইতে ভ্রমণে অভ্যস্ত না হইলে এতটা কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম না।”

তাঁর আর এক বন্ধুকে লিখিতেছেন—“আমি ইন্দোর সহর দেখিলাম। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই। রাস্তা ঘাট পাথরে বাঁধান, ভাল স্প্রিঙের গাড়ীর পক্ষে একেবারে অচল। ঘিঞ্জী সহর, বাজার যেমন আমাদের বড় বাজার, সরু সরু গলী, ময়লা ধূলিময়, ঠিক আমাদেরই পুণ্য নগরীর অনুরূপ। রাজপ্রাসাদে গিয়া সমস্ত দেখিলাম; ছোট ছোট ঘর, সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, ঠিক যেন একটি কয়েদখানা। দেখিবার মধ্যে সুবিখ্যাত অহল্যা-বাইয়ের সমাধি মন্দির, প্রস্তর নির্ম্মিত, নানা মূর্ত্তি খোদিত, ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক সুন্দর ও প্রশংসনীয়। আমার ভ্রমণকালে আমার দেশীয় লোকেরা আমাকে যে আদর যত্ন করিয়াছে তাহা কখনও ভুলিব না।” (To Jadub Kissen Sing.,)

আগ্রা, ৫ই জানুয়ারি ১৮৫৭

“ইন্দোর হইতে যখন তোমাকে পত্র লিখি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আগ্রায় আসিয়া আমি এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িব। আসল কথা হচ্ছে, এ সকল স্থানে ব্যাড়াইবার আরাম নাই, রাস্তা ঘাট দুর্গম, গাড়ীর ঝাঁকানি, আবহাওয়াও পীড়াদায়ক। এই শরীর লইয়া কোন রকমে যে আগ্রায় পৌঁছিয়াছি হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এই আশ্চর্য্য! সাত দিন সর্দ্দি কাশীতে শয্যাগত ছিলাম—গলার আওয়াজ বন্ধ, অস্ত্র করিতে হইল। এখন একটু ভাল হইয়াছি, কল্যই কলিকাতার অভিমুখে রওয়ানা হইব। আগ্রায় আসিয়া তাজ দেখিয়াছি—আমার যে এতটা পথের কষ্ট—এত অর্থব্যয় এই তাজ দর্শনে তাহা সার্থক বোধ হইতেছে।”

১৮৫৪ সালে ছোটকাকার বিবাহ হয়। যখন তিনি ‘তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা’ যশোহরের

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২১ পৃষ্ঠা)

একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেন তখন আমার বয়ঃক্রম ১২ বৎসর—ঘটনাটি আমার বেশ মনে পড়ে। বিবাহের পর তাঁহার বৈলাতিক বন্ধুরা তাঁহাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন। Duke of Inverness লিখিতেছেন—"আমি ইংলণ্ডে তোমাকে অতি বালক দেখিয়াছিলাম—ইহার মধ্যে তোমাকে বিবাহিত বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না। তুমি যে আমাদের দৃষ্টান্তে এক পত্নী লইয়াই সংসার করিবার মানস করিয়াছ, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়, কেননা বহু বিবাহে গৃহ অশান্তির আলয় হইয়া উঠে, নিদান আমার তাই বিশ্বাস।"

বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন ও কি কারণে পদত্যাগ করলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কর্ম্মে ইস্তফা দিয়েই দেশভ্রমণে বাহির হন—কিন্তু সেই ভ্রমণে তার শরীর শোধরান দূরে থাক্ তিনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত রোগগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। এই যে তাকে রোগে ধরল তার হস্ত হ'তে তিনি আর মুক্ত হতে পারলেন না। এই জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন শরীরে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর উপর দিয়ে কত ডাক্তারী হাকিমী চিকিৎসা পরীক্ষিত হ'ল কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। একজন হাকিম মুক্তাচূর্ণ ঘটিত এক বহুমূল্য ঔষধ প্রস্তুত করে আনে ও তিনি সেই ঔষধ সেবন করেন কিন্তু তাহার মূল্যের অনুরূপ গুণের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। তাঁর সেই পীড়িত অবস্থায় আমি তাঁর সঙ্গে এঁড়েদহ বাগানে কিছু দিন বাস করেছিলুম, ক্রমে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি হ'তে লাগল। তার শরীর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে এল, অবশেষে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হ'লেন।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজকাকা)

মেজকাকা মহাশয় সুরসিক অমায়িক সৌখীন পুরুষ ছিলেন। যেন বিলাসিতা মূর্ত্তিমান। তাঁর সখের বাগানটি ফলে ফুলে সুশোভিত—আঙ্গুর বাতাবী নেবু পীচ প্রভৃতি বাছা বাছা ফল, আর চম্পা চামেলী মালতী, বেল জুঁই রজনীগন্ধা গোলাপ বকুল কত রকম সুগন্ধ ফুলের গাছ। একটি ছোটজাতের জুঁই ফুলের ব্যাড়া ছিল, রোজ বিকেলবেলা সেই সব জুঁই ফুল আমরা রাশি রাশি কুড়িয়ে আনতুম। যেমন কলাবিদ্যার প্রতি তেমনি বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক Experiments নিয়ে আমোদ করতেন ও আমাদের ডেকে আমোদ দিতেন। রাসায়নিক বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রদর্শনের মধ্যে যা মনে আছে তা হচ্ছে Galvanic Battery'র প্রয়োগ, তাড়িতপ্রবাহযোগে আমার যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হ'ত সে সহজে ভোলবার নয়।

সে সব বৈজ্ঞানিক ভেল্কীবাজীতে আমাদের খুবই আমোদ হ'ত। যেমন বিজ্ঞানে তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও মেজকাকার গতিবিধি ছিল। তিনি যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি শিখেছিলুম—সে এই :—

ললিত

দুখে গেল সুখনিশি প্রাণনাথ কৈ এল
সুখের শয়ন আজ নয়নজলে ভেসে গেল।
আকাশেরি শোভা তারা, আকাশে মিশাল তারা,
রমণীর দুখতারা সুখতারা প্রকাশিল।

মেজকাকা "বাবুবিলাস" নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তার মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল সেই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা। 'কামিনীকুমার' বলে তার একখানি পদ্যোপাখ্যানেরও সেকালে বেশ আদর ছিল।

মেজকাকার সব দিকেই চৌকোষ বুদ্ধি ছিল। বিষয়কর্ম্মে তাঁর যে দক্ষতা মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে তাঁর কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে দীননাথ ঘোষালের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি আমাদের ভারী প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁকে হাতের কাছে পেলে তাঁর কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প আদায় না করে কিছুতেই ছাড়তুম না। তিনিও কথক ঠাকুরের মত গল্পের ঘটায় আমাদের মনোরঞ্জন করতেন। রামায়ণ ও মহাভারত ছেলেবেলায় এইরূপ মুখেমুখে শুনেই আমাদের এক রকম শেখা হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা)

ছেলেবেলায় বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মেশবার অধিকারী ছিলেন না। বড়দাদা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাঁর ছবি-আঁকার নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়—কিন্তু হায়! এই দুই বিদ্যার কোনটিই তাঁর জীবনে স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী হ'ল না। তাঁর বাল্যকালের কবিত্বোচ্ছাসে দুইটি কাব্যবস্তু প্রসূত হয়—মেঘদূতের পদ্যানুবাদ ও স্বপ্নপ্রয়াণ; তা ভিন্ন গুম্ফাক্রমণ কাব্য * ও অন্যান্য ছোটখাট কবিতা অনেক আছে

---

* পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী ভারি ভারি, গোঁপের সেবা করি সুখে বিচরে॥

৺ রাজনারায়ণ বসুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কাব্য রচিত হয়।

না সেই সময়কার ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি জানি কি কারণে, বাগ্‌দেবী চপলা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর নিকট হ'তে সহসা অন্তর্ধান হলেন, বড়দাদা কাব্যামৃতপান হ'তে বিরত হয়ে তত্ত্ববিদ্যানুশীলনের দুরূহ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন হ'লেন, চিত্রকলার চর্চ্চাও ঐখানে থেমে গেল। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সৌখীন কলা তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসল—বাক্সরচনা প্রণালী, আর রেখাক্ষর বর্ণমালা। এতে এত সময় নষ্ট করা হ'ল কেন? জিজ্ঞাসা করলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নয়, এ দুই বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। লিখতে বসলে লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখবার বাক্স, পকেট বই—এই সকল সামগ্রী আগে থাকতে সংগ্রহ করতে হয়—তাই লেখাপড়ায় দিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে বড়দাদা লেখবার জিনিস তয়েরির কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাগজের কারুকার্য্য, অন্যদিকে লিখনপ্রণালী সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করে রেখাক্ষর বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। সাহিত্য ব্যবসায়ীর যাতে সময় সংক্ষেপ হয় তাই উদ্দেশ্য। এই দুই সখের বিদ্যায় তার বিস্তর সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হ'ল। এই দুই বিদ্যা যদিও সামান্য তবু বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়সহকারে তাদের আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। তার জন্যে চিন্তা শিক্ষা ও সাধনা যা কিছু প্রয়োজন কিছুই বাকী রাখেন নাই। বাক্সতত্ত্বের জন্য সমুদায় গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তার কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে। সেই নব গণিতশাস্ত্র বারংবার সংস্কারের পর এইক্ষণে কোন এক আমেরিকান পণ্ডিতের হস্তে সমর্পিত হয়েছে, পরীক্ষার ফল কি হয় দেখবার জন্য বড়দাদা পথ চেয়ে আছেন। এই ত গেল বাক্স-প্রকরণ। রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশল ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্য্যাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এই রেখাক্ষর পদ্ধতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে—এ বিষয় কেহ জানতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর কোন ছাত্র রেখাক্ষর লেখায় এ পর্য্যন্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। এখনকার সময়ে কোন সুনিপুণ রেখাক্ষর-লেখক পেলে আমরা অনেকে ভাগ্য মনে করি।

আমি বাল্যকালে রেখাক্ষর লিখনপদ্ধতি অভ্যাস করি নাই, কেবল নিজের সঙ্কেত লিপিতে টুকে নিয়ে অনেকানেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হ'তে পিতৃদেব যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বলবার সময় আমি অমনি নোট করে নিতুম, পরে অবসর মতে বিস্তার পূর্ব্বক লিখে দিলে তিনি সংশোধন করে ছাপাতে দিতেন, পর সপ্তাহে সেই ছাপা কাগজগুলি উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হ'ত—

সেইগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন; নূতন নূতন বক্তৃতা, নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রাহ্মসমাজে যেন নবজীবন সঞ্চার করেছে। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে ও আমার পিতা বাঙ্গলায় উপদেশ দিতেন। পিতৃদেবের প্রদত্ত উপদেশগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই লিপিবদ্ধ ও পরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমি ইংলণ্ড যাবার পর পিতৃদেবের বক্তৃতা তুলে নেবার কাজে হেমেন্দ্রনাথ আমার স্থান অধিকার করেন।

বড়দাদা আর আমি দুজনে মিলে কোন কোন সময় গান রচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি আমাদের যুক্তরচনা, কতক বা আমাদের নিজস্ব রচনা।

তা ছাড়া বড়দাদা অনেকগুলি ভাল ভাল হেঁয়ালি রচনা করেছিলেন। তার অনেক ভুলে গিয়েছি; দু একটি যা মনে আছে তা এই:—

১। বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সবে যায় বাঁধা
শেষ দু অক্ষরে আর সবে যায় বেঁধা;
সবটাতে দুই পারে—বেঁধা আর বাঁধা;
মূর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা।—(রসিক)

২। বল দেখি দুটি ফল,—
তার ভিতরে পাওয়া যায়
ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সকল।—(বেল-কুল)

৩। ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর,
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয় অক্ষর,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথা জানায় আপত্তি,
সবতাতে ঘাড়নাড়ে, বিষম বিপত্তি।
দু অক্ষরে ফল এ কি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই।—(নোনা)

বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের অনেক ঘরাও কথা তাঁর কবিতার মধ্যে স্থান পেত। তিনি তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে আমাদের ভাইদের এইরূপ বর্ণনা করেছেন:—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

পণ্ডিত মহাশয়।

যখন উপর হতে প্রচণ্ড পণ্ডিত
ডাকিতে লাগিল হ'য়ে বিষম কুপিত,
হাসিখুসি ঘুরে গেল তখন সবার
দল সাথে ম্লান মুখে চলেন সদ্দার।
পণ্ডিত মুহূর্ত্ত পরে আইল সেখানে।
চসমা বাহির ক'রে পরে সাবধানে ॥
খসিবার ভয়ে তাহা পরিল কসিয়া,
তার পরে যুক্ত করে লইল বসিয়া।
শিষ্য'দের আরম্ভিল পরে শিক্ষা দিতে;
ভূত পালাইয়া যায় কথার ভঙ্গিতে!
"এস দেখি তোমাদের দেখি একবার।
তোমাদের সঙ্গে হ'ল পেরে ওঠা ভাব।
আজ কাল তোমাদের অনিয়ম ভারি,
বাবুকে না বলে আর থাকিতে না পারি ॥"
"ভারি নাকি অনিয়ম" ছাত্র এক কয়।
পণ্ডিত হাসিযা বলে "অনিয়ম নয়?
লজ্জা করে না তোমার বলিতে ও কথা?
পড়া শুনা ত্যাগ করি ছিলে সব কোথা?
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে ব্যালা?
ছি ছি ছি বিদ্যার প্রতি এত অবহেলা।
যাও প'ড়ে কাজ নাই, কর গিয়ে খ্যালা।"
এই ব'লে ঘাড় ধ'রে দিল এক ঠ্যালা ॥
কৈলাস মুখুয্যে ছিল ব'সে এক কোণে,
মুচকি মুচকি হাসি সব কথা শোনে।
একজন চুপে কহে "হাসিছ যে বড়?"
কৈলাস ইঙ্গিতে কহে "কর্ত্তা খ্যাপা বড়!"

তেতালায় দুপুর রাত্রি।

গভীর নিশীথ মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে মজে চরাচর ॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ ॥

শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছপালা ঝোপে ঝাপে লুকায় আঁধার ॥
কে কোথায় পড়ি আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই ॥
কীটপতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,
পঞ্চভূত মাঝে বায়ু শিশির শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছয়ে জীবের লক্ষণ ॥

বরাহনগর উদ্যানে।

নিশি অবসান প্রায়, সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে, মঙ্গল আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে ॥
দ্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেলা
হর্ম্ম্য হ'তে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
সনমুখ দিয়া সিন্ধু পানে ॥
শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়
কেবা তার দুরবস্থা দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে ॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
ঝোপ ঝাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময় ॥
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখা,
পশ্চিম দিগন্তে নভসীর।
গাছে গাছে একাকার, মাঝে মাঝে রহে আর
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥
শাখা পত্র দুলাইয়া, জলপুঞ্জ ফুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে,
'আহা কি সুন্দর এই স্থান ॥

শান্তি নিকেতন।

শান্তি নিকেতন, শান্ত সুশোভন,
সুভদ্র হরিত ক্ষেত্র শ্যামকান্ত নিভৃত কানন।
বিমল শোভায়, সরোবর ভায়,
নভশ্রীর বনশ্রীর স্বচ্ছ দরপণ॥

আমি যে পণ্ডিতেব নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদা তার কাছে পড়তেন না,—তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত, 'বহুবিবাহ' নাটক রচয়িতা। তাঁর শিক্ষাগুণে বড়দাদা সংস্কৃতকাব্যে শীঘ্রই ব্যুৎপত্তি লাভ কবেছিলেন। সংস্কৃত পদ্যে একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তাঁর সেই সময়কার রচনা। তাব কয়েকটি শ্লোক আমার যা মনে আছে তা এই:—

কলিকাতা।

ইংরাজ রাজরাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতং
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্ত্তি তৎ।
পয়ঃ পূরপ্রবাহিন্যা গঙ্গয়া পুণ্যসঙ্গয়া
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিনীব সা।
রথ্যা রম্যাঃ সুগম্যাশ্চ যত্র ভান্তি সহস্রশঃ
দৃতিপাত্রগলদ্বারি-নিবারিতরজশ্চয়া
শতঘ্নীশতযুক্তেন দুর্গেণ দুগ্র্হারিভিঃ
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাজাল সৈন্যশস্ত্রাস্ত্রশোভিনা।
ত্রিলোক বিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে

সুবিস্তীর্ণা রাজধানী কলিকাতা কিবা সাজে।
পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যায়,
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনীসম ভায়।
সুরম্য সুগম্য যথা শত পথ ব্যাপি রয়,
চর্ম্মপাত্র গলদ্বারি ধূলিরাশি নিবারয়।
শত শত তোপযুক্ত দুগ্র্হ দুর্গ রক্ষিত,
উদ্যৎ বিদ্যুৎপ্রভাসম সৈন্যাস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত॥

বড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙলা কবিতা রচনা করেছেন, তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি:—

প্রভাত বর্ণনা।

বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে,
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে।
মত্ত মধুপায়িদল আইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী।

টঙ্কাদেবী।

ইচ্ছা সম্যক্ জগ দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।

মন্দাক্রান্তা

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা।

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না। ১

পিতা মাতা ভ্রাতা নব শিশু অনাথা হুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কুর্ত্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্গারে মুহুর মুহু ধূমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি। ২

বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে ফিমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে। ৩

ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগ তনু দেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
ছুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে। ৪

শিখরিণী

(বেথাক্ষর বর্ণমালা হইতে)

বসন্ত

মধু ঋতু এল ধরণী মাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে ॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর ॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায় ॥
মধু মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুন্ গুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে পিক ॥
ফুলের কে পায় কূল কিনারা
অগণন যেন গগন তারা ॥
তরো তরো ফুল রঙ বেরঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ
কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা গন্ধে মাতায়ে তোলে ॥
কদম ছড়ায় কনক রেণু
রাখাল যথায় বাজায় বেণু ॥
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চল আর না আজি ॥

কৃষ্ণের বিরহে।

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে
শুষ্কমুখ রাধিকার দুঃখে বুক ফাটে ॥
আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার,
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর ॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি,
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি ॥
কালিন্দীর কূলে ব'সে কাঁদে গোপনারী,
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী ॥
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে,
সিন্ধি কাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥

মুখ-হস্তের অভিন্নতা।

মুখে হাতে ভেদ নাই সাক্ষী তার তিন।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ ॥
ভুজঙ্গের মুখখানি (বর্জিয়া দাঁত)
কি সুন্দর মনোহর সুকোমল হাত ॥
সাপুড়ের তুর্শ্মি যবে বাজে ঘুরি ঘুরি।
কেমন ঘুরায় হাত গোখুরা গোখুরী ॥
হাতের কায়দা দেখি সবে বলে "বা জী !"
শেখ্যাও করিতে কিন্তু কেহ নহে রাজী ॥
বিহঙ্গের চঞ্চুহাত কম নহে বড়।
ছলা-কলা না জানুক কাজে খুব দড় ॥
কেউটে গোখুরা আদি মহা মহা ফণী,
সারসের চঞ্চুহাতে ধোঁড়া যায় বনি।
হস্তীর হস্তটি এ যে মুখেরই লেজুড়,
জানে না অবোধ লোকে তাই বলে শুঁড় ॥
খগে নাগে সাক্ষী মানি লেখে তাই শাস্ত্রে—
ভেদ নাই মুখে হাতে, দশনে নখাস্ত্রে ॥

মনুয়া।

জাতিতে যদিও বনের টিয়ে
রতন মানিক মনুয়াটি এ ॥
ছার কোয়েলিয়া ছার পাপিয়া।
মনুয়াটি মোর লাখ রুপিয়া ॥
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ।
গাহে রসভরে চাহে যা জিউ ॥
কাণে যাহা শুনে দু একবার,
মন থেকে তা নড়ে না আর ॥

পেন্সিল-প্রকরণ।

লেখনী গুজিয়া কাণে পেন্‌সিল্ ধর।
এখন লেখ' যা বলি—লেখ "হর হর" ॥
পেন্‌সিল্ করিতে হয় অত কি ছুঁচালো ?
অতিসূক্ষ্মে কোন কাজ উতরে না ভাল ॥
সহজ মধ্যম সুরে বাঁধিবে সেতার।
সপ্তমে বাঁধিলে হবে সামলানো ভার ॥
বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জিল।
না সরু না মোটা করি কাটিবে পেন্‌সিল্ ॥
রেখাক্ষর হবে তবে আজ্ঞার অধীন।
চাপ দিলে মোটা হবে— ঢিল দিলে ক্ষীণ ॥
পেন্‌সিল্ খণ্ড তোমার মাসেক দুমাস—
নলপত করিয়া চলিবে যেন হাঁস ॥
কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধা,
অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা ॥
ঐ জন্তুটির মত মাস চারি খাটি
নূতন পেন্‌সিল্ দণ্ড লবে যবে কাটি'
তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ ॥

সাধন পদ্ধতি।

কেমনে পাকাবে হাত শুন সাবধানে ;
শিষ্য জুটাইয়া আনি মন্ত্র দিবে কাণে ॥

শিষ্যটিরে কাছে ডাকি সম্ভাষিয়া মিষ্ট
সারস্বত যোগাসনে হ'য়ে উপবিষ্ট—
লেখনী করিয়া হাতে সাজিবে লেখক,
শিষ্যটি হইবে আর উত্তর সাধক ॥
আউড়িবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র।
তুলিতে থাকিবে তুমি ছত্র পিছু ছত্র ॥
ছিটা ফোঁটা দিবে না রেখাই যাবে টানি।
সঙ্গ গুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাণী ॥
রেখার পোকামাকড় কৃমি বিটকাল,
উচ্চিংড়ি ফড়িং পিঁপড়া পালে পাল,
ক্ষান্ত হোক রোসো আগে করি কিলিবিলি ;
ধীরে সুস্থে কোরো শেষে ফুটকুনি বিলি।
এক মেটে করিয়া করিবে কাজ দ্রুতে।
দো মেটে করিবে শেষে অবকাশ-মতে ॥

সিদ্ধিলাভ।

প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাকাইবে হাত।
দ্বিতীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাত॥
মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার।
হস্তকে করিবে তার তুরুক সোয়ার ॥
হইবে লেখনী ঘোড়-দোউড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া ॥

বড়দাদা গদ্যেও প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সমস্ত একস্থানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাঁর গদ্য-লেখা সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—দার্শনিক ও সামাজিক। তাঁর সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে অনেককালের কথা, গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস ধ'রে 'গীতাপাঠ' নামক যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী' মাসিকপত্রিকায় আমরা ঔৎসুক্যসহকারে পাঠ করেছি—গীতাশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব্ব মৌলিক ব্যাখ্যা—এটি সম্পূর্ণ অবয়বে যখন বেরবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। 'তত্ত্ব-বিদ্যা' হ'তে আরম্ভ করে এই 'গীতাপাঠ' যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য করা যায়—এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার

লিখিত বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, যেমন "সারসত্যের আলোচনা", "বিদ্যা এবং জ্ঞান", "হারামণির অন্বেষণ", "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ", "বিবৃতিবাদ" (evolution), "বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত" ইত্যাদি—এদের কতক ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কতক বা সাময়িক পত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। উহাদের মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ—হয়ত কোন একটা বিষয়ের অবতারণা করে তার আদ্যোপান্ত লিখে শেষ করা হয়নি, কোনটা অর্দ্ধাঙ্গ, কোনটা বিকলাঙ্গ, ভগ্নাবস্থায় অমনি পড়ে আছে—এ সকল ভাল করে দেখে শুনে গড়েপিঠে নেওয়া আবশ্যক। দার্শনিক ছাড়া সামাজিক প্রবন্ধও অনেক এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, যেমন সোনার কাটি রূপোর কাটি, আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা, একটি প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। বড়দাদার এই লেখাগুলি উদ্ধার হয় আমার অনেকদিনকার সাধ—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই রইল—তা পূর্ণ হবার কোন পন্থা দেখছিনে। আসল কথা হচ্ছে—এ ভার নেয় কে? দুটি লোক আমার মনে হচ্ছে—তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধীমান্ সুধীন্দ্রনাথ এবং পৌত্র শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ, এঁরাই এই ভারগ্রহণের অধিকারী এবং উপযুক্ত-পাত্র। উভয়েই সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যজগতে স্বনামখ্যাত,—উভয়েরই সময় আছে, সামর্থ্য আছে, এই কার্য্যে যা যা চাই সকলি আছে—এঁরা বড়দাদার লেখা-গুলির সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ। এ অনুরোধ কি ইঁহারা রক্ষা করবেন না? সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বহুমূল্য রত্নগুলি প্রলয়সাগরে ডুবিতে দেওয়া কি লজ্জার কথা নহে?

পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার যে একটি মাধুর্য্য, প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তাঁর লেখাসকল যে পর্য্যন্ত নিরক্ষর সামান্য লোকেরও বোধগম্য না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাই কখন কখন আমরা দেখতে পেতুম তাঁর বড় বড় লেখা, যার কিছুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নেই এমন লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উৎসুক—তাদের না শুনিয়ে তৃপ্ত হ'তেন না। যদিও তারা শোনবামাত্র ভাবগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। আমাদের একটি পুরাণো দাসী (শিশুকালে যে আমাকে মানুষ করেছিল), আমরা সকলে তাকে 'কাল' দাই' বলে ডাকতুম—বড়দাদা তাকে তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' থেকে একটি কবিতা শোনাচ্ছিলেন; তার কানে তা ঠাকুর দেবতার কথার মত কি যে সুধামাখা মিষ্ট লাগল সে ভক্তির সহিত গড় হয়ে প্রণাম না করে আর থাকতে পারলে না।

বড়দাদার কাছ থেকে কার্যাগতিকে অনেক দিন পৃথক্ হয়ে পড়েছি কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিলুপ্ত হবার নয়। সে ভালবাসা, সেই অট্টহাস, শিশুর ন্যায় সেই সরল অন্তঃকরণ, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুরাণো সে দিনের সে সব কথা কি কখন ভোলা যায়? 'তে হি নো দিবসাগতাঃ'—সত্য কিন্তু মনোরাজ্যে সে সব দিন চিরদিনই জ্বলন্ত রয়েছে। আমাদের সেকালের দুএকটি ঘটনা মনে হচ্ছে। বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় অকারণে; চসমা খুঁজে পাচ্ছেন না তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজের পকেটে—পকেটে বলাটাও ঠিক হ'ল না, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। এদিকে এক হাতে যেমন তিরস্কার, পরক্ষণে অন্য হাতে তেমনি পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণের কাজ চলেছে, কালীও এই গালি গালাজ চড়টা চাপড়টায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছে।—বড়দাদার ভোলা স্বভাবের দরুণ যে কত লোকে বিপদে পড়ত তার ঠিক নেই। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ান দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে কখন তার জন্যে খাবার আসে—এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।—একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে—অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পীঠ চাপ্ড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন। বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যেমন সাধু তুকারামের কথা শোনা যায় সেই রকম। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউল খাকী আয়না ঠোকরাণী' এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই কিন্তু কাককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৫ পৃষ্ঠা)

বিরক্ত হয়ে একটা দাঁড় কাককে মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন সে কাক যথাসময়ে তাঁর মজলিসে হাজির নেই। এই দেখে হুলস্থুল বেধে গেল! সে কোথায় খোঁজ্ খোঁজ্। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান হ'ল, তারা ছাখে সে কাক কোন্ একটা দূরের গাছে বসে আছে—তাকে আনিয়ে বড়দাদা তবে সুস্থির।

বড়দাদার যা নিত্য নিয়মিত প্রাতঃস্নান ঠাণ্ডা জলে—তা চিরকালই সমান চলছে—শীতে গ্রীষ্মে রোগে অরোগে তার আর বিরাম নাই। তাঁর জ্বর কি কোন অসুখ হ'লে সেই স্নান বন্ধ করবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা অনুনয় বিনয় করা যায় কিন্তু ভোরে উঠেই সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। ঠাণ্ডার বদলে গরম জল কোন কালেই তাঁর মনোনীত হয় না। বড়দাদাকে ব্যামোর সময় ঔষধ পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাঁর লেখায় মগ্ন হয়ে তিনি অনেক সময় আহার নিদ্রার নিয়ম ভুলে যান—এই বয়সে তাঁর শরীরে আর এ অত্যাচার সহ্য হয় না। এখন শরীর সেবায় বিশেষরূপে মনোযোগ দেবার সময় এসে পড়েছে। তিনি নিজেই তা বুঝতে পেরেছেন;—এক একবার বলেও থাকেন—আর না! কিন্তু কাজে এ কথার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা)

ও-বাড়ীর মেজদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর কোন প্রভেদ ছিল না, আমরা তাঁকে আমাদের সহোদর ভাইয়ের মতই দেখতুম। তিনি ছিলেন মেজদাদা, আমি সেজদাদা বা সেজবাবু, আর বড়দাদা, এই তিন জনে সর্ব্বদাই আমরা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা করতুম—আমরা এই trinity তিনে এক একে তিন। মেজদাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলুম। আমরা দুটিতে তেতালার ছাতে বসে গান করতুম, গল্প করতুম, কোজাগর পূর্ণিমায় হেসে খেলে বাগানে বেড়িয়ে রাত কাটাতুম। মেজদাদা গান বাজনা বড় ভালবাসতেন—তিনি নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন—ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ইত্যাদি। "দীননাথ প্রেমসুধা দেহ হৃদে ঢালিয়ে" এ তাঁর গান। তিনি সব দিকে চৌকোষ ছিলেন—সামাজিকতা, লোকলৌকিকতা, বড়দাদার যে দিকটা অভাব ছিল, তিনি সেই সকল গুণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিলেন।

আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা

প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতক-গুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতেরি যশোগান।

এদিকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা ছিল, সে সময়কার সাহিত্যিক-দের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তার প্রণীত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ এইটি উদ্ধার করে সাহিত্য সমাজে প্রচার করেছেন দেখে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তাঁর লিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল—আমি এক সময়ে তাঁর হাতের লেখা পুঁথি দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন যে ভারত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা লিখতে আরম্ভ করেছেন—মোগল সাম্রাজ্য মনে হচ্ছে;—আক্ষেপের বিষয় যে এ সব লেখা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না—'কোন খানে লেশ, নাহি অবশেষ, সেদিনের কোন চিহ্ন'।

নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটী নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের বাড়ীতে 'নবনাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত—

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।

নবনাটকখানি রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, বহুবিবাহপ্রথায় পারিবারিক দুঃখজালা অশান্তি প্রকটন সূত্রে লোকশিক্ষা দেওয়া ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিশ্যি পুরুষের

নিতে হয়েছিল। আমার পিতা এই অভিনয়ের সংবাদ পেয়ে কালীগ্রাম হ'তে মেজদাদাকে লিখছেন ; (৪ মাঘ ১৭৮৮ শক—16th January 1867)

"তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"

আমাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার নাট্যের প্রধান নায়ক গবেশবাবু সেজেছিলেন—নাট্য অভিনয়ে সেই তাঁর প্রথম উদ্যম ; পরে তিনি ঐ ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন—তাঁকে ছেড়ে আমাদের কোন অভিনয় সিদ্ধ হ'ত না। হাস্যরসের অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

এই নবনাটক আর মানময়ী নামক একটি গীতিনাট্য সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'রাজা ও রাণী' এই দুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে গড়ে তোলা গিয়েছিল।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর সকলে আমরা একান্নপরিবারভুক্ত ছিলুম। ক্রমে আমরা পৃথক হয়ে পড়লুম। মেজদাদা ও আমাদের মধ্যে যখন বিভাগ হ'ল আমার মনে ভারি বেদনা লেগেছিল! আমরা তেতালার বাড়ীতে ছিলাম—দোতালায় এসে পড়লুম। এই দোতালার বাড়ীই আমাদের আদিম বসবাটী, তেতালার বাড়ী নির্ম্মাণ পরে হয়। বাড়ীর বাগান ভাগ হয়ে গেল, পুকুরটা বুঝি সাধারণ রইল। একদিন দেখি হাইকোর্টের একজন জজ এসে আমাদের বাড়ী তন্নতন্ন তদারক করে দেখে গেলেন, কি প্রণালীতে বিভাগ হবে তাই ঠিক করবার জন্যে। এই ছাড়াছাড়ি আমি অনেককাল ভুলতে পারিনি। ইংলণ্ড থেকে অনেক সময় দুঃখ করে মেজদাদাকে এই ধরণে পত্র লিখতুম। বাল্যকাল হ'তে আমরা একত্রে ছিলাম—তুমি ছিলে মেজদাদা আর এখনো পর্য্যন্ত আমার ছোটরা আমাকে সেজদাদা বলে ডাকে। আমাদের এক সঙ্গে ওঠাবসা, খ্যালাধূলা, আমোদ প্রমোদ, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ মতান্তর উপস্থিত হবে। কত কু-লোকের মন্ত্রণায় এক এক সময় এইরূপ সুখের সংসার ছারখার হয়ে যায়। যাহারা পরিবারের ভিতরে এইরূপ অশান্তির বীজ ছড়াইবার

চেষ্টা করে তাহাদের মত দুষ্মতি আর কে আছে? এক একবার দময়ন্তীর মত অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হয়, যখন নলরাজা তাঁহাকে অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—

অপাপচেতসং পাপো য এবং কৃতবান্ নলং
তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবত্বসুখজীবিকাং।

"অপাপচিত্ত নলকে যে পাপাত্মা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল, সে তদধিক দুঃখতর জীবিকা পাইয়া জীবনধারণ করুক।"

বিলেত থেকে ফিরে এসে বোম্বাই যাবার পর মেজদাদার সঙ্গে বড় আমার দেখা শুনো হ'ত না কিন্তু আমাদের পত্র-ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। ইংলণ্ড বোম্বাই আমি যেখানেই থাকি তাঁকে চিঠি লিখতুম আর তাঁর কাছথেকেও স্নেহপূর্ণ পত্র পেতুম। ছুটিতে কলকাতায় এলে অবিশ্যি আমাদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হ'ত। একবার আমি বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড় বৎসরের ব্যামোর ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলুম। সেই বাতে অনেক দিন শয্যাগত ছিলুম, তখন মেজদাদা সর্ব্বদাই আমাকে দেখতে আসতেন, আদর যত্ন করতেন, গল্পস্বল্পে আমার মনোরঞ্জন করতেন। আমার একটি আরামের চৌকি ছিল তার চারিদিকে বন্ধুবান্ধবেরা ঘিরে বসতেন, ঠিক যেন একটি দরবার বসেছে। আমার মনে হ'ত ব্যামোর ভিতরেও যদি এত আরাম পাওয়া যায়, তাহলে ব্যামোয় পড়াতে আপত্তি কি?

O Pain! where is thy sting?

মেজদাদার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। যে তাঁকে ভাল করে জানত সেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'ত, তাঁর কেমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল। অনেকে তাঁর উপর অনেক আশা ভরসা স্থাপিত করেছিলেন। ছোটকাকার তাঁর উপর কিরূপ স্নেহ মমতা ছিল তা আমরা তাঁর পত্রে দেখতে পাই। মেজদাদার বিদ্যাশিক্ষার পাছে কিছুমাত্র অযত্ন হয় এই তাঁর ভাবনা। তিনি একপত্রে বলছেন—"মানুষের মন রত্নখনি বিশেষ। সেই রত্নটিকে নিয়ে মেজে ঘসে উজ্জ্বল করলে তবে তা মূল্যবান্ হয়—মনের উপর শিক্ষার কার্য্যও ঐরূপ।" ভবিষ্যতে গণেন্দ্রনাথ আমাদের গৃহস্বামী হয়ে পরিবারের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকবেন এই আশায় তিনি আশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু হায়! তাঁর সে আশা পূর্ণ হ'ল না। যাঁরা ভাল লোক দেবতারা শীঘ্রই তাঁদের আপনাদের কাছে ডেকে নিয়ে যান; তাই তাঁর পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তিনিও অকস্মাৎ আমাদের সকলকে ছেড়ে পুণ্যলোকে চলে গেলেন।

Requiescat in pace!

তাঁর আত্মার শান্তি হোক!

নবগোপাল মিত্র

উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্ম্মী হ'লেন; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ল, তিনি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তিনি ভারি চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus. তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম। 'Indian Mirror' পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হ'তে হস্তান্তর হ'ল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মবিবাহ' আইন যখন বিধিবদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য সিম্‌লার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন। আদি সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে দাড়াল এই যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাইরে না গেলে আর রেজিষ্ট্রী বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁরা এই আইনের শরণাপন্ন হ'তে চান তাঁরা আপনাদের অহিন্দু বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে বাধ্য। এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে এখন আমরাই আর্ত্তনাদ ছাড়ছি—এই অহিন্দু Declaration উঠিয়ে দিয়ে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের হাজার চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না।

বোম্বাই থেকে আমি একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে বোম্বাই প্রদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, তীর্থস্থান,—ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলুম—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় আমি কথায় কথায় বলেছিলুম বাঙালীদের যেমন প্রধান আহার ভাত ওদেশে সেরূপ নয়, ভাতের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ রুটিই প্রচলিত, কোথাও বাজরী (বজরা), কোথাও জোয়ারী বা গমের হাত-গড়া রুটি। ভাতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্য ওদেশে তেমনি রুটি। এই ভাতখোর ও রুটিখোর, দুই জাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন্ জাতি? এই প্রশ্ন উঠল। আমি বলেছিলুম ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় বাঙালী দুর্ব্বল। আবহাওয়ার গুণাগুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হ'তে পারে, আহারের তারতম্যও আর আর

কারণের মধ্যে ধরা অসঙ্গত হয় না। যব ও গমের মত ভাত পুষ্টিকর খাদ্য নয়, সুতরাং ভাতখোর বাঙালী যে দুর্ব্বল তাতে আর বিচিত্র কি? এই কথা শুনে নবগোপাল বাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে আপনার অমত প্রকাশ করে বল্লেন, "তা কখনই হ'তে পারে না। তোমরা যাই বল, আমরা একবার ভাত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাব।" এ তর্কের আর কোন উত্তর নেই। "সভা হল নিস্তব্ধ।"

তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁরি নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল; দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না, শীঘ্রই নিবে গেল। এই স্বদেশী ভাবের যে পুনরুদ্দীপন হয়েছে এভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ করে শাশ্বতকাল স্থায়ী হয়, তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।

পূর্ব্বে বলেছি যে, পূর্ব্বে আমরা দুই কাকার সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ছিলাম। তখন ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য শাখার মধ্যেও যথেষ্ট সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ছেলেরা আমাদের বাড়ীর দালানে গুরুমশায়ের কাছে ক খ শিখতে আসত। গুরুমশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় হাতে খড়ি। সেই উগ্রচণ্ডা গুরুমশায় বেত্রহস্তে শেখাতে বসেছেন, কখনো বা সে বেত তার কোন ছাত্রপৃষ্ঠে চালিত হচ্ছে—সে চিত্র মন থেকে কখনো যাবে না। আমরা গুরুমশায়কে কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মনে করতুম—ঠিক যেন Goldsmith-এর সেই গ্রাম্য গুরুমশায়—

And still they gazed and still the wonder grew
That one small head could carry all he knew.

অবাক হইয়া দেখে, না জানি কি ক'রে
অত বিদ্যা ওই ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে।

আমরা গুরুমশায়ের কাছে ক খ, বানান, নামতা, কড়াঙ্কে, ষটকে—এই সব শিখতুম, তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস করতুম। যত ওঁচা ফ্যালা, জিনিস মোড়বার মত ব্রাউন কাগজ আনা হ'ত,—শ্রীরামপুরে সাদা কাগজ যেদিন আসত খুব ভাগ্যি মনে করতুম। এই কাগজের উপর বাঙ্গলা কলম দিয়ে আঁচড়কাটা—সেই আমাদের পত্রলেখা। যতদূর মনে আছে পত্রের দুই পাঠ ছিল—'সেবক শ্রী' আর 'আজ্ঞাকারী শ্রী'—দিনের পর দিন বদলে বদলে এই দুই পাঠ লেখা হচ্চে। এখন দেখতে পাই বাঙ্গলা চিঠিতে পাঠ লেখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন, স্নেহের সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ, ছোট বড় আত্মীয় স্বজন বন্ধু, অপরিচিত দূরের লোক, formal informal—বাঙ্গলায়

কাকে কি পাঠ, ও কোন্ সময় কি পাঠ লিখতে হয় সে এক বিষম সমস্যা। গুরুমশায় এই বিষয় আমাদের মনোযোগ দিয়ে শেখালে ভবিষ্যতে অনেক কাজ দেখত। তবে ওরূপ মূর্খ পণ্ডিতের কাছে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়, আমরা ঐ গুরুর কাছে লেখাপড়ায় বেশী দূর না এগিয়ে থাকি—নিদেন গোড়া পত্তন সেই।

উপনয়ন

নয় বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, ঘটনাটি বেশ মনে পড়ে। কর্ণভেদ শিরোমুণ্ডন এগুলি যদিও ভাল লাগেনি কিন্তু নাপিতের উপর বিদ্রোহাচরণ করেছিলুম বলে মনে হয় না। হবিষ্যান্ন ভোজনে বেশ তৃপ্তি লাভ করতুম, ভালই হোক্ মন্দই হোক্ রোজকার ডালভাতের চেয়ে রুচিকর। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে উপবীতধারী ব্রহ্মচারী সাজা, তিন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা—পাছে শূদ্রের মুখ দেখে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এই চিরন্তন হিন্দুপ্রথা অনুসারে আমার পইতা হ'ল। কারাবাস হ'তে মুক্তির পর ন্যাড়া মাথায় বাড়ীময় ঘুরে বেড়ানো আর সকলের কাছ থেকে ব্রহ্মচারী বলে অভিবাদন পাওয়া—মনে মনে কত গর্ব্ব হচ্ছে—যেন আমি কি একটা ধনুর্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্মচর্য্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা করে আমাদের পুরুতঠাকুর কোন উপদেশ দেন নাই। কেহ আমাদের বলে নাই, 'আচার্য্যাধীনো বেদমধীস্ব'—আচার্য্যাধীন হইয়া বেদাধ্যয়ন কর,—অথবা 'অধীহি, ভোঃ সাবিত্রীং মে'—আমার নিকট গায়ত্রী শিক্ষা কর। 'মা দিবা স্বাপ্সীঃ'—দিবানিদ্রা যেয়ো না বলে আমাদের কেহ সাবধান করে দেয়নি, আর আমরা ও আরামের জিনিসটা অনেকদিন পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলুম। তিন দিন ঘরে বন্ধ থাকা যে দ্বাদশ বৎসর গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করা—তা আমরা বুঝি নাই। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য (বৈদিককালে যেমন আর্য্য আর দস্যুর মধ্যে) সেই ভেদবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা যদি ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য হয়, সেটা সিদ্ধ হয়েছিল বলতে হবে। কতকগুলি সন্ধ্যার মন্ত্র আবৃত্তি করতে শিখেছিলুম তার মানে না বুঝে।-এখন দেখছি যে শব্দগুলি আওড়াতুম তার অর্থ—বারিবন্দনা।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া,—কুয়ার জল আমাদের মঙ্গল করুক, সমুদ্রের জল মঙ্গল করুক ইত্যাদি। কূপোদককে কথা শোনানো সহজ, সে জল পরিষ্কার রাখা আমাদেরই হাতে; কিন্তু সমুদ্র সকল সময়ে রাস মানেন না,

টাইটানিক জাহাজ-ডুবিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ! এই সন্ধ্যা দুবাব আবৃত্তি করবার নিয়ম; কিন্তু ঐ নিয়ম বেশীদিন পালন করেছিলুম বলে বোধ হয় না। পরে আমরা মহর্ষির উপদেশে জানলুম যে, উপবীত গ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য্য –গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা।—তা হ'তেই আমাদের নূতন জন্ম—তখন থেকে আমরা দ্বিজ। ব্রহ্মসাধনের অঙ্গরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপর পিতৃদেবের কতটা আস্থা ছিল তা তাঁর আত্মচরিতে দেখতে পাই। তিনি বলছেন—

"পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। যদিও আমি বুঝিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল।" ৪৫—৪৬ পৃঃ।

আমাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা সাধারণত যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া সংক্ষেপে সারিয়া ফেলা—ঐ ক্রিয়ার সারভাগ পরিত্যাগ করে যেন শুধু খোলসটা রাখা হয়েছে। পিতৃদেব যে ভাবে উপনয়নকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে প্রাচীন প্রথার কাছাকাছি যতটা রাখা যেতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপনয়ন-ভাগ দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়।

এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মচারীর প্রতি উপদেশে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হবে। সেই উপদেশের সারমর্ম্ম এই ঃ—

"গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের ইহকালের অবলম্বন, পরকালের সম্বল। সেই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁর জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ, বহির্জগতে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে। তিনি এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়া আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই—তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ এই।

পূজা

আমাদের বাড়ী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী—এই দুই পূজা হ'ত। দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হ'ত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকতো না। সেই তিন দিন আমরা যেন কল্পনাপ্রসূত এক নূতন রাজ্যে বাস করতুম—নূতন দেশ, নূতন ঋতু, আলো বাতাস সব নূতন। প্রথমে যখন প্রতিমার কাঠাম নির্ম্মাণ আরম্ভ হ'ত তখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় নির্ম্মাণ-কার্য্য আমরা কৌতূহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করতুম। আমাদের চোখের সামনে যেন ছোটখাট একটি সৃষ্টি কার্য্য চলেছে। প্রথমে খড়ের কাঠাম তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ তার উপর রং, ক্রমে চিত্র বিচিত্র খুঁটি নাটি আর আর সমস্ত কার্য্য, সবশেষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্ঘাটিত হ'ত। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কৃষ্ণলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৈলাসে হর-পার্ব্বতী, নন্দী ভৃঙ্গি, হনুমান ও গন্ধমাদন, বীণাহস্তে নারদ মুনি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা, নৃসিংহ অবতার, কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-মিলিত ইন্দ্রসভা, গীতায় একাদশ সর্গে যেমন বিশ্বলোকের বর্ণনা আছে, আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষে সেই বিশ্বলোক আবিষ্কৃত হ'ত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের দেহমণ্ডন, বসন ভূষণ সাজসজ্জা প্রস্তুত হ'ত, আমাদের দেখতে বড়ই কৌতূহল হ'ত। লক্ষ্মী সরস্বতীর চমৎকার বেশভূষা। লম্বোদর গজানন, গণেশ ঠাকুরের মূষিক তাঁর স্থূল দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকত; কিন্তু কার্ত্তিকের প্যাখাম-ধরা ময়ূরের যে বাহার তা আর কহতব্য নয়। কার্ত্তিক ঠাকুরের অপূর্ব্ব সাজসজ্জা, তাঁর গুম্ফজোড়া, আকৃতি, বেশভূষা, ফিনফিনে শান্তিপুরে ধুতি—দেখে মনে হ'ত যেন একজন বাঙ্গালী বাবু ময়ূরের উপর এসে অধিষ্ঠান করেছেন। মহিষাসুর বেচারার অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহের কামড়ে তার দক্ষিণ হস্ত অসাড়, এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভুজার বর্শাবিদ্ধ হওয়ায় তার আর নড়ন চড়ন নেই, এ সত্ত্বেও তার মুখে Milton-এর সয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে বেরচ্ছে।

পূজার সময় যাত্রা হ'ত। কত রকম যাত্রার দল এসে মহল্লা দিত, তাদের মধ্যে যা সেরা তাই বেছে নেওয়া হ'ত। যাত্রায় বহুলোকসমাগম হ'ত, উঠানটা লোকে লোকারণ্য। আমরা অদ্যোপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না, কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেটি প্রহ্লাদ সাজত তার বড় মিষ্টি গলা, তার গানে

সকলে মোহিত হয়ে যেত। প্রহ্লাদ কত প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করছে, আমরা তার দুঃখে অশ্রুপাত করতুম। এত উৎপীড়নেও তার ভক্তির স্খলন নেই। সে আপনাকে শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তার চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাবে ?

কালী কালী বলে ডাকি সদা এই বাসনা
অভ্যাস দোষেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা।

কিন্তু যাত্রার গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হ'ত। রামায়ণের পালাতে সঙের আসল ঘটা—এদিকে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসের দল, ওদিকে আবার রামের বানর সৈন্য,—সবই সঙ্গীন ব্যাপার। আমরা সারারাত কিছু সভায় থাকতুম না, রাত্রিশেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আনা হ'ত। কোন ভাল অদ্ভুত রকম সং আসছে তাই দেখবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম। দেখতে দেখতে তিন দিন চলে গেল—বিজয়া এল, প্রতিমা ভাসান দিতে নিয়ে যাবে—কি আপশোষ! দুর্গা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে চল্লেন, মনে হ'ত সত্যিই দেবীর চক্ষে জল এসেছে। বিজয়ার দিন প্রত্যূষে আমাদের গৃহগায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি Classical—সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী গান আমার এখনো মনে আছে—

আজু পরমানন্দ।আনন্দ! মম গৃহে আলো।
যাও যাও সহচরী,
আন ডেকে পুরনারী
বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল।
এস উমা করি কোলে,
মাকে মা কি ভুলে ছিলে,
এত দিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল।
মা হয়ে মমতা মার,
জাননা গো উমা আমার
পাষাণ স্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল॥

তখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিকতা কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতে যেতুম, তাতে ধূপধুনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্য আড়ম্বরের

মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস। আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কি ভাগ্যি পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা—পশুর বদলে কুমড়া বলি হয় এই শুনতুম। আধ্যাত্মিক ভাবের আর যা কিছু দেখা যেত সে বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জন উপলক্ষে। বিজয়ার রাত্রে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোট-বড় সকলের মধ্যে সদ্ভাবে কোলাকুলি, এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী মনে হ'ত,—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই বাক্য যেন ঠিক ফলেছে।

এই পৌত্তলিক উপাসনার মধ্য হ'তে আস্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে আমাদের পরিবারে অমূর্ত্তের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অল্প বয়স থেকেই মূর্ত্তিপূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল—যাকে ইংরাজিতে বলে 'Iconoclast' আমি তাই ছিলুম—তার কারণ পৈতৃক সংস্কারই বল—আর যাই বল। এক সময়ে আমাদের বাড়ী সরস্বতী পূজা হ'ত। মনে আছে একবার সরস্বতীর প্রতিমা অর্চ্চনায় গিয়েছি—শেষে ফিরে আসবার সময় আমার হাতে যে দক্ষিণার টাকা ছিল তাই দেবীর উপরে সজোরে নিক্ষেপ করে দে ছুট! তাতে দেবীর মুকুট ভেঙ্গে পড়ল। এই অপরাধে তখন কোন শাস্তি পেয়েছিলুম কি না মনে নাই, কিন্তু হাতে হাতে সাজা না পেয়ে থাকি তার ফলভোগ এখন বুঝতে পারছি। বাঁশীতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্মৃতিভ্রংশ হ'তে আরম্ভ হয়েছে। আমি যে আমার সর্ব্বিসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারিনি সেও ঐ কারণে। সরস্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আসন অধিকার করে পদত্যাগ করতে পারতুম—আমার ভাগ্যে আর তা হ'ল না!

ব্যায়াম

ছেলেবেলায় আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে যোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ বরাহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্লা পদব্রজে বেড়িয়ে আসতুম। সেই আমাদের Morning Walk—তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া, Cricket, সাঁতার দেওয়া এ সব ছিল। আমাদের বাড়ীতে একটা পুকুর ছিল, তাতে আমরা অনেক সময় সাঁতার দিতে যেতুম। বাজী রেখে সাঁতার দেওয়া আমাদের এক রকম খেলা ছিল। আমরা তিন ভায়ে মিলে যেতুম—কলার গাছ আমাদের ভেলা। সেই ভেলায় চড়ে মাঝখান পর্য্যন্ত গিয়ে দেখা যেত কে কাকে সিংহাসন-চ্যুত করতে পারে। সেই কলার বাহন কেড়ে নেওয়া চাই—আরোহী সাধ্যমত চেষ্টা করছে আততায়ীকে হটিয়ে দিতে—চোখে জল ছিটিয়ে হোক আর যে কোন উপায়েই হোক্ তার আক্রমণ হ'তে আপনাকে রক্ষা করতে হবে।—বলপূর্ব্বক সেই কলাবাহন যে দখল করতে পারবে তারই জিৎ।

এই রকমে সাঁতারে আমবা খুব পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলুম। বাবামশায়ের সঙ্গে যখন গঙ্গায় ব্যাড়াতে যেতুম তখন সাঁতার দিয়ে স্নানে আমার বিশেষ আমোদ হ'ত। আমি সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূব পর্য্যন্ত চলে যেতুম, বাবামশায় তাতে কোন আপত্তি করতেন না, বোধ করি যদিও এক একবার তাঁব মনটা অস্থিব হয়ে উঠত।

বড়দাদা সাঁতারে সর্ব্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাঁব রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত বকম কারদানী করতেন তার ঠিক নেই। যখন গঙ্গার ধাবের বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়ে গঙ্গাই পাব হ'তেন; আর সকলে ভয়ে অস্থিব হয়ে পড়ত।

হীরাসিং বলে এক পালওয়ানের কাছে আমবা কুস্তী শিখতুম, তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগুব ভাঁজা—আব কত রকম কুস্তীর দাঁও, মার পেঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম। কেউ আমার সঙ্গে সহজে পেরে উঠত না। হীবাসিংহেব চ্যালাদের মধ্যে অনেকে আমার সমবয়স্ক ছিল, তাদের সঙ্গে আমার কুস্তী হ'ত—তাদের মধ্যে যারা বড় তাদেরও আমার কাছে হার মানতে হ'ত; সহজে কেউ আমাকে ধরাশায়ী করতে পারত না। অথচ আমার বল যে বেশী তা নয়—এই কুস্তীতে শুধু বলীর জয় তা নয়, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারলেই জিৎ। একদিন কুস্তী করতে করতে বেকায়দায় পড়ে আমার হাত মুচকে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা গেল। আমার ওস্তাদের টোটকা ওযুধে সেবে যাবে এই ভেবে ছোলা ভিজিয়ে হাত বেঁধে রাখলুম; কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। শেষে ডাক্তার সাহেবের রীতিমত চিকিৎসায় তবে আবাম হ'ল। তখন থেকে সেবারকার মত আমার কুস্তী বন্ধ। এই সব বিষয়ে আমি অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকতুম না, সবাই বলত "যা করবে সব তাতেই বাড়াবাড়ি—এ তোমার কেমন স্বভাব।" তার ফল ভোগও করতে হ'ত—হাত পা ভাঙ্গা, মাথা ভাঙ্গা, কত বিপত্তি যে আমার উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই। অথচ এখনো পর্য্যন্ত ত বেঁচে আছি। এত প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে শিশুজীবন যে কি করে রক্ষা পায়, বিধাতার এ এক আশ্চর্য্য বিধান। সে যাহা হোক্, একথা বলা যেতে পারে 'কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়'—এটা বড় ঠিক কথা। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তিই হয়। তার সাক্ষী আমাদের ওস্তাদ হীরাসিং। তার কুস্তীর বিরাম নেই, যখনই দেখি কোন না কোন কঠোর ব্যায়ামে নিযুক্ত; কিন্তু তার শরীর বেশী দিন টিঁকল না, শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ল। শুনেছি এই সব পালোয়ানেরা দীর্ঘজীবী হয় না। শরীর

রক্ষা করতে হ'লে আহার বিহার ব্যায়াম এ সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্যক। গীতানির্দ্দিষ্ট মধ্যপথই প্রশস্ত—

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

নিয়মিত আহার বিহার, নিয়মিত কর্ম্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—ইহাতেই দুঃখহারী যোগ সাধন হয়।

শিক্ষা

আমি ইতিপূর্ব্বে পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে আমার প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছি, তার পরের ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। পিতৃদেব যে চারজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্যে কাশীতে পাঠান—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তার মধ্যে একজন। ইনিই আমার সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমার শিক্ষক, কিন্তু এঁর উপাধির উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হবে। এঁর শিক্ষাগুণে সংস্কৃতশাস্ত্রে আমার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মেছিল তা বলতে পারি না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘঃ' 'চপোদিতা কানিতার্ণঃ' প্রভৃতি সূত্র ও তস্য বৃত্তিগুলি কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করতেই সব সময় যেত। তিনি বলতেন—

'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।'

অর্থাৎ আবৃত্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সার, বোঝো আর না বোঝো তাতে কিছু যায় আসে না। কাব্যের মধ্যে রঘুবংশের কয়েক সর্গ বই আর বেশীদূর এগোয় নি। আমি যতদিন বিদ্যালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলুম, ততদিন যদি আর একজন ভাল পণ্ডিতের কাছে,—ওকথা থাক্ আর গুরুনিন্দা করব না। তার নিকট শিক্ষায় আমার একটা লাভ হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এক প্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলে আর কিছু না হোক তাঁর ঐটুকু পাণ্ডিত্য—ঐ উচ্চারণ শুদ্ধিটুকু উপার্জ্জিত হয়েছিল, আর তাঁর ছাত্রও অল্পবিস্তর তার ফলভাগী হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যে কি বিকৃত তা সকলেরই জানা আছে, সে উচ্চারণ ত আমার কাণে ভারি অশ্রাব্য ঠ্যাকে। আমাদের মধ্যে বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদেরও উচ্চারণ শুনলে মাথা হেঁট করতে হয়। আমাদের যেমন একপ্রকার 'বাবু' ইংরিজি আছে যা নিয়ে ইংরাজেরা বিদ্রূপ করে, তেমনি 'বাবু' সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে না জানি তৈলঙ্গী বা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরা কি মনে করেন! সংস্কৃত কালেজের একজন ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষের সহিত আমার এই

বিষয়ে কথা হয়। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলুম যে, কালেজের বিদ্যার্থীদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শেখাবার একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন। তিনি আমার একথা হুট করে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, "এদেশে যে উচ্চারণ চলিত তাই ঠিক—মেড়ুয়া-বাদীদের কাছে আমরা আবার উচ্চারণ কি শিখব? আর কোন্ প্রদেশকেই বা উচ্চারণের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?"

কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা গায়ের জোরে হয় না। সংস্কৃতের কোন্ বর্ণের কি উচ্চারণ তা পরীক্ষা করবার অনেক উপায় আছে, আর সে পরীক্ষায় বাঙ্গলা-সংস্কৃত উচ্চারণের ভ্যাজাল ধরা পড়বেই। "ভাষা বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ ঠিক ততগুলি বর্ণ সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ।" কিন্তু এদেশে আমরা কি সংস্কৃত বর্ণের যথা-নির্দ্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষা করি? তা ত নয়। আমরা বর্গীয় জ, অন্তস্থ্য য, দুই ব, মূর্দ্ধণ্য ণ, দন্ত্য ন, তালব্য মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্য স এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে কোন প্রভেদ মানি না। যুক্তাক্ষরে প্রতি বর্ণের পৃথক উচ্চারণ না করে বাঙলা ধরণে এক বিকৃত উচ্চারণ করে থাকি; যথা—

কৃষ্ণ (ষ্ ণ)=কিষ্ট। আত্মা=আত্তাঁ।
স্নান=স্তান। ক্ষীর (ক্ষীর)=ক্ষীব ইত্যাদি।

অন্ত্যস্থ 'য'র পৃথক উচ্চারণ বাঙ্গলায় আদৌ নাই, যুক্তাক্ষরেও নহে। সংযুক্তবর্ণে 'য'কারের উচ্চারণ হয় না—যে অক্ষরে সংযুক্ত থাকে তার দ্বিরুক্তির মত উচ্চারণ হয়, যেমন—

সত্য=সত্ত। বাদ্য=বাদ্দ ইত্যাদি।

বাঙ্গলার অনেক স্থলে 'অ'কারের উচ্চারণ প্রাকৃত হ্রস্ব 'ও'কারের মত, যথা—অরি অসি ইত্যাদি। সংস্কৃত উচ্চারণের বেলাতেও আমরা এই নিয়ম অনুসরণ করি। বাঙ্গলা উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণে আরোপিত হয় বলে এখানে সংস্কৃতের উচ্চারণ এরূপ দূষিত হয়েছে। তাই বলছি সংস্কৃতের মত ঠিক উচ্চারণ করতে হ'লে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতা কোন কোন অংশে নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে বাঙ্গলা দেশের কাছে আর সকলকেই হার মানতে হয়। এদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যেরূপ বিকৃতি ধারণ করেছে এমন আর কোথাও দেখি নাই। বারাণসী বল, দাক্ষিণাত্য বল, এসকল স্থানের যে কোন পণ্ডিত হোন্ তাঁদের উচ্চারণ যে আমাদের

তুলনায় বিশুদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুএকটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে; যেমন মহারাষ্ট্রে দেখেছি 'দ'এ 'ন'এ 'জ্ঞ'র উচ্চারণ হয়; কিন্তু সেগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ওসকল স্থানের সংস্কৃতজ্ঞদের গুরুস্থানীয় বলে মেনে নিতে পারি। সে যা৯ হোক্, আমার মনে হয় বঙ্গদেশে সংস্কৃতের উচ্চারণ-সংস্কার নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সংস্কৃতানুরাগী বিদ্বন্মণ্ডলী এবিষয়ে মনোযোগ করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়েব নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে আমাব যা কিছু জ্ঞানলাভ হয়, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় সেই বিদ্যাটুকু আমার বিলক্ষণ কাজে এসেছিল। আমাব সময়ে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় ৫০০ মার্ক পূর্ণমাত্রা নির্দ্ধারিত ছিল। এই ৫০০ মার্কের মধ্যে আমি সংস্কৃতে ৩৫০-এরও উপব পেয়েছিলুম। আমার পরীক্ষক ছিলেন ভট্ মোক্ষমূলর। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ কবতেন। বোধ করি আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার কাগজটার উপরে একটু সদয়ভাবে চোখ বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চ সংখ্যা পাবার আমার আশা ছিল না। আমি সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় লাটিন গ্রীকের পরিবর্ত্তে আমাদের দুই Classic—সংস্কৃত ও আরবিক নিয়েছিলুম। ওখানকার ছাত্রদের নিজের ভাষায় অথবা ওদের চিরাভ্যস্ত লাটিন গ্রীক ভাষায় যদি আমাকে পরীক্ষা দিতে হ'ত, আর আমাদের ক্লাসিকদ্বয় তালবেতালরূপে যদি আমার সহায় না থাকত তাহলে ঐ পরীক্ষায় আমার জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী

Oriental Seminaryর হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন।—ধীর শান্তপ্রকৃতি, সুবিদ্বান—তাঁর কি এক মোহিনী শক্তি ছিল আমরা সহজেই তাঁকে মেনে চলতুম, আমাদের উপর তাঁর কোন জোর জবরদস্তী করতে হ'ত না। আমাদের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল কেবলমাত্র *"Sir"*—'Sir' এসেছেন শুনলেই আমরা গিয়ে হাজির। বিদ্যালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল তা ছাড়াও তিনি আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—Gibbon's Decline and Fall—'রোম রাজ্যের অবনতি ও পতন' যার পত্রে পত্রে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব, রোম সম্রাটের অমানুষিক কাণ্ড-কারখানা—গিব্বনের মৃদঙ্গগম্ভীর ভাষায় পড়ে স্তম্ভিত হ'তে হ'ত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধাদি লেখা, বক্তৃতাদি অভ্যাস করা, এ সকলের প্রতিও তিনি মনোযোগ দিতেন। যাতে আমাদের ইংরাজি ভাল বলবার ক্ষমতা জন্মে সেই উদ্দেশে

তিনি আমাদের জন্য এক বক্তৃতা-সমিতি স্থাপন করেছিলেন; প্রতি সপ্তাহে তার অধিবেশন হ'ত এবং পৃথিবীব প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা—নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহা মহা বীরদের বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন করে আমবা বড় বড় তর্কবাগীশ একত্র হয়ে বাগ্মিতা ফলাবার চেষ্টা করতুম। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় আমাদের তর্কবিতর্কের সুন্দর মীমাংসা করে দিতেন। এই সভাব কার্য্য অনেক দিন বেশ নিয়মপূর্ব্বক চলেছিল। মাষ্টারমশায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা ছিল, তিনিও পিতার ন্যায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁরি শিক্ষাগুণে আমি ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন এক সভায় "প্রাচীন ভাবতের রণনীতি" বিষয়ক একটি ইংবাজি প্রবন্ধ পাঠ করি--কেশবচন্দ্র সেন সেই অধিবেশনে একজন প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন তার নাম ছিল 'হিন্দু কলেজ।' প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—দ্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe— বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। দুবৎসর পরে বনমালী বাবুর ক্লাসে উঠি। তিনি একজন অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টার ছিলেন। ছেলেদের উপর বড়ই উৎপীড়ন করতেন, সব চেয়ে যে সুশীল বালক সেও তাঁর প্রচণ্ড চপেটাঘাত এড়াতে পারত না। বন্ধুবর তারকনাথ পালিত তাঁর চপেটাঘাতে একবার ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে যমেব ন্যায় ভয় কবে চলতুম—যমদূতের মত তাঁর সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি মনে করলে এখনো ভয় হয়।

তারকনাথ পালিত

বনমালী বাবুর ক্লাসে আমার পড়াশুনা কেমন হ'ত মনে নাই কিন্তু একটি জিনিসের জন্যে সে বৎসরটি আমার চিরস্মরণীয় থাকবে—সে কি না বন্ধুলাভ। আমার সহাধ্যায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি যে একটি বন্ধুরত্ন পেয়েছিলুম তিনি আমার চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে রইলেন। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে ভাল ভাল পায়রা —লক্কা মুক্ষী লোটন গলাফোলা এনে দিয়ে কত রকমে আমাকে সুখী করবার চেষ্টা করতেন, স্কুলে ও বাড়ীতে সর্ব্বদাই আমরা মাণিক জোড়ের মত এক সঙ্গে থাকতুম। আমার ছেলেবেলাতেই একবার এমন ঘাত হয়েছিল যে চল্‌তে কষ্ট হ'ত—তখন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলতুম। বড় হয়ে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম তখনো আমরা বন্ধুত্বসূত্রে বাঁধা। আমি বিলাত যাই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, বয়স তখন ১৯;

তারকনাথ পালিত (৫০ পৃষ্ঠা)

বিলাতে থাকতে আমাদের পত্র ব্যবহারে কোনদিন ত্রুটি হয়নি। যখন আমি বোম্বায়ে কাজ আরম্ভ করি তখনও তারক বিলাত যাননি। তিনি বিলাত যান—আমি বিলাত থেকে ফিরে আসার বছর দুই পরে—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে আসতে আসতেই প্রায় তিনি ব্যারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি যখন বিদেশে কর্ম্মস্থলে তখন তিনি এখানে থেকে আমাদের বিষয়-কর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা ও সর্ব্বতোভাবে হিতচিন্তক ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাইকে আপনার মত করেই দেখতেন। তাঁর ভালবাসার চিহ্নসকল আমার জীবনময় ছড়ানো রয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যে সকল উপকার পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁর নিকটে চিরঋণী। আমার জীবনের উপর দিয়ে কতশত ঘটনা গিয়েছে, অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হয়েছে যাঁদের নাম স্মৃতি মাত্রই রয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে বন্ধুতার কথা বলছি এ এখনো পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আমি যাঁর কথাগুলি এই লিখছি আমার সেই প্রিয়সুহৃৎ এ সময়ে রোগশয্যায় শয়ান। ৫, ৬ বৎসর ধরে তিনি উৎকট পীড়ার কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি কখনো ম্লান হ'তে দেখিনি। কোন দিন একটু ভাল কোন দিন মন্দ, এই উত্থানপতনের মধ্যে তিনি ধীরভাবে দিনযাপন করছেন। এই দুঃখ কষ্টে তাঁর ধৈর্য্য অসীম, তাঁর বীর্য্য ও সাহসের হ্রাস নাই। তাঁর কি রোগ, চিকিৎসায় কি কি প্রয়োজন, তিনি এ সকলি তন্ন তন্ন করে জেনেছেন আর ডাক্তারেরা ঔষধ পথ্য যা কিছু ব্যবস্থা করেন, যাতে তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হয় তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। বলতে গেলে তিনি আপনিই আপনার চিকিৎসক, আপনিই আপনার ধাত্রী। আমার একজন ইংলণ্ডপ্রবাসী বন্ধু এদেশে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে বলছিলেন, "তারক যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন",—সত্যই করছেন—যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তিনি এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত রয়েছেন।

ডাক্তার Lukis বলতেন, "পালিত কেবল তাঁর Will-power-এর জোরে বেঁচে আছেন—আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের সবই যেন উল্‌টে দিয়েছেন।"

মৃত্যু আসুক তাতে তাঁর কোন ভয় নাই, কেবল ভয় এই যে, যে মহৎকার্য্য সমাধা করতে তিনি উৎসুক, পাছে মৃত্যুতে সে কাজের কোন ব্যাঘাত হয়। তিনি তাঁর স্বোপার্জ্জিত প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেশের কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন, তা কারো অবিদিত নাই। আমাদের দেশে যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার হয়, বিজ্ঞান-বলে যাতে কৃষিশিল্পের উন্নতি এবং ঐ সঙ্গে দেশীয় লোকের অর্থোপার্জ্জনের সহস্র দ্বার উন্মুক্ত

হয়, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি প্রথমে তাঁর ধনবল একত্র করে জাতীয় শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, পরে যখন সেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত হ'ল না, তার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দিহান হ'লেন তখন সেখানকার দান উঠিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশে নূতন দান ব্যবস্থা করলেন—সামান্য দান নয় স্থাবর সম্পত্তি মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকারও উপর। দানপত্রের ব্যবস্থা দু কথায় এই যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-কলেজে—পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা এই দুই বিদ্যায় দুইটি আসন প্রতিষ্ঠিত হবে—এই প্রথম। দ্বিতীয়, ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাকার্য্যে দেশীয় লোকেরাই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবেন। যদি তাঁদের যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক হয় তাহলে এই ব্যবস্থা-পত্রের কর্ত্তৃপক্ষদের বিবেচনায় যাহা ধার্য্য হয় সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ ও দানপত্র গঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমর্পিত হয়েছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় আরও আট লক্ষ টাকার বিষয় তিনি লেখাপড়া করে সেনেটের হাতে সমর্পণ করেছেন। এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করে এখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন মনে তাঁর শেষ দিন প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, ভৃত্য যেমন মাসের শেষে আপনার বেতন প্রতীক্ষা করে থাকে—"কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।"

এই বিরাট দান উপলক্ষে য়ুনিবারসিটির Vice-Chancellor মহোদয় বলেছেন:— "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বারবঙ্গাধিরাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখো লাখো টাকা দান করিয়া আমাদেব গৌরবের পাত্র হইয়াছেন সত্য কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাশয় তাঁর এই অসামান্য বদান্যতাগুণে আর সকলকে পরাস্ত করিয়া এই দাতৃমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিলেন।"

ছেলেবেলা থেকেই তারকনাথ পালিত তেজস্বী, এইখানে তাঁর বাল্যকালের তেজস্বিতার একটি পরিচয় প্রদান করি। আমরা দুই বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মেডিকেল কলেজে কেমেষ্ট্রীর লেকচার শুনতে যেতুম। একদিন প্রোফেসার আসার আগে আমরা দুজনে একটু চেঁচিয়ে কথা কচ্ছিলুম। মেডিকেল কলেজের একজন ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা তাইতে রূঢ়স্বরে বল্লে—"This is not a Bazar. Don't make such a row"—তারক তাই শুনে ভারী রেগে উঠলেন আর বেশ দুকথা শুনিয়েও দিলেন। তখনই প্রোফেসার আসায় তখনকার মত বিবাদটা ঐখানেই থেমে গেল, কিন্তু লেকচার হয়ে যাবার পর ৫।৬ জন ফিরিঙ্গীপুঙ্গব দল বেঁধে তাঁকে আক্রমণ করতে এল, তিনি তাতে ভয় না পেয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে সর্ব্বাগ্রে দলপতিকে এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন। তখন চেলাগণ হাঁ হাঁ করে তাঁর উপর এসে পড়লো, ৪।৫ জনে

মিলে তাঁকে কিল চড় বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু আমার বন্ধুটি ত কিছুতে দমবার পাত্র নন, তাহলে তিনি আজ এই দেশপূজ্য তারকনাথ পালিত হ'তে পারতেন না। তিনি দুই হাতে শত হস্তের ব'ল ধরে তাদের উপর ঘুসি চড় কিল বর্ষণ করতে ছাড়লেন না। খুব মার খেলেন সত্য—কিন্তু মারতেও কিছুমাত্র কসুর করেন নি। আসলে যে তাঁরই জয় লাভ হল একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার পর দিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা এই খবরে ভারী রেগে গেল। রমানাথ নন্দী বলে একজন ছোকরা আমাদের দলের চাঁই হয়ে দাঁড়িয়ে Awake, arise or be for ever fallen—এই লাইনটা কাগজে লিখে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলো। পর দিন দল বেঁধে মারামারি করতে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। তারক প্রথমটা এতে অমত করলেন, বল্লেন, কার্য্যক্ষেত্রে তারাও মেরেছে আমিও মেরেছি, শোধবোধ হয়ে গেছে—আবার এরকম সেজেগুজে মারামারি করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু সকলে যখন স্থির করলে যে, না, মারতেই হবে, তখন তিনিও আগুয়ান হয়ে দাঁড়ালেন। তার পর যখন দেখা গেল ফিরিঙ্গি অনেক তখন সর্ব্বাগ্রে আমাদের উত্তেজক মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন; অনেকেই তার অনুসরণ করলে,—আমরা যে দুতিন জন শেষ পর্য্যন্ত অটল ছিলুম তার মধ্যে ভৈরব বাঁড়ুয্যে একজন। তিনি আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আসলে হার হ'ল আমাদের এই দ্বিতীয় দিনে, এদিনে তারক খুবই মার খেয়েছিলেন। তবুও ফিরিঙ্গীরা তাঁকে apology করাতে পারেনি। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি মরে যাব তবু apology করব না।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন ছিলেন সাট্‌ক্লিক সাহেব, তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইটুয়েল তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, আমরা দল বেঁধে মেডিকেল কলেজের ছোকরাদের মারতে গিয়েছিলুম। প্রিন্সিপ্যালের কৈফিয়ৎ তলবে তারক তখন সমস্ত খুলে বল্লেন। সেই ফিরিঙ্গী কি রকম রূঢ় ব্যবহার করেছিল—যা থেকে এই মারামারির উৎপত্তি—একলা তাঁকে তারা ৪।৫ জন মিলে কি রকম আক্রমণ করেছিল—সব শুনে সাট্‌ক্লিক সাহেব নেপথ্যে বল্লেন—Served him right—; যাহোক প্রকাশ্যে দুজনেরই জরিমানা হয়ে মামলা মিটমাট হয়ে গেল।

আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দু স্কুল থেকে কিছুকালের জন্যে St. Pauls' Schoolএ গিয়ে ভর্ত্তী হই। সেখানে ইংরাজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল; তাদের সঙ্গে যে, সকল সময়ে মিলে মিশে সদ্ভাবে থাকতুম তা বলতে পারি না, কখন

কখন টকরাটকরি ঘুসোঘুসিও হ'ত। এই রকম একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা আমার মনে আছে। একটি ছেলের সঙ্গে আমাব হাতাহাতি ব্যাপাবের কথা আমাদের Rector-এর কাণে গিয়েছিল। কার দোষ সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই বোধ কবি আমাকেই প্রথমটা তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত করে থাকবেন। কেননা আমাদের কিছু আগে একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তাতে আমার যে প্রাইজ পাবার কথা ছিল তা বন্ধ করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ কোন শাস্তি হয় নাই। আমি ইংরাজি সাহিত্যে বেশ ভাল রকমই পরীক্ষা দিয়েছিলুম। Goldsmith-এর একটি সেট বই তাতে প্রাইজ পাই। আমার ক্লাসের ছেলেদের সন্তুষ্ট করবার এক সহজ উপায় ছিল – তাদের মসলা বিতরণ করা। আমার পকেটে সুপারি এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা থাকত, তাই খেতে তারা খুব ভালবাসত, কাজেই আমার সঙ্গে তাদের ভাব রাখতে হ'ত। মাষ্টারেরাও আমাকে ভালবাসতেন—Pridham সাহেব আমাকে বড় অনুগ্রহ করতেন—তাঁর ঘবে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছবি দেখাতেন আর তিনি নিজে যখন ছবি আঁকতেন তখন আমি বসে বসে দেখতুম। অন্যান্য ছেলেদের মত মাষ্টারদের কাছ থেকে আমাকে বেত্রাঘাত সইতে হ'ত না। এক একটা মাষ্টার ভয়ানক গোঁয়ার ছিল—ছেলেরা তাঁর বেত্রাঘাতের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকত। আর দুই একটি ছেলের প্রতি তাঁর বিশেষ ক্রোধকটাক্ষ দেখতুম, তাদের প্রতি অকারণ অত্যাচার দেখে আমার ভারি কষ্ট হ'ত। বেচারাদের পিঠের চামড়া বোধ করি কোনখানে অক্ষত ছিল না।

সেণ্টপল ছেড়ে পুনর্ব্বার হিন্দু স্কুল। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি।

রামচন্দ্র মিত্র

কলেজে আমাদের যে সব শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে আমরা শ্যামাচরণ সরকারের বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য বাঙ্গলা বই পড়তুম। তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে; অনেকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের স্বচক্ষে দেখা;—তাঁর চেহারা ধরণ ধারণ সকলি কৌতুকাবহ। কোন বড় লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হ'লে পায়ে পা ঠেকিয়ে 'I beg your pardon' বলে ক্ষমা প্রার্থনা করা হ'ত; সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্লাসের ছেলেরা দুষ্টুমি করে অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করত কিন্তু কোন্ ছেলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে—কোথায়

নরম কোথায় বা গরম—তা তাঁর পাকা জানা ছিল। পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের উপর তাঁর ভারি আক্রোশ, কেননা তিনি বেশ জানতেন তারা মুখের উপর কোন জবাব করতে সাহসী হবে না। অথচ অন্য অবাধ্য দুষ্টু ছেলে যাদের এক কথা বললে মুখের উপর দুকথা শুনিয়ে দেবে তাদের প্রতি অতি নম্র ব্যবহার। 'শক্তের ভক্ত নরমের গরম' তাঁর সম্বন্ধে অবিকল খাটত।

একদিন আমাদের ক্লাসের একজন পাড়াগেঁয়ে ছেলে পাঠ্য বই আনেনি এই নিয়ে তিনি তার প্রতি মহা খাপ্পা হয়ে কটুকাটব্য বর্ষণ করছেন দেখে তারক বল্লেন, "ওকে ও রকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? ও কি করেছে? জানেন আমরা ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি।"

তখনই তিনি নরম হয়ে অতি মৃদুস্বরে বল্লেন—"ও বই আনেনি তাই শাসন করলুম।" তারক উত্তর করলেন, "আমিও ত বই আনিনি আমাকেও কি ঐ রকম করে শাসন করবেন?" রামমিত্র বল্লেন (মৃদুমন্দ ভাবে) "ওঃ তুমি বই আননি—তা পাশের ছোকরার বই দেখে পড়।"

ছেলেরা যখন ভারি গোল করছে কিছুতেই বাগ মানে না তখন তিনি তাদের থামাবার একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেন। নানা রকম মুখভঙ্গী করে কেদারা থেকে উঠে বোর্ডে খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখতেন Silence! Silence! Silence! চুপ চুপ চুপ! তার পর চৌকিতে বসে বলতেন, "এখন কে গোল করবে করুক দেখি!"

আমরা বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী অনেক রকম শুনতে পাই, ওবিষয়ে নানা মুনির নানা মত—কিন্তু রামমিত্রের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, আর কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় না। দুএকটি নমুনা দিচ্ছি:—

পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয়? রসগোল্লা খেতে খেতে তার গোলাকার ধ্যান করা।

ভূগোল শেখার সহজ উপায় কি? ষ্টুয়ার্টের জিওগ্রাফিখানি ২০ আনা মুখস্থ করা—লেখার সময় চার আনা ভুলে গেলেও—১৬ আনা মনে থাকবে।

Composition ভাল লিখতে হয় কি করে? ভাল ভাষায় প্রকৃতি বর্ণনা করতে গেলে সুশীতল সমীরণ এই দুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধুভাষা মনে না আসে সেখানে 'ঠাণ্ডা বাতাস' বসিয়ে দেবে। কলসের স-টা কোন্ স যদি মনে না থাকে তাহলে সেখানে 'ঘট' শব্দটা ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার পরীক্ষা দেবার সময় কোন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মশায় এই বইটার কোন্ কোন্ অংশ ভাল করে দেখে রাখা চাই, আমাকে বলে দিন।

উত্তর—(খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া)

Mark the first page! Mark the second page!!

বলতে বলতে বইটার কোন ভাগই বাদ গেল না, সে বেচারা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে প্রস্থান করলে।

রামমিত্রের নামে অনেক গল্প আছে, আর কত বলব। কেশবচন্দ্র তাঁর নকল করতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। কেশববাবু রামমিত্রের সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন, সেটি হচ্ছে এই :—

একদিন রামমিত্র ছেলেদের বটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বাগানের মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ করেছেন—অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রুক্ষ মেজারের ইংরাজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ করলে—"Who the devil are you?" তিনি ভীত হয়ে বল্লেন—"Professor Ram Chandra Mittra, Professor Presidency College—"

উত্তর হ'ল—'D—your Professor' তখন তিনি ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বল্লেন—"Let us forget and forgive, let us exercise the Christian virtue of forgiveness."

আমরা সকলে একবার সিংহলে ব্যাড়াতে গিয়েছিলুম্। ষ্টীমারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেশববাবু আর কালিকমল গাঙ্গুলী বলে একটি আমুদে মজলিসী লোক,—'কোলাই কোমল গাঙ্গুলাই' বলে আপনার পরিচয় দিতেন। সমুদ্রের উপরে রামমিত্রের গল্প আমাদের এক প্রধান খোরাক ছিল। সে সব কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের নাড়ী ছিঁড়ে যেত।

'কোলাই কোমল' শেষে আমাদের ভারি মুস্কিলে ফেলেছিলেন। দেশে ফেরবার সময় তিনি কি একটা কাজের ছুতো করে বোটে উঠে ডাঙ্গায় নেমে গেলেন। এই আসছি বলে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হ'লেন তার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে ষ্টীমার চলে গেল। তার দুএক সপ্তাহ পরে তবে কলকাতায় আবার তাঁর দেখা পাই।

কেশবচন্দ্র সেন (৫৭ পৃষ্ঠা)

বিলাত যাত্রা

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমার বিলাত যাত্রা। আমি কখনও স্বপ্নেও যা ভাবি নাই আমার ভাগ্যে তাই ঘটল। আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যায়—দৈবের কি বিচিত্র গতি! এক একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের জীবনস্রোতকে কোন্ এক অজ্ঞাত নূতন পথে যেন বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে যায়—যার পূর্ব্বাভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই। আমাব জীবনে এ কথা সপ্রমাণ দেখতে পাই। আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হচ্ছিল, দৈবঘটনায় কোন এক বন্ধু-মিলনে সে সমস্তই উল্টে গেল, আমার জীবন-প্রবাহ অন্য দিকে বিবর্ত্তিত হ'ল। সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশযাত্রা, ইংলণ্ডে গিয়ে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাবণে আমার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটল।

বাল্যকাল হ'তে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত ছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু মন্দ গতিতে চলছিল যে, তাব প্রভাব বিশেষ অনুভব করতে পারিনি। আমার পিতা সিমলা পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর এমন এক ঘটনা উপস্থিত হ'ল যাতে সেই সমাজের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হ'ল। সেই ঘটনা হচ্ছে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলন। কেশবেব আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চাব হ'ল। তিনি কোন্ সূত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন—আমি তাঁকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। পিতাব সহিত তিনি এই বিষয় পরামর্শ কবতে আসেন। পরামর্শে স্থির হ'ল যে, এই মন্ত্রে যখন তাঁর বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। মন্ত্র গ্রহণ না করাই তিনি স্থিব করলেন। সেই অবধি তাঁর উপব তাঁর বাড়ীর লোকদের অত্যাচার আরম্ভ হ'ল এবং পরিশেষে তিনি সব ছেড়েছুড়ে সস্ত্রীক আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ কবলেন—পিতাও তাঁকে স্নেহপূর্ব্বক আপনার পুত্ররূপে বরণ করে নিলেন। সেই সময় থেকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর পত্নী আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে আমাদের বাড়ীতে কিছুকাল বাস কবেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই মধ্যাহ্নকাল;—কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করলে। আমিও সেই উৎসাহ-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলুম। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হ'তে পিতার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ, আর আমাদের রচিত

নব নব ব্রহ্মসঙ্গীত মিলে সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নূতন শ্রী, নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। আমি এই সব নিয়ে মেতে আছি এমন সময় মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ী অতিথি হয়ে থাকতে এলেন। যেন একটা বোমা আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙ্গে চূরে দিয়ে গেল।

মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ। তাঁর পিতা রামলোচন ঘোষ আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন, ঐ বন্ধুতা সূত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বন্ধুতা জন্মেছিল। একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন, তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, "An old head on young shoulders"—যুবার ধড়ে বুড়ার মাথা। বাস্তবিকও তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তাঁর বয়স তখন ১৭ হবে অথচ Indian Mirror সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি অকাতরে স্কন্ধে নিলেন। ঐ বয়সে তাঁর মাথায় Civil Service পরীক্ষার কল্পনা খেলছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হ'ল না। তিনি ভেবেছিলেন এক, বলবত্তর দৈব তাঁকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। আমার জীবনক্ষেত্র বোম্বাই, তাঁর হ'ল বাঙ্গালা দেশ; আমার কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের চাকরী, তাঁর স্বাধীন আইন ব্যবসা; তিনি যে ক্ষেত্রে জয়লাভ করলেন সেই তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র, আমিও আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পেলুম। কেবল দুঃখ রইল আমাদের একযাত্রায় পৃথক ফললাভ ঘটল।

আমাদের বিলাত যাওয়া একরকম ঠিক হয়েছে এমন সময় আমরা একদিন Botanical Garden-এ বেড়াতে যাই। পার হবার সময় একটা ষ্টিমারের ধাক্কায় আমাদের নৌকা উল্টে গেল। আমি সাঁতার জানতুম, নৌকার একভাগ কোনরকম করে আঁকড়ে ধরে রইলুম কিন্তু মনোমোহন নৌকার তলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন, তাঁর আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক পান্‌সীর মাঝি তাঁকে টেনে ওঠালে। আমরা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গম্য স্থানে চলে গেলুম—সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে চেড়িয়ে যথা সময়ে বাড়ী ফিরলুম। এই বৃত্তান্ত বাবামশায়ের কর্ণগোচর হওয়াতে আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন, "তোমরা এখানেই আপনাদের আপনারা সামলাতে পার না তোমাদের ঐ দূরদেশে পাঠান যায় কি করে? তোমাদের কেউ সঙ্গী নেই, রক্ষক নেই, আপনার উপরে নির্ভর করেই যেতে হবে, তোমরা তা পেরে উঠবে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।" বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা

মনোমোহন ঘোষ

(৫৮ পৃষ্ঠা)

অসমসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম বলতে হবে। আমরা দুটি তরুণবয়স্ক বালক আর তখন ইংলণ্ডে যাওয়া এখনকার মত এপাড়া ওপাড়া নয়। Suez Canal তখন প্রস্তুত হয় নাই, Suez থেকে Alexandria পর্য্যন্ত রেলপথ। এই পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের মত বালকের পক্ষে সহজ ছিল না। তখনকার কালে লোকে 'কালাপাণি' পার হওয়া এক অসাধ্যসাধন মনে করত—অকারণে নহে; কেননা আমাদের মধ্যে প্রথম যে দুইজন যাত্রী যান, রামমোহন রায় ও দ্বারিকানাথ ঠাকুর, তাঁদের আর দেশে ফিরে আসতে হয় নাই। কাজেই লোকেদের ধারণা ছিল যে ও-দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না—

"The land from whose bourne
no traveller returns"

যা হোক্ শেষে আমাদের যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। আমি ত আমার প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অকূল পাথারে ভেসে পড়লুম। আমার সে সময়কার একটি বিদায়ের গান এই :—

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন
কোন প্রাণে চলে যাব বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন॥
শরীর যদিও যাবে, মন সদা হেথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত,
কভু না ছাড়য়ে তবু পাদপ-বন্ধন॥

আমরা পথের সমুদায় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে ভালয় ভালয় আমাদের গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলুম, আমাদের জাহাজ Southampton বন্দরে নোঙর করবামাত্র আমার আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর * আমাদের নিতে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠলুম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও দুই কন্যা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিলেন। তাঁদের অতিথি হয়ে কিছুকাল সুখে কাটান গেল। তাঁদের বাড়ী খৃষ্ট-মিসনরিদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুবিধা পেলুম। সেখানে Hodgson Pratt নামক একটি ভারতহিতৈষী মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল, তিনি অভিভাবকের ন্যায় আমাদের অত্যন্ত যত্ন

* ইনিই প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার;—অনেকে হয়ত তা জানেন না!

করতেন। তাঁবই পরামর্শে আমরা মাসকতক পরে Windsor-এর নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরীক্ষাব উপযোগী পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রইলুম। গৃহটি ছাত্রাবাস ধরণের স্থান, আমরা ছাড়া আরো কয়েকজন ছাত্র ছিল। যিনি গৃহস্বামী তিনি আমাদের ইংরাজী শিক্ষক, সংস্কৃত, আরব্য, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অন্য বিষয়ের জন্য অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। Dr. G. একজন রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সেইরূপ মুখরা। বুড় বুড়ীর মধ্যে যে খুব বনিবনাও ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই খিটিখিটি চলত। তাঁদের কন্যারত্ন—একটি প্রাপ্তবয়স্কা কুমাবী গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, তিনি অনেক পরিমাণে এই অশান্তির প্রতিবিধান করতেন। আমাদের পড়ার মাঝে যা কিছু সময় থাকত তাঁরই সংসর্গে কাটাতুম। কাছে একটি ছোট্ট নদী ছিল, তাতে আমবা কেহ কেহ বোটে করে ব্যাড়াতে বেরতুম। মনে আছে একবার আমি কৌতুকক্রমে তাঁর মনে ভারি আঘাত দিয়েছিলুম। তিনি আমাকে একটি ফুল উপহার দেন—সযত্নে আমাব বুকেব উপর কোটে পবিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফুলটি শীঘ্র শুকিয়ে গেল। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—"এব মধ্যে ফুল শুকিয়ে গেল—এর কারণ কি?" আমি উত্তব দিলুম, "ভিতব থেকে রস পায়নি বলে বেচারা অত শীঘ্র মুষড়ে পড়েছে।" Miss G. মনে করলেন আমি তাঁর উপর কটাক্ষ করে এ কথা বল্লুম—যদিও আমি কেবল কথার কথামাত্র বলেছিলুম, কোনই গূঢ় অভিপ্রায় ছিল না। যা হোক্ আমার এই অনবধানের উক্তির দরুণ আমি তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলুম—কত সাধ্য সাধনার পর তাঁর মানভঞ্জন হ'ল। এই ছাত্রাবাসে থেকে পাঠাভ্যাসে আমাদের বিস্তর খাটতে হ'ত; মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা সকাল পর্য্যন্ত নিয়মিত পরিশ্রম করতে হ'ত; এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য্য। এই পরিশ্রমের কুফল হওয়া দূরে থাকুক সদ্য সদ্যই সুফল ফললো। ১৮৬২ সালে আমি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম। যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় তখন আমি মনোমোহনের সঙ্গে য়ুবোপে ভ্রমণে বেরিয়েছি—প্যারী নগরীতে 'পাস' হওয়া সংবাদ আমার হাতে এল। আমি 'পাস' মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম বৎসরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হ'তে পারব এরূপ আশা করি নাই। আমার আশাতীত ফল লাভ হ'ল তাতে আমার আনন্দ কিন্তু আমার বন্ধুর নৈরাশ্য সংবাদে সে এক রকম 'হরিষে বিষাদ' বোধ করলুম। সে যাই হোক্ আমাদের মনের কথা মনেই রইল। তখন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি—আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন করা প্রথম কাজ। প্যারী হ'তে আমরা Switzerlandএ প্রবেশ করলুম। 'প্যারী' এই নামের সঙ্গে কি মধুব স্মৃতি জড়িত আছে। নগরটি কি সুন্দব! দুই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ গিয়েছে—(Boulvards), বিপণিগুলি

কি সুসজ্জিত, কি লোভনীয়! প্রাসাদ চিত্রশালা সকলি মনোরম, প্যারীর কি এক সম্মোহন মন্ত্র আছে বিদেশীর মন লণ্ডন অপেক্ষা সহজে আকর্ষণ করে। লণ্ডন এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, তার ভিতরে অনেক দেখবার জিনিষ, অনেক শেখবার বিষয় আছে – তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিস্তর সময়সাপেক্ষ; কিন্তু প্যারীর সৌন্দর্য্য প্রথম দর্শনেই নয়নমন হরণ করে। প্যারী হ'তে Swiss-দের দেশে গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখে নিলুম। সরোবরের ক্রোড়লীন জেনেবা নগরী; Lausanne যেখানে গিবন তাঁর রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস সমাপন করেন;—Chillon দুর্গ যার বন্দী কাহিনী বাইরণের কবিতায় বর্ণিত,—রিগির পাহাড় যার উপর থেকে সূর্য্যের উদয়াস্ত শোভা দেখবার জন্যে যাত্রীরা দলে দলে সমাগত হয়। তখন পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্য্যন্ত রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় নাই, পদব্রজে ওঠানামা শ্রান্তিজনক কিন্তু উপরে গিয়ে সূর্য্যাস্তের চমৎকার শোভা দর্শনের ফলে সকল শ্রান্তি দূর হয়। Switzerland-এর পার্ব্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর। গিরি সরোবর সমন্বিত চমৎকার শোভা। সেখানকার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট মূর্ত্তি নয়– তারা অভ্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণ দর্শন নহে—সে গিরিশ্রী অন্যরূপ, যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত আয়ত্তের ভিতর—ঘরের জিনিস। ও-দেশের ধবলাগিরি হচ্ছে Mont Blanc– সেও 'সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল।' তার অধিত্যকায় শামুনি গ্রামে আমরা কয়েকদিন বাস করি—সেই গ্রাম হ'তে পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত গাত্র দিয়ে ওঠানামা করে মনের সাধে বেড়িয়ে বেড়াতুম।

শামুনি হ'তে সেই গিরিরাজের সম্মুখীন হয়ে কবি কোলরিজের স্তব মনে পড়ত—

> "O dread and silent Mount! I gazed upon thee,
> Till thou, still present to the bodily sense,
> Did'st vanish from my thought. Entranced in prayer,
> I worshiped the Invisible alone!—"

হে গিরিরাজ, তোমাকে ভুলিয়া সেই অমূর্ত্তের ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

শেষে ষ্টিমারে করে Lucerne সরোবরের উপর পরিভ্রমণে আমাদের ভ্রমণের পালা সাঙ্গ হ'ল। য়ুরোপের মুক্তক্ষেত্র হ'তে আবার আমরা ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করলুম। বাড়ী গিয়ে আমার এই জয়বার্ত্তা ঘোষণা করবার জন্য মন ছটফট করছে কিন্তু এই গেল প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য আর এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। সে বৎসর লণ্ডনে University Hall গৃহে সেই পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনায় সময় কেটে গেল। সেও এক ছাত্রাবাস কিন্তু প্রথমোক্ত পল্লীতে আমরা যে-ভাবে ছিলুম এখানে তা হ'তে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব। যিনি আমাদের প্রিন্সিপাল

ছিলেন তিনি নির্লিপ্তভাবে দূরে দূরে থাকতেন—তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে যা আমাদের দেখা হ'ত। আমাদের সব নিজের নিজের গোছগাছ করে নিতে হ'ত। দু একটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখন কেবল একটির নাম (Schwanne) দেখতে পাই, যিনি এক্ষণে পার্লামেন্টের মেম্বর। দ্বিতীয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমার দেশে ফেরবার সময় এল। তখন আমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির আশীর্ব্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম। মনোমোহন 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' পণে সে দেশেই পড়ে রইলেন। কবির আশীর্ব্বাদ—

সুরপুরে সশরীরে, শূরকুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী!
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভবতলে!
যাও দ্রুতে, তরি
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী। যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!*

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের কাছে আমরা অল্প সময়ই থাকতুম। একালে যেমন পিতাপুত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে মেলামেশা দেখি, তখনকার কালে তেমনটি ছিল না, ছোটরা বড়দের অত্যন্ত সমীহ করে চলতো। আমাদের যা কিছু আমোদ আহ্লাদ মেলামেশা সে পিতার পারিষদবর্গের সহিত, তাঁদের কাছেই মনখুলে কথা কবার সুযোগ হ'ত।

দেবেন্দ্রসভা

দেবেন্দ্রসভায় নানা লোকের সমাগম ছিল, তার মধ্যে কতকজন খাস-দরবারের লোক। আম-দরবারে যে সব লোক যাওয়া আসা করত তাদের কথা পাড়বার আবশ্যক নেই। এইমাত্র বলে রাখি যে, এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবণিক শ্রেণীর লোক। এখন আর সে দলের লোক দেখতে পাই না—এমন হ'তে পারে যে, এক্ষণে কাঞ্চন-দেবতার

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

আরাধনায় মগ্ন থেকে তাঁরা আর উচ্চতব সাধনাব সময় পান না। যে সকল লোক এক সময়ে দেবেন্দ্রসভার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের দু চারজনের কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত—ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর মাথায় কতরকম speculation খেলত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারতেন না। আজ চায়ের ব্যবসা, কাল বই, পরশু কাপড়—তাঁব কথা শুনলে মনে হ'ত এবার বুঝি সোনার কাটি হাতে পেয়েছেন—যাতে ছোঁয়াবেন সোনা ফলবে। শেষে দেখা যেতো কোনটাতেই তাঁব মনোমত ফললাভ হ'ল না।

আর এক ছিলেন রাজা কালীকুমার; জাতিতে স্বর্ণবণিক, হৃষ্টপুষ্ট, শুচিবাইগ্রস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন। তিনি পারস্য সাহিত্যেব অনুবাগী ছিলেন--তাঁর সহচর একটি মুসলমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তাঁর ফাবসী বয়েৎ আওড়ানো মনে পড়ে—একটি স্তোত্র মনে আছে, তা এই ঃ—

তু জান পাক-অয় সব্বসর্ বে আব থাক, অয়ি নাজ্‌নি
(তুমি প্রাণ, পবিত্র সর্ব্বশঃ, না আপ মাটি, হে প্রিয়তম)

বল্লা জ্-জাঁ হম্ পাকতর রূহে ফদাক্ অয়ি নাজ নি
(ও আল্লা প্রাণ হ'তও পবিত্রতর আত্মায় লীন হে প্রিয়তম)

তুমি প্রাণ, তুমি ওহে পূর্ণ পুণ্যময়.
প্রপঞ্চ অতীত তুমি, ওহে প্রিয়তম।
প্রাণ হ'ত পুণ্যতর তুমি হে মহেশ,
একাত্মা তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম॥

বড়দাদা রাজার নাম রেখেছিলেন 'সন্তোগ বিলাস।'

সন্তোগ বিলাস নামে মাংসের ঢিবি
মধো শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি জীবী।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনবাবু ছিলেন দেবেন্দ্রসভার বিদূষক। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাস্য পরিহাস করতেন। আমাকে ডাকতেন 'পক্ষী' বলে। তিনি কখনো কখনো আমাদের কোন মিষ্টান্নের ভাগ দিয়ে বলতেন—

অর্দ্ধ রুটি যদি খায় ঈশ্বরের জন
তাহার অর্দ্ধেক করে অন্যে বিতরণ।

কত পাগলামী ছড়া আওড়াতেন সব মনে নেই। দুএকটা বলি—

অজসা গরসা

দুই সাপ—এই কালীয়দমনের দুই সর্দ্দার রাম ও শ্যাম—

ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোমাদের কার্য্য
তোমাদের কার্য্য সকলের অনিবার্য্য
যখন তোমরা গিয়া চড় যার ঘাড়ে
অজসা গরসা আদি সবে তারে ছাড়ে।

অজসা গরসা যেন ছাড়ল, এখন রামশ্যামের হাত থেকে রক্ষা করে কে?

সাপ ও বেঙের কথোপকথন

সাপ—"জিহ্বা লিড়ি বিড়ি দিড়ি কিচড়ি মিচড়ি করি কুপ—"

(আমি যদি কুপ করে তোকে খেয়ে ফেলি?)

ব্যাঙ—"হম্ যদি পানিমে ডুব গয়া ভুসম ভুসড়ি খায়া গুজড়ি মুজরি করি গুপ—"

(আমি যদি গুপ করে জলে ডুবে যাই?)

নবীনবাবু চার রকম ভিন্ন প্রকৃতি লোকের কথা বলতেন—

বেগবেগা, বেগচেরা, চেরবেগা, চেরচেরা। স্মরণশক্তির তারতম্যে এই চার রকম লোক হয়।

বেগবেগা,—যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায়;
বেগচেরা,—যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে;
চেরবেগা,—যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায়;
চেরচেরা,—যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে।

এর মধ্যে অবশ্য বেগচেরা হওয়াই প্রার্থনীয়। তার নীচে চেরচেরা। চেরবেগাই অধম।

উপরে নবীনবাবুকে বিদূষকরূপেই চিত্রিত করে দেখান গেল, কেননা তাঁর ঐ দিক্‌টাই আমাদের চোখের সামনে থাকত; কিন্তু তা ছাড়া আর আর দিকেও তিনি ব্যাখ্যান-যোগ্য। সাহিত্য-সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। কেবল আমাদের ঐ বয়সে তাঁর বিদ্যাসাধ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারতুম না। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন ও দক্ষতাসহকারে কয়েক বৎসর সেই কার্য্য সম্পাদন করেন। তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন তখনকার অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হ'ত। ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বিশ্বকোষের পাতা উল্টে দেখলে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেকগুলি লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পত্নী ও সখী (৫৯ পৃষ্ঠা)

অক্ষয়কুমার দত্ত (৬৫ পৃষ্ঠা)
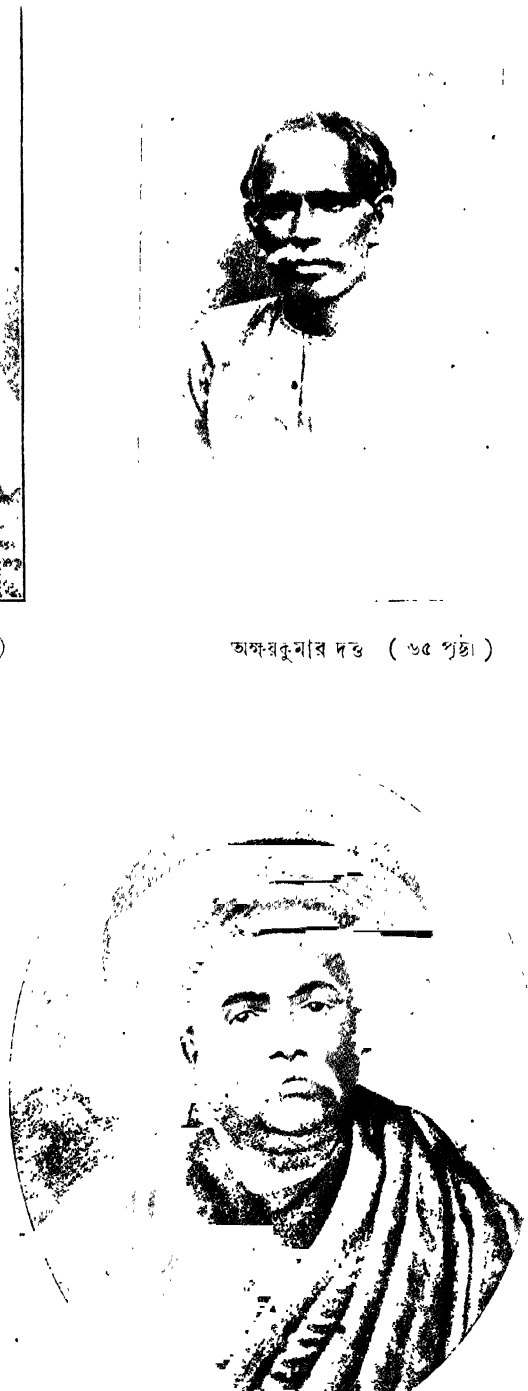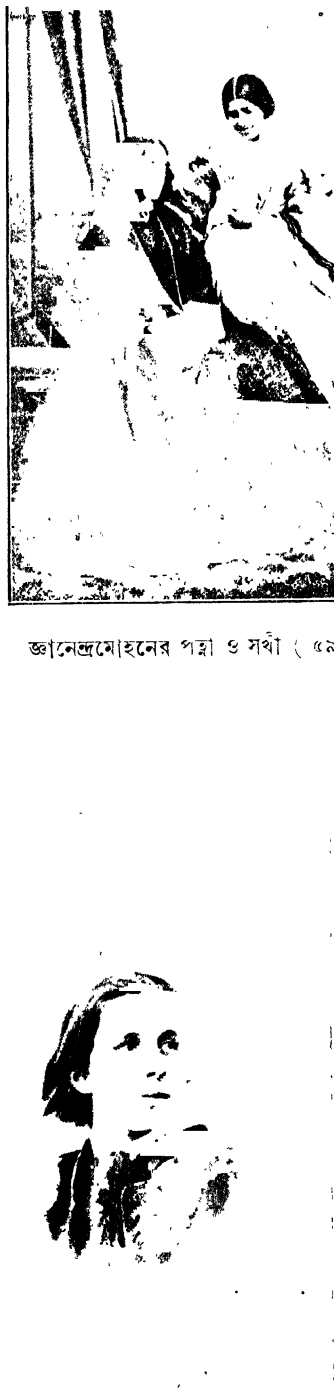
অক্ষয়কুমার দত্ত

ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, সেই সময় থেকে আমাদের বাড়ী তাঁর যাওয়া আসা। এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ আমার পিতার আত্মচরিতে যা লেখা আছে তা এই ঃ—

"আমি ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজূটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোক-হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথমে সে অভাব পুরণ করে।"

অক্ষয় বাবুর একটা উঁচু Standing desk ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন—"ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।"

তখনকার কালে অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন। যখন তাঁরা সেই ভাষা গড়ে তুললেন তখন তা সংস্কৃতবহুল হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু "উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তাঁরা বাঙ্গলাকে যে পরিচ্ছদ পরালেন তা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হ'ল। অক্ষয়বাবুর লেখার এক নমুনা আরম্ভে দিয়েছি, আর একটি নমুনা এখানে দিচ্ছি, তা হ'তেই এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে।

সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা

"অনন্তর বিশ্বলোচন তিমিরমোচন তরুণ বিভাকর, যবাকুসুম-সদৃশী আশ্চর্য্যময়ী মহীয়সী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, পূর্ব্বদিকস্থিত সুরাগ-রঞ্জিত প্রবাল-মণ্ডিত সুরম্য প্রাসাদ

হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজাল বিকীর্ণপূর্ব্বক, নবপল্লব-পরিবেষ্টিত সমুন্নত তরুশিখা সকল অতি মনোহর হিরণ্ময় মুকুটে ভূষিত করিতেছে এই আশ্চর্য্য দর্শন দর্শন করিয়া ইত্যাদি।"

"১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত অক্ষয়বাবু সুদক্ষতাসহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে অর্থোপার্জ্জনের কত উপায় তাঁর হস্তের নিকট এসেছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক একদিন জ্ঞানালোচনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না।"

"অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারি প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মত হ'তে সুরক্ষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজেব ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়েব প্রতিবাদ কবিয়া বিচাব উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারি প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তা ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"*

বেদোপনিষদ্ ব্রাহ্মধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠাভূমি হয় মহর্ষির ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহুপ্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিতার আত্মচরিতে এই বিষয়ে তাঁর মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"প্রথমে বেদ ধবিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন কবিতে পারিলাম না, তাহার পবে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ্ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন কবিতে পারিতেছি না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়েই তাহার পত্তন ভূমি।" * * * "উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষৎকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতু সমস্ত খনিতে কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।"

---

* রামতনু লাহিড়ী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

অক্ষয়বাবুর শেষ জীবনের কথা শাস্ত্রীমশায়ের বই থেকে এইখানে বলে এ ভাগ শেষ করি—

"ইহার পরেও অক্ষয়বাবু কয়েক বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধ্যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময়ে মস্তিষ্কে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা হইয়া লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।"

"ইহার পরে একপ্রকার জীবনমৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। অধিক কি, তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সঙ্কলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া যাইত; এইরূপ করিয়া এই মহাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।"

ধন্য তাঁর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়! এই গ্রন্থখানি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।

এইরূপে যখন তিনি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমি কাশীপুরে গঙ্গার ধারের এক বাগানে মাস দুই কাটিয়েছিলুম। কি পরিবর্ত্তন! আগেকার সেদিন আর নাই, সে স্ফূর্ত্তি, সে উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয়েছে—সে অক্ষয় আর নাই। শরীরে তৈল মর্দ্দন, ওজন করে ঔষধ সেবন, মাপ জোক করে আহারের ব্যবস্থা—এই প্রকার শরীর সেবাতেই দিনযাপন করতেন। সেই প্রখর জ্ঞানোজ্জল চিত্ত সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

"জীবনের অবসানকালে তিনি বালিগ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যান-বাটীতে থাকিয়া এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠে তাঁহার দেহান্ত হয়।" ২০৭—২০৮ পৃঃ

দেবেন্দ্রসভার সভাসদ আরো অনেক ছিলেন, তাঁদের কথা বলবার আর প্রয়োজন নাই। একবার আমরা বাবামশায়ের সঙ্গে এই সব দলবল নিয়ে বরাহনগরের

একটি উদ্যানে কিছুদিন যাপন করেছিলুম। সে সুখের দিন আমার স্মৃতিপটে চিত্রিত আছে। রাজা কালিকুমার ও পবিজনবর্গের আরো অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। পিতৃদেব এই দলবলে বেষ্টিত হয়ে একটি ধবল প্রস্তরাসনে বসতেন, তাঁর বর্ণনা বড় দাদার একটি কবিতায় আছে—

শুভ্রমূর্ত্তি কান্তিমান্, শুভ্র বেশ পরিধান,
উন্নত শরীর সুগঠন,
বেষ্টিত স্বজনগণে, ধবল প্রস্তরাসনে,
বসিয়া ব্রহ্মর্ষি তপোধন।

সংসার দুর্দ্দিনে ঝড় অসামান্য ঘোর
দিবারাত তাঁহার উপরে করে জোর।
অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়,
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়॥

এখানে আমার জীবনস্মৃতির এই একপালা সাঙ্গ হ'ল। এখনো পাঠকদের কাছ থেকে 'আমার কথাটি ফুরলো' বলে বিদায় নেবার সময় হয়নি, পরে আর এক ভাগ আরম্ভ করা যাচ্ছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বোম্বাই প্রবাস

বোম্বাই যাত্রা *

আমি সিবিল সর্ব্বিস্ পেকেটে করে ১৮৬৪ সালের শেষভাগে ইংলণ্ড হ'তে দেশে ফিরলুম। পথের মধ্যে একবার ইটালীর বিখ্যাত পুরী Florence-এ নেমে আমার বন্ধু Pulzky-র বাড়ীতে সপ্তাহকাল যাপন করা গেল। ইংলণ্ডে Dr. G.-র ছাত্রাবাসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, তিনি তাঁর পিতার ভবনে আমাকে সাদরে ডেকে নিয়ে আতিথ্য-দান করলেন। পুল্‌জ্‌কীরা হঙ্গেরিজাতীয় সম্ভ্রান্ত বংশের লোক; তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে চরিত্রগত মিল দেখা গেল। তাদের রীতি নীতি দেখে মনে হ'ত তাঁদের ঘর যেন পূর্ব্ব পশ্চিমের সন্ধিস্থল, আমাদের মত কতকটা ঢিলেঢালা সাদাসিদে ভাব অথচ পশ্চিমেরও বিশেষত্ব আছে। Pulzky-র পিতা ভারতবর্ষের কলাকৌশলের নিদর্শন বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন ও আমাদের দেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানাতেন, বলতেন ইণ্ডিয়া আমার স্বপ্নরাজ্য। Florence নগরীর চিত্রশালা প্রভৃতি যা যা দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে ঐ হঙ্গেরীয় পরিবার মধ্যে সপ্তাহকাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হ'ল। নগরের মধ্যে কত উৎকৃষ্ট ফলের বাগান, আমরা আঙ্গুর ও আঞ্জীর (Fig) পেড়ে খেতুম—সে যে কি মিষ্টি লাগত কি আর বলব! পুল্‌জ্‌কী পরিবারের একটি বালিকা আমার এমন ন্যাওটো হয়েছিল যে, সে কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না—তাকে আমি দু একটি বাঙলা গান শিখিয়েছিলুম—শেষে কত চোখের জল ফেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে। সেই ছবিটি এখনো আমার মনে অঙ্কিত আছে। Florence হ'তে Pisa—Pisa-র লীনস্তম্ভ (leaning tower) দর্শন করে জিনিবায় এক পূর্ব্বমুখী ষ্টীমার ধরে যথাসময়ে কলকাতায় এসে উত্তীর্ণ হলুম।

বাড়ী এসে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, বন্ধুবান্ধবদের অভিনন্দনের মধ্যে সময়টা বিদ্যুৎবেগে চলে গেল। আমাদের বড়লাট তখন Lord Lawrence, ছোটলাট Sir Cecil Beadon—দুই কর্ত্তারই দর্শন স্পর্শন মিষ্টভাষণ লাভ হ'ল। প্রথম সিবিলিয়নকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বেলগেছে (হায়, সে বাগান আর আমাদের নাই) এক বিরাট সভা আহূত হ'ল, সেখানে কলকাতার গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার

* এই ভাগের অনেক কথা আমার প্রণীত "বোম্বাই চিত্র" হইতে সংগৃহীত।

ইংলণ্ড প্রবাসের অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। তখন মনে মনে অহঙ্কার হ'ল যেন কি একটা দুর্লভ রত্ন আমার করতলন্যস্ত হয়েছে। এই সকল মায়া কাটিয়ে নবেম্বর মাসে আমি ও আমার স্ত্রী—আমরা দুটিতে ষ্টীমারে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে সময়ে বোম্বাই ও কলিকাতার বন্ধনী রেলগাড়ী ছিল না, প্রধানতঃ সমুদ্রের উপর দিয়েই গতিবিধি। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে পাথেয় সংগ্রহ করা, বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদান, এই রকম করে আমাদের জাহাজ থেমে থেমে চলতে লাগল। বোম্বাই পৌঁছতে আমাদের প্রায় এক মাস অতীত হয়ে গেল। মান্দ্রাজে নেমে মুদলিয়ার নামে একটি সম্ভ্রান্ত মান্দ্রাজীর বাড়ীতে উঠলুম। জাহাজেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি নিরামিষভোজী, ইংলণ্ডে তাঁর অন্নকষ্টের গল্প করতেন, দুধ ও ফলাবের উপরেই অধিকাংশ নির্ভর করে কষ্টেস্রষ্টে কোনমতে দিনপাত করতে হ'ত। য়ুরোপে আমাদের জাতের নিয়ম রক্ষা করে চলতে হ'লে যে কি কষ্ট তা যে ভুক্তভোগী সেই জানে। মুদলিয়ার বেশ ইংরাজি বলেন, তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা কবার কোন বাধা নাই; কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা ইংরাজির কোন ধার ধারেন না, না তাঁরা আমাদের ভাষা বোঝেন, না আমরা তাঁদের ভাষা বুঝি, কেবল ইঙ্গিত ইসারায় আমাদের কথাবার্ত্তা চলত। তাঁদের সব ঘরাও বন্দোবস্ত আমাদের পছন্দসই ছিল না, কিন্তু তাঁরা যথাসাধ্য আমাদের আতিথ্যসৎকারের কোন ত্রুটি করেন নাই। আহার সামগ্রী কলাপাতের উপর সাজানো, ডাল ভাত চাটনী তরিতরকারী দধি পায়স মিষ্টান্ন মিলে আমাদের ভূরি ভোজনের আয়োজন হ'ত।

আমরা যে মান্দ্রাজে নেমে ডাঙ্গায় দু তিন দিন কাটিয়েছিলুম সে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে—জাহাজে ফিরে গিয়ে শুনি যে, ইত্যবসরে বরুণ দেবের কোপে ঝড় তুফান উঠে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে গিয়েছে, জাহাজের দোলায় যাত্রীরা ব্যতিব্যস্ত, তীর থেকে মধ্যসমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের একটি দাসীর মুখে শুনলুম, তাদের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। পথে আমাদের আর কোন উপদ্রব হয় নাই। আমরা এইরূপে ধীরে ধীরে বোম্বাই গিয়ে পৌঁছলুম।

বন্দরে উঠে দেখি, মাণকজী করসদজী নামক একটি পারসী ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করে তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলেন, তাঁদের গৃহে প্রায় তিন মাসকাল আমরা অতিথি হয়ে রইলুম। সেই অজ্ঞাত সহর, অপরিচিত লোকের মধ্যে বাস, এই অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে স্থান পেয়ে বড়ই সুবিধা হয়েছিল, তাঁদের এই অযাচিত অনুগ্রহ আমাদের পরম ভাগ্য মনে করলুম। তাঁর গৃহে বাস করে বোম্বাই সম্বন্ধে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা জন্মাল। ভাওদাজী, জমসদজী জিজিভাই

বাটলীওয়ালা, জগন্নাথ শঙ্করসেট, রাম বালকৃষ্ণ, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রভৃতি খ্যাতনামা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। মাণকজীদের সম্বন্ধে আমার সেই সময়কার এক পত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

মাণকজী করসদজী

"বোম্বাই গিয়াই এই পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমার কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্ব্বে আমি কয়েক মাস সস্ত্রীক ইহাদের বাটীতে বাস করি। বাড়ীটা বড় সড় কোটাবাড়ী দোতালা, ইংরাজি ধরণে সাজানো ও কতকগুলি মূল্যবান্ চিত্রফলকে অলঙ্কৃত। বৃদ্ধ মাণকজী গৃহকর্ত্তা, তাঁর দুই কন্যা তাহার গৃহ-প্রদীপ। একজন পারসী ভৃত্য—তার নাম জিলা। জিলাকে জরির কাপড় পরাইয়া সাজাইয়া দিলে চাকর মনিবে বড় তফাৎ জানা যায় না। মনিব অপেক্ষা চাকর সুশ্রী ও এক হাত উচ্চ। মাণকজী যেমন আকারে খর্ব্বকায়, স্বভাবেও তাঁর কতকটা তেমনি ছেলেমানুষি জাঁকের ভাব, ঐ ক্ষুদ্র দেহটি আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। কোন কোন লোক আছে—সে আপনার চোখে আপনি মস্ত লোক—সারাদিন সগর্ব্বে পুচ্ছ ফুলাইয়া বেড়ায়, সময় নাই অসময় নাই অবাধে আপনার গুণগান করিয়া যায়, শ্রোতা কি ভাবিতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; মাণকজী ঐ ধরণের লোক। বড় বড় ইংরাজ ও রাজা রাজড়ার পরিচিত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে তাঁর বড় আমোদ, য়ুরোপের সমুদায় মুকুটধারী সম্রাটদেরই সহিত তাঁহার গলাগলি ভাব—এইভাবে অনেক সময় তিনি তাঁর য়ুরোপ প্রবাসের গল্প করতেন। কোন্ লর্ড তাঁহাকে কোন্ পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, কোন্ কালে তাঁর কোন্ পামফ্লেট ছাপা হইয়াছিল এই সব আত্ম-কাহিনী শুনাইতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন, যে শুনছে সে কোনমতে রেহাই পেলে বাঁচে। মানুষ দোষ গুণে জড়িত, দোষ ধরিতে গেলে কার না ধরা যায়? মাণকজীর অনেক সদ্গুণও আছে—সহৃদয় সাদাসিদে সরল অন্তঃকরণ, কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটু খামখেয়ালী ভাব মেশান। মাণকজী ইংরাজদের সঙ্গে মিশিতে ভাল বাসিতেন কিন্তু আপনাকে ছোট করিয়া নয়—তিনি তাঁহাদের খোসামুদে ছিলেন না। এদিকে যেমন ইংরাজভক্ত তেমনি আবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবারও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যখন ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন গবর্ণর সর বার্টল ফ্রেয়র কোন এক সংবাদ পত্রের রিপোর্ট দৃষ্টে তাঁর কাজের দোষ ধরিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করেন। মাণকজী শীঘ্র ছাড়িবার পাত্র নন, অনেক লেখালেখির পর যখন দেখিলেন যে এদেশে কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, তখন স্বয়ং ইংলণ্ডে গিয়া House of Lords পর্য্যন্ত

আপনার মামলা চালাইয়া কাজ ফতে করিয়া ফিরিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁর পদহানির ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইলেন—শুধু তা নয়, তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কোর্টের উচ্চতর আসন অধিকার করিয়া লইলেন। মাণকজী একটি পারসী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ-পত্নী আলেকজান্দ্রার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন। এটি তাঁর বিশেষ যত্নের ধন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন। লোক দেখাইবার এই একটি জিনিস পাইয়া মাণকজী হাতে এক কাজ পাইয়াছেন, নতুবা পেন্সন লইয়া নিষ্কর্ম্মার ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কোথায় ব্রিটিশ রাজপরিবার, কোথায় বড়লাট সাহেব, কোথায় পোর্ত্তুগীজ গবর্ণর জেনেরেল- কোন একজন বড় লোক বোম্বায়ে এলে হয়, অমনি মাণকজী তাঁহাকে ধরিয়া আপনার স্কুল পরিদর্শনার্থে লইয়া যাইতে ব্যস্ত। ঈশ্বরের কৃপায় স্কুলটি এখন ভাল চলিতেছে— ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক, তাহাদের প্রায় সকলেই পারসী বালিকা—দুএকজন মাত্র হিন্দু-কন্যা। এই স্কুলের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার খাতিরে বৃদ্ধ মাণকজী তাঁর জরতোস্তী প্রার্থনামালা আবৃত্তি করিতে শৈথিল্য করেন না। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া তাঁর জন্দাবস্তার মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করেন। বিজির বিজির করিয়া 'মনস্নি গবস্নি কোনস্নি' কত কি মন্ত্রপাঠ চলিয়াছে, তার মাঝে কাজকর্ম্ম হাসি গল্প—তারও কোন বাধা নাই। মনে হয় ইনি একজন গোঁড়া অগ্নি-উপাসক।

মাণকজীর দুই কন্যারত্নের গুণের কথা কি কহিব, তাঁহাদের সহাস্য সুন্দরমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে চির মুদ্রিত থাকিবে। তাঁহাদের যত্ন শুশ্রূষা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমার স্ত্রীর সেই প্রথম দূরপ্রবাস। অন্তঃপুরের কারাগার হইতে সহসা স্বাধীন সমাজের পূর্ণ আলোকে পড়িয়া পিঞ্জরের পাখীকে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন—এই দুই পারসী ভগিনীর সংসর্গে তিনি অনেক অংশে সেই পরিবর্ত্তনের ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছিলেন। মেয়ে দুটি বয়স্কা কিন্তু উভয়েই অবিবাহিতা। বড়টির তখন Courtship চলিতেছিল। আমরা থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতা অনেকানেক ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ নিমন্ত্রণ করিয়া এক সাহেবী ভোজ দিয়া "ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য রীতি" অনুসারে কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁহার জামাতা করসদজী কামা পারসীমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে পারসী ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক আলোচনা হইত। তিনি এক একবার আমাকে ভজাইবার চেষ্টা করিতেন—বলিতেন "তোমরা ত একেশ্বরবাদী, তোমরা আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর না কেন?" আমি বলিতাম, "অনেক বিষয়ে

তোমাদের মতে আমাদের মতের ঐক্য আছে সত্য কিন্তু মতের মিল যাই থাকুক, একটা জায়গায় মনের মিল নেই, Sentiment-এ ভাবি যা লাগে—সে তোমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যখন মনে করি যে মৃত্যুর পরে আমার দেহ তোমাদের শবস্তম্ভে নিক্ষিপ্ত হয়ে শকুনিদের উদরস্থ হবে তখন যেন গাত্র শিহরিয়া উঠে।” মাণকজীর কনিষ্ঠা কন্যা সিরিণবাই সুশিক্ষিতা, লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তায়, সামাজিকতায়, গৃহকার্য্যে সুদক্ষ। দুঃখের বিষয় তাঁহার শরীর নিতান্ত অপটু, তথাপি এই রুগ্ন শরীর লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা, ভগিনীর গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, বালিকা-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্ত্তব্যসাধনে অম্লানবদনে তৎপর রহিয়াছেন। তাঁহাদের উদার আতিথ্য-সৎকার লাভ করিয়া তাঁহাদের বাটীতে যতটুকু সময় সুখে কাটাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।

‘কামা’ স্বামীস্ত্রী উভয়েই পরোলোকগত হইয়াছেন—সে বৃদ্ধ মাণকজীও আর নাই।

পরিচ্ছদ-সমস্যা

আমরা এই পারসী পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরিচ্ছদ-সমস্যা পূরণ করতে পারলুম। বিলাত থেকে কলকাতায় এসে অবধি এই সমস্যা আমার মনে উদয় হ’ত—বাহিরে নিয়ে যেতে হ’লে আমাদের মেয়েদের পোষাক কি রকম হওয়া উচিত? এখানকার অনেক দোকান ঘুরে শেষে এক ফরাসী মিলিনরের সাহায্যে একটা পোষাক প্রস্তুত করে নেওয়া গেল। ফুলো ফুলো পাজামা জাঙ্গিয়া পেশওয়াজ আর মাথার ওড়না সবশুদ্ধ দেখতে oriental ধরণ, রুচিসঙ্গত মন্দ হয়নি। অনেকটা তুর্কী মহিলাদের সাজ। বোম্বায়ে এই কাপড়ের খুব সুখ্যাতি বেরিয়েছিল। যে সব মেম মাণকজীর বাড়ী আসতেন তাঁরা দেখে একবাক্যে very pretty বলে প্রশংসা করতেন। কিন্তু যতই pretty হোক্ না কেন, আমাদের দেশী কাপড়ের সঙ্গে খাপ খায় না এই এক দোষ। এমন একটা পোষাক চাই যা দেখতে সুশ্রী অথচ আমাদের লোকের চক্ষে বিদেশী বলে ঘৃণিত না হয়। ক্রমে পার্সী সাড়ী ও জামার নমুনায় একটা পোষাক ঠিক করা গেল। পারসী স্ত্রীপুরুষ যে কাপড় পরে তা তাদের নিজস্ব নয়—গুজরাটী পরিচ্ছদের অনুকরণ। পারসীরা যখন স্বদেশ হ’তে নির্ব্বাসিত হয়ে প্রথমে ভারতবর্ষে আসে, তখন তারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরক্ষা করে চলতে বাধ্য হ’ত। তাদের চালচলন দেশীয় অনুকরণে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে। হিন্দুদের অনুরোধে গোমাংস এবং মুসলমানদের যাহা হারাম তাহাও তাদের বর্জ্জনীয়। আহারে যেমন, তাদের পরিচ্ছদেও তেমনি বদল। পুরুষদের গুজরাটী কোর্ত্তা পাগড়ী,

মেয়েদের গুজরাটী ধরণের সাড়ী। পারসী মেয়েদের সাড়ী আমাদের বেশ পছন্দ হ'ল—তাই একটু আধটু পরিবর্ত্তন করে আমরা একরকম আমাদের সাড়ীর মত করে নিলুম, তাছাড়া মাথার ওড়না সে আমাদের নিজস্ব জিনিস। এই বেশ ক্রমে বাঙ্গালা দেশে ভদ্রসমাজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। আশ্চর্য্য এই যে গোঁড়া হিন্দু-পরিবারের মেয়েরাও এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে এখন সঙ্কুচিত নন—এটা খুবই সুখের বিষয় বলতে হবে।

মারাঠী স্ত্রীদের বেশভূষা ঠিক আমাদের মেয়েদের ধরণের নয়। মারাঠী স্ত্রীগণ মাথায় কোনরূপ আবরণ-বস্ত্র ব্যবহার করেন না—খোলা মাথায় চক্রাকার খোঁপা, তার উপর ফুলের মালা ও স্বর্ণাভরণ। নাকে মুক্তাগুচ্ছ নথ। মারাঠী মেয়েদের সাড়ী পরবার ধরণ একটু আলাদা; সাড়ী, তার উপর আবার মাল-কোচা। সামনের দিক্‌টা দেখতে মন্দ দেখায় না, পিছনে মালকোচার বাঁধন স্পষ্ট ধরা পড়ে। মেয়েদের এ পুরুষবেশ আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঠেকে,—কিন্তু পরিচ্ছদ-পরিধান-রুচি অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর। এক কাল ছিল যখন মারাঠা বীরাঙ্গনাদের অশ্বারোহণে সৈন্যসহ এক স্থান হ'তে স্থানান্তরে যাতায়াত করতে হ'ত, তখনকার কালের পক্ষে মালকোচাই উপযুক্ত বেশ। বোম্বাইয়ের হিন্দু স্ত্রীদের একটি অঙ্গাবরণ আমার বেশ পছন্দ হয়—ও-দেশে তাহাকে 'চোলী' বলে, আমরা বলি কাঁচুলী। কি মারাঠী কি গুজরাটী সব মেয়েই এই চোলী ধারণ করে। গুজরাটী মেয়েরা যেভাবে সাড়ী পরে, আমরা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে সেই ধরণে আমাদের মেয়েলী পোষাক প্রস্তুত করে নিলুম।

পারসী রমণীগণ গুজরাটী মেয়েদের মত রেশমী সাড়ী পরে, কেবল মাথায় একটা রুমাল জড়িয়ে রাখে। পারসীদের জাতীয় পরিচ্ছদ 'সদ্‌রা' ও 'কস্তী'। সদরা একটা মলমলের জামা, আর কস্তী বাহাত্তর সূতার কটিবন্ধ, প্রত্যেক জরতোস্তীর ইহা পরিধেয়। জন্দাবস্তায় সদরা সুভদ্র মঙ্গল বসন বলিয়া ব্যাখ্যাত। কস্তী কটিদেশে তিন-ফের জড়িয়ে চার গ্রন্থিতে বাঁধা হয়। প্রত্যেক গ্রন্থি বাঁধবার সময় এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। প্রথম মন্ত্র, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; দ্বিতীয়, জরতোস্ত ধর্ম্মই সত্য; তৃতীয়, জরতোস্ত ঈশ্বরের দূত; চতুর্থ, সদাচরণ করিবে এবং পাপকর্ম্ম পরিহার করিবে। এই চার মন্ত্র পাঠের পর সদরা ও কস্তী পরিধান করে পারসী মানবক জরতোস্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। শুধু মানবক কেন, পারসী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই দীক্ষা গ্রহণ করে।

পারসী জাতি

বোম্বায়ে যে জাতির বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়—সে পারসী জাতি। এ জাতির সংখ্যা সামান্য, সমস্ত হিন্দুস্থানে এক লক্ষ হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু ইঁহাদের অসামান্য উদ্যম, ব্যবসায়-তৎপরতা, কর্ম্মনিষ্ঠতা ও বদান্যতা গুণে ইঁহারা এ দেশীয় জনপদের অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই। পারসীরা যেরূপে এদেশে প্রবেশ লাভ করিল তাহার বৃত্তান্ত এই—সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত ও তাহার শেষ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট কতিপয় অগ্নি-উপাসক ধর্ম্মনাশ ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া বনজঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কতক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের একদল লোক ভারতবর্ষে কাঠেওয়াড় প্রান্তে দিউ নামক বন্দরে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তথায় তাঁহারা ঊনবিংশতি বৎসর যাপন করিয়া জনৈক পারসী জ্যোতিষীর পরামর্শে সে স্থান হইতে গুজরাটে প্রস্থান করেন। এই যাত্রীদল সমুদ্রের উপর প্রবল ঝড় তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইলেন। সেই প্রদেশ তখন যাদুরাণা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। যখন পারসীগণ যাদুরাণার শরণ প্রার্থনা করিলেন, তখন রাণা তাঁহাদের রীতিনীতি ধর্ম্মাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহারা নিজ জাতির বৃত্তান্ত ষোড়শ সংস্কৃত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাজার কর্ণগোচর করেন। এই সকল শ্লোক হইতে পারসীদের আচার ব্যবহার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম বিষয়ে কতক আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা 'গৌরাধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ' বলিয়া কেমন গর্ব্বের সহিত আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

সূর্য্যং ধ্যায়ন্তি যেবৈ হুতবহমনিলং ভূমি মাকাশমাম্বং
তোয়েশং পঞ্চতত্ত্বং ত্রিভুবনসদনং ন্যায়মন্ত্রৈ স্ত্রিসন্ধ্যং
শ্রীহোর্ম্মজ্দং সুরেশং বহুগুণ গরিমাণং তমেকং কৃপালুং
গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ।

আমরা সূর্য্য, অগ্নি, অনিল, জলস্থল, আকাশ, পঞ্চভূত ও বহুগুণযুক্ত সুরেশ হোর্ম্মজ্দকে ন্যায় মন্ত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করি। আমরা সেই গৌর, ধীর, সুবীর ও মহাবল পারসিক।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাঁহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি কড়ার আদায় করিয়া লইলেন। যথাঃ—

তাঁহারা স্বভাষা ছাড়িয়া দেশভাষা ব্যবহার করিবেন, শস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ হিন্দুনারীদের বেশ ধারণ করিবে, রাত্রে বিবাহলগ্ন পরিপালিত হইবে,—এইরূপ কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে তাঁহারা অগত্যা প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহাদের যত্ন পরিশ্রমে সে অঞ্চলের শ্রী ফিরিল। বন-জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া ফলপুষ্পশোভিত উদ্যান, পতিতভূমি শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইল। এই ঘটনার তারিখ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সঞ্জানে কিছুকাল বাস করিয়া পারসীরা ক্রমে উত্তর-গুজরাটের নওসাড়ী, ভরুচ, খম্বায়ৎ প্রভৃতি স্থানে ব্যবসাদার ও বাসন্দারূপে ছড়াইয়া পড়িলেন।

ইহার ছয় শত বৎসর পরে আল্লাউদ্দীন বাদসাহের সেনাপতি আলপ খাঁ সঞ্জান আক্রমণ করেন। সে সময়ে পারসীদের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণার আদেশক্রমে ১৪০০ কবচধারী অশ্বারোহী পারসী সেনা সজ্জীভূত হইল—আর্দেসর পারসী তাঁহাদের নেতা। তাঁহাদের বলবিক্রমে প্রথমে মুসলমান সৈন্য বিপর্য্যস্ত, পরাজিত ও তাড়িত হয়। কিন্তু আলপ খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, পর দিবস ভগ্নসেনা একত্র করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দু ও পারসীদের পরাজয়। বীর আর্দেসর বাণাঘাতে হত হইলেন এবং সঞ্জান মুসলমানদের হস্তে পতিত হইল। পারসীরা তাঁহাদের সাধের সঞ্জান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অন্যত্রে বাসস্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইক্ষণে সঞ্জানে একটি মাত্র পারসীরও বসতি নাই—কেবল পারসী শ্মশানস্তম্ভের ভগ্নাবশেষে তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে।

ইহার পর শতাব্দী পর্য্যন্ত পারসী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের পূতাগ্নি সঞ্জানের অগ্নিমন্দির হইতে নওসাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৫৭৮ সালে আকবর বাদসাহের আদেশক্রমে পারসীরা নওসাড়ী হইতে তাঁহাদের কতকজন বিচক্ষণ পুরোহিত দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সম্রাটকে পারসী ধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশ শ্রবণ করান। উদারমতি আকবর তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া পারসী-গুরুকে নওসাড়ীর নিকটস্থ ভূমিসম্পত্তি উপহার দেন। কথিত আছে যে, সম্রাট পারসী সদরা (জামা) ও কস্তী (কটিবন্ধ) পরিধান করিয়া পারসী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের পর হইতেই পারসীদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত বলিতে হইবে। তাঁহারা দালাল ও মধ্যস্থ হইয়া ইউরোপীয় বণিকদের অনেক কার্য্য করিতেন।

ইংরাজদের সহিত প্রথম হইতেই তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বন্ধন হয়। সুরাটের বাণিজ্য হ্রাসোন্মুখ হইয়া যখন বোম্বাই সহর শির উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে, তখন পারসীরা বোম্বায়ে আসিয়া কেহ বাণিজ্য-ব্যবসা, দোকানদার, কণ্ট্রাক্টদারের কাজ, কেহ বা পোতনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ব্রিটিষ রাজ্যবৃদ্ধি ও ইংরাজ সওদাগরদের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারসীদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়।

প্রাচীনকাল হইতেই পারসীদের ইংরাজ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাটে যখন ইংরাজ বণিকগণ মোগল কর্তৃপুরুষদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হন, তখন রোস্তম নামক একজন পারসী ইংরাজদের প্রতিনিধিস্বরূপে ঔরঙ্গজীবের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বাদসাহের নিকট তাহাদের হইয়া আবেদন করেন। তাহারও পূর্ব্বে রোস্তমজী দোরাবজী কিরূপে বোম্বাই সহর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই:—

১৬৯২ সালে বোম্বায়ে এক ভয়ানক মড়ক ও দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে অনেক ইউরোপীয় বাসন্দা ও দুর্গরক্ষক সেনা মারা পড়ে। এই সুযোগে জিঞ্জিরার হাবসী নবাব বহুসংখ্যক সেনা লইয়া সহর আক্রমণ করেন। দ্বীপ ও কেল্লা নবাবের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা এই মড়কের উপদ্রবে এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, হাবসীদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই। এই ঘোরতর সঙ্কটে রোস্তমজী রোস্তম সদৃশ বীরত্ব সহকারে অরিদল বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইলেন। ধীবর জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আততায়ীদের সহিত যুদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এই গোলযোগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুরাট কুঠীর অধ্যক্ষ বোম্বায়ে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই একজন পারসীর সাহায্যে বোম্বাই পুরী এক ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

পারসীরা অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহাদের ব্যবসা-নৈপুণ্য, দানশীলতা ও সার্ব্বজনিক কার্য্যে তৎপরতাবশতঃ ভারতে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিস্তার হইতেছে।

পারসী ধর্ম্ম

পারসী জাতি সাধারণতঃ অগ্নি-উপাসক বলিয়া প্রখ্যাত, কিন্তু ঐ সংজ্ঞা তাহাদের প্রতি আরোপ করা ঠিক হয় না। যে সকল পণ্ডিতেরা পারসী ধর্ম্ম সবিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে পারসীরা বাস্তবিক একেশ্বর-উপাসক, অগ্নি: সূর্য্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তাঁহারা ঐ দুই পদার্থে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করেন।

পারসীরা জরতোস্তের শিষ্য ও অনুচর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। জরতোস্তের জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ডাক্তার হৌগের মতে অন্ততঃ তাহা খৃষ্টাব্দের সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করা অসঙ্গত নহে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, এই জরতোস্ত খৃষ্টাব্দের সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পারস্য রাজা গুষ্টাস্পের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার সময়ে পারসী ধর্ম্ম ঘোরতর পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি তাহা সংশোধনে ব্রতী হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ইরাণী ভাষায় লিখিত ও তাহার নাম অবস্তা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—অবশিষ্ট অল্পভাগ পারসীদের নিকট পাওয়া যায় এবং তদন্তর্গত মন্ত্রাবলী তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করা যায়। জরতোস্তের উপদেশ এই যে, ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান—জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা,—পাপের শাস্তা। তাঁহার নাম অহুরমজ্দ (অপভ্রংশ, হোর্মজ্দ)। আশ্চর্য্য এই যে, সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক সমস্ত ভাষায় ঈশ্বরের নাম দিব ধাতু অর্থাৎ প্রকাশ হইতে উৎপন্ন—জেন্দ ভাষায় উল্টা, দেব শব্দে অসুর বুঝায়। ঈশ্বর অর্থে অসুর শব্দের প্রয়োগ। বেদ ও অবস্তার মধ্যে ইন্দ্র মিত্র বৃত্রহা প্রভৃতি কতকগুলি নামের ঐক্য দেখা যায়—সে সকল নাম যে সমান অর্থে ব্যবহৃত তা নয়। বেদের দেবতা হয় ত অবস্তার দানব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইন্দ্র যিনি দেবাদিদেব অবস্তায় তিনি দানবেশ্বর, সয়তান অহ্রিমানের নীচেই গণনীয়। আবার আশ্চর্য্য এই যে, ইন্দ্রের অপর মূর্ত্তি বৃত্রঘ্ন অবস্তায় দেবতার মধ্যে গণ্য। দেবসংখ্যা দুয়েতেই সমান। বেদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবের অনুরূপ অবস্তার ৩৩ জন "রতু" প্রধান, তাঁহারা জরতোস্ত প্রচারিত অহুরমজ্দের সত্যধর্ম্ম সংরক্ষণে নিযুক্ত। পারসীদের যমসেদ (যমক্ষেত) বেদের যমরাজা—উভয়েরই পিতৃনাম বিবস্বৎ। বেদে যমরাজার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পৌরাণিক দানবরূপী যমের সঙ্গে কিছুই মেলে না। বেদের যম মানবকুলের আদিপুরুষ, যিনি মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে পথ দিয়া তাঁহার বংশজেরা সকলেই গমন করে ও গিয়া তাঁর সেই সুখরাজ্যে বাস করে। ইরাণী গ্রন্থে আছে যমসেদ সত্যযুগের রাজা ছিলেন, প্রজারা তাঁহার রাজ্যে রোগ শোক হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখে বাস করিত।

জগতে মঙ্গল অমঙ্গল দুই আত্মাশক্তি অহুরমজ্দের অধীনে কার্য্য করিতেছে। মঙ্গল শক্তি স্পেণ্টো মৈন্যুষ জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের আকর, সমুদায় সুখকারী ও হিতকারী বস্তুর জনয়িতা। অমঙ্গল শক্তি আঙ্গ্রোমৈন্যুষ যত অমঙ্গলের আকর, দুঃখ ক্লেশের জনয়িতা, পাপ চিন্তার প্রবর্ত্তক। স্পেণ্টো জীবনদাতা, আঙ্গ্রো সংহর্ত্তা—আলোক একের, অন্ধকার অন্যের প্রতিকৃতি। এ উভয় শক্তি যদিও পরস্পর বিরোধী—তথাপি দিবারাত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও সৃষ্টিরক্ষণে উভয়েই নিযুক্ত।

জবতোস্ত প্রাকৃতিক শক্তি বা পদার্থ বিশেষে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিবার বিধান দেন নাই, সুতরাং তাঁহাব ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত নহে। সূর্য্য সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরেব প্রতিরূপ, অগ্নি সেই পবিত্র স্বরূপের প্রকাশক ও স্মারক বলিয়া অর্চ্চনীয়। কিন্তু মূলে যাহা উন্নত ও পবিশুদ্ধ তাহাব স্রোত কাল-ক্রমে কলুষিত হইয়া যায়—পারসী ধর্ম্মের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ। জ্ঞানীদের ধর্ম্ম এক, আব অজ্ঞেবা নকলকে আসল মনে করিয়া লইয়া সূর্য্যের স্তবে প্রবৃত্ত হয়--অগ্নি-মন্দিবে অগ্নিকেই দেবতারূপে অর্চ্চনা করে।

জবতোস্তেব গ্রন্থ সকল নীতিগর্ভ উপদেশে পবিপূর্ণ—তাহাব সাব তিন কথায় ব্যক্ত হইতে পারে—হুমাতা, হুখ্‌তা, হ্বরস্থা, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে আত্মশুদ্ধি রক্ষা কর।*

অগ্নি-মন্দির—আতস বেহরাম

বোম্বাই সহরের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে পারসীদেব অগ্নি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহার সংখ্যা সব মিলিয়া তেত্রিশ। এতদতিরিক্ত মন্দির কতকগুলি শ্রীমন্ত পারসী পবিবাবেব নিজস্ব সম্পত্তি, তাহাতে সাধারণের যাইবাব অধিকার নাই। এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। মধ্য প্রকোষ্ঠে পূতাগ্নি প্রতিষ্ঠিত, তাহাব সংরক্ষণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত, চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতি খোরাক যোগাইয়া নিরন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা তাঁহার কাজ।

অগ্নি-মন্দিরে অগ্নি-প্রতিষ্ঠার যে নিয়ম তাহা কৌতুকজনক। অগ্নির নানা জন্মস্থান হইতে নানাজাতীয় অগ্নি সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যুজ্জাতীয় অগ্নি আহরণ বিশেষ ফলদায়ক। শুনিতে পাই হোর্মজী ওয়াডিয়াব আতস বেহরামের জন্য তাড়িতাগ্নি কলিকাতা হইতে বহুকষ্টে সংগৃহীত হয়। কলিকাতার অনতিদূরে এক বৃক্ষবিশেষে বজ্রপাতের সংবাদ পাইয়া নৌরজি বাঙ্গালী নামক পারসী তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে এক তড়িদ্দগ্ধ শাখা সংগ্রহ করেন। কাষ্ঠসংযোগে সেই অগ্নি অনেক দিন পর্য্যন্ত জিয়াইয়া রাখা হয়—পরে তাহা স্থলমার্গে পারসীহস্তে বহু যত্নে বোম্বায়ে প্রেরিত ও আতস বেহরামে স্থাপিত হয়।

অগ্নি-সংস্কার

এই সকল নানাজাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পর তাহা সংস্কৃত ও শোধিত হয়। অগ্নি-সংস্কারের নিয়ম এই—অগ্নির উপব একটি ত্রিদণ্ড ছিদ্রময় ধাতু-পাত্র রক্ষিত হয়। সেই পাত্রস্থিত সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড তলের অগ্নিসংযোগে

* History of the Parsees by Dosabhai Framji.

দগ্ধ হইয়া নবানল উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয় অগ্নি হইতে তৃতীয়—তৃতীয় হইতে চতুর্থ, এইরূপ নবম সংস্কারে যে অগ্নি প্রস্তুত হয় তাহাই পূতাগ্নি। এই প্রকারে প্রত্যেক জাতীয় অগ্নি সংস্কৃত হইলে সেই সমস্ত অগ্নি একটা বৃহৎ পাত্রে রাশীকৃত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই পূত হুতাশন আহুতিযোগে অহর্নিশি প্রজ্বলিত থাকে।

শবস্তম্ভ

জীবন্তের জন্য অগ্নি-মন্দির ও মৃতের জন্য শবস্তম্ভ পারসীদের এই দুইটি পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। যেখানে পারসীর বসতি সেখানেই এই দুই জিনিস দেখিতে পাইবে। মালাবার শৈলোপরি পারসীদের পঞ্চ শবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল স্তম্ভ প্রস্তরময় প্রাচীরবেষ্টিত কতিপয় বিঘা (প্রায় ৬০০০০ গজ) অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক একটি অগ্নি-মন্দির। মৃতদেহ শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পাহাড়ের উপর সমানীত হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু শুভ্রবেশে শবের পশ্চাৎ জোড়ে জোড়ে গমন করে—পথিমধ্যে এক বিশ্রামগৃহে শব স্থাপিত হয় ও তথায় উপাসনাদি হইয়া স্তম্ভে সমানীত হয়। স্তম্ভটী প্রস্তরময় এবং যোল সতর হাত উচ্চ। প্রাচীরের একটি দ্বার দিয়া বাহকেরা প্রবেশ করিয়া দেহটিকে যথাস্থানে আনিয়া রক্ষা করে। স্তম্ভের উপর কোন ছাদ নাই—অন্তর্ভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত গোলাকার শ্মশানভূমি। ভিতরে তিন স্তর গড়ানো ভাবে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে এক গভীর গর্ত্ত। পুরুষের দেহ উপরি স্তরে, নারীদেহ মধ্যভাগে ও শিশুদেহ অধস্তরে স্থাপিত হয়। যথাস্থানে শবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাহকেরা চলিয়া যায়। একপাল শকুনি প্রাচীরের উপরে বসিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, দেহ নামাইবা মাত্র তাহার উপর ঝাঁকিয়া পড়ে ও দুই ঘণ্টার মধ্যে মাংস নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া অস্থিমাত্র রাখিয়া যায়। কতক দিন পরে বাহকেরা ফিরিয়া আসে ও শুষ্ক অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া মধ্যবর্ত্তী কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাহা বায়ু বৃষ্টির প্রভাবে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল শুষ্ক অস্থিখণ্ড ব্যতীত শ্মশানে শবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মৃতদেহ হইতে রসাদি নির্গমনের বিহিত উপায় কল্পিত হইয়াছে। বালুকা ও কয়লার মধ্য দিয়া শোধিত হইয়া তাহা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। পারসীগণ প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ সমাধি ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছে। ইহার এক গুণ এই যে শ্মশানক্ষেত্র দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু হইতে সুরক্ষিত। অপর গুণ এই যে মানুষে মানুষে সাম্যভাব ইহাতে বজায় থাকে; ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলেরই অস্থি এক স্থানে মিলিয়া যায়।

পানসী শবস্তম্ভ (৮০ পৃষ্ঠা)

মুম্বাদেবীর মন্দির (৮২ পৃষ্ঠা)

উথম্না
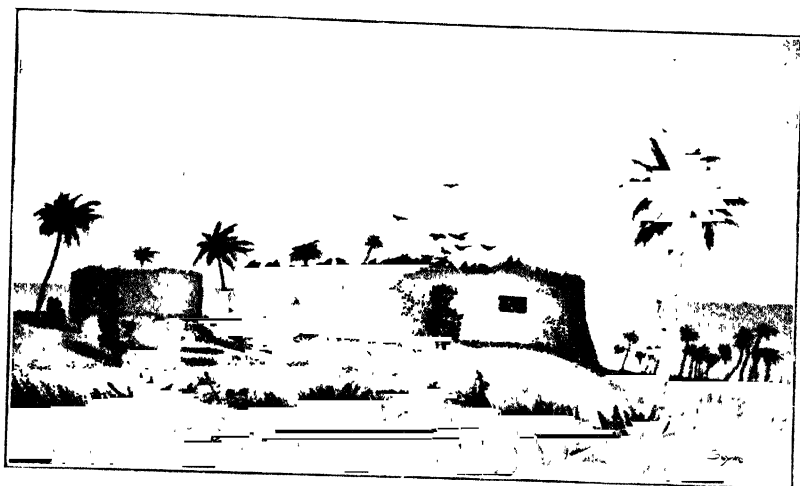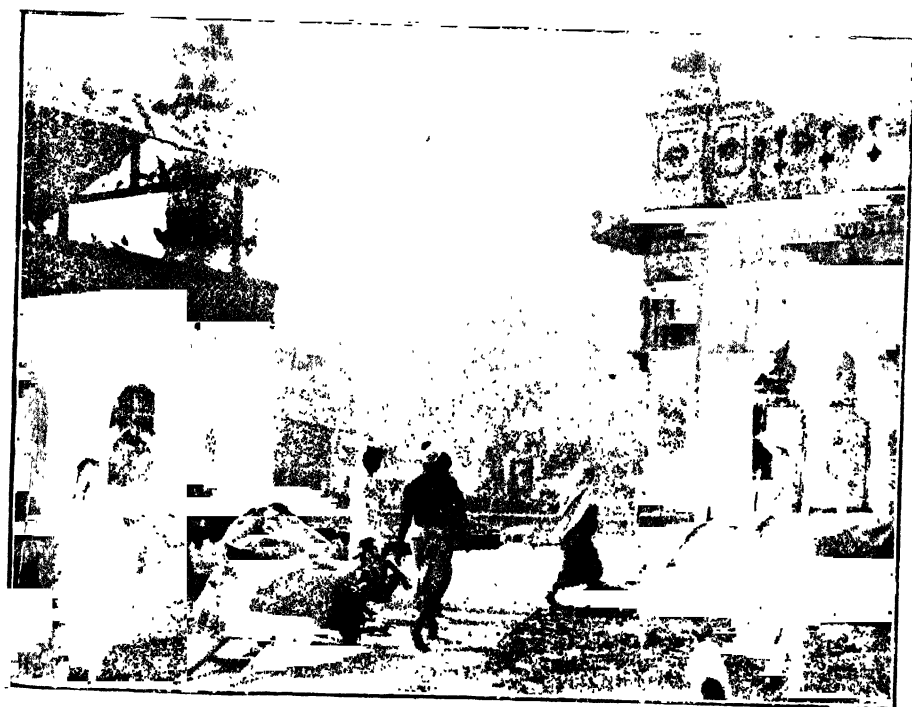
পারসী ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে, জীবাত্মা তিন দিন পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করে না, চতুর্থ দিবসে ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে। সেই দিন মৃতের কল্যাণ উদ্দেশে দানাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিধির নাম 'উথম্না'।

হিন্দু ও পারসী যে মূলতঃ একজাতি, ঘটনা ক্রমে উভয় শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা—এই উভয় জাতির ভাষা ও ধর্ম্ম, মত ও বিশ্বাস, আচার ব্যবহারের তুলনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য হইতেও এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রেতাত্মার কল্যাণ উদ্দেশে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি নিয়ম হইতে পারসী রীতি ভিন্ন নহে। পারসী সম্বৎসরের শেষ দশাহ পিতৃপুরুষদের জন্য উৎসর্গীকৃত। এই দশ দিন গৃহের এক প্রকোষ্ঠ পরিস্কৃত ও ফল ফুলে সুসজ্জিত হইয়া পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা বন্দনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে প্ররবদিগান বা মুক্তাদ বলে। এই সময়ে প্রেতাত্মাগণ মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া সন্তান সন্ততিদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। যদি দেখেন আমরা তাহাদিগকে বিস্মৃত হই নাই, তাহা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট।

কুকুরের শুভদৃষ্টি

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি অদ্ভুত রীতি পারসীদের মধ্যে প্রচলিত—সে কি না কুকুর দিয়া শবের মুখ দর্শন করাইবার রীতি। কুকুরের দৃষ্টি শুভদৃষ্টি। কুকুরে জীবাত্মাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া স্বর্গধামে লইয়া যায় ও আহ্রিমানের অমঙ্গল চেষ্টা নিবারণ করে এই তাহাদের বিশ্বাস। মহাভারতে কুকুরের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের যে আখ্যান আছে, এই পারসী ক্রিয়া পদ্ধতি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—কোন প্রাচীনতর প্রথা হয়ত এ উভয়েরই মূল।

ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি পারসীদের সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যতদিন তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের প্রজা ছিলেন, ততদিন এই উভয় জাতির মন যোগাইয়া চলিতে হইত সেই অনুসারে তাঁহাদের আচার ব্যবহার নিয়মিত হইত। আবার যখন ইংরাজ রাজ্য তাহাদের স্থান অধিকার করিল, সে অবধি 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতি অনুসারে তাঁহারা আর এক স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। বর্ত্তমান কালে তাহাদের সমাজ অনেকটা ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। বলা যাইতে পারে পারসীরা ভারতবর্ষীয় জাপানী। অশন বসন, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, সামাজিকতা এক্ষণে সকল বিষয়েই তাঁহারা "পাশ্চাত্য সভ্য রীতি" অনুকরণ করিতে জাপানীদের

ন্যায় তৎপর, অথচ তাঁহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। আমাদের মত তাঁহাদের উপর অতীতের গুরুভার চাপিয়া নাই, এদেশের অন্যান্য জাতির ন্যায় তাঁহারা জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, সুতরাং পরজাতির সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেলামেশা তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ফলেও দেখা যায়, তাঁহারা পৃথিবীর দেশ বিদেশ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। হিন্দুসমাজের তুলনায় তাঁহাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতিশীল, তাহার আর সন্দেহ নাই। আগেই বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিতে দোষ নাই যে, তাঁহাদের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, বদান্যতাদি গুণে তাঁহারা বোম্বাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তাঁহাদের মধ্যে যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এদেশে অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এ বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টান্তস্থল।

বোম্বাই সহর

বোম্বাই নাম কোথা হইতে হইল? এ নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকের মত এই যে, পোর্ত্তুগীসের বোম্বায়ের সুন্দর উপসাগর (Bonbay) দেখিয়া এই দ্বীপের নামকরণ করে। কেহ কেহ বলেন যে, মুম্বাদেবীর মন্দির হইতে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্দির অদ্যাপি নগরীর মধ্যে বিদ্যমান। ইহা এক পুরাতন মন্দির। প্রবাদ এই যে ৪০০,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা হয়। ইহা প্রথমে ধোবিতলাও (যেখানে ধোপারা কাপড় কাচে) সেইখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—শতাধিক বৎসর হইল স্থানান্তরিত হইয়াছে। দেবীর নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কুলীদের উপাস্যদেবতা "মুঙ্গা" ব্রাহ্মণহস্তে পড়িয়া 'মুম্বা' নাম ধারণ করিলেন। সে যাহা হউক, সকল জিনিসের 'কেন' বের করা সহজ নয়। আর উহার আবিষ্কারও সকল সময়ে সন্তোষজনক হয় না। কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি কি? ভাবিতে গেলে তাহা বেশ বুঝা যায়। 'সুন্দর বন্দর' যদি বোম্বাই নামের অর্থ হয়, তাহাই যথার্থ নাম বলা যাইতে পারে ও তাহা জানিয়াই আপাততঃ আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বোম্বাই দ্বীপ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে পোর্ত্তুগীসদের হস্তে পতিত হয়। ১৪৯৮ সালে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাস্কো-ডি-গামা কালিকটে পদার্পণ করেন। যে ইউরোপীয় জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভাগ্যবলে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ভারতের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল, তাহাদের প্রতাপ সেই অবধি ভারতসাগরে ক্রমিকই বিস্তারিত হইতে চলিল। সর্ব্বপ্রথমে পোর্ত্তুগীসদের লক্ষ্য বোম্বাইয়ের দক্ষিণ মালাবার তীরবর্ত্তী প্রদেশেই বদ্ধ ছিল; কালিকট, কানানোর, গোওয়া প্রভৃতি স্থানেই তাহারা উপনিবেশ পত্তন করেন।

১৫৩০ সালের দুই চারি বৎসর পরে বোম্বাই পোর্ত্তুগীসদের হস্তগত হয় কিন্তু তাহাদের সমস্পর্দ্ধী আর এক ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যচ্ছলে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইল। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে ইংরাজেরা এদেশে প্রবেশ করে—আসিয়া অবধি তাহাদের লোভদৃষ্টি বোম্বায়ের উপরে নিপতিত হয়। দুই একবার বোম্বাই দখল করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহযৌতুক স্বরূপে বোম্বাই ইংরাজের হস্তাধীন হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিষ ও পোর্ত্তুগীস রাজার মধ্যে যে বিবাহ-সন্ধি সম্বন্ধ হয় তাহা হইতেই বোম্বায়ে ব্রিটিষ অধিকারের সূত্রপাত, যদিও এই দ্বীপ ইংরাজদের হাতে আসিতে আরও চার পাঁচ বৎসর বিলম্ব লাগে। তখন বোম্বাই দ্বীপ এমন হতাদরের বস্তু ছিল যে, ইংলণ্ডের রাজা দশ পৌণ্ড বার্ষিক করের বিনিময়ে ইহা অকাতরে কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

রাজা যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া এই দ্বীপকে হস্তান্তর করিলেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। যখন ইংরাজেরা প্রথম বোম্বাই অধিকার করিল তখন তাহা কি অকিঞ্চিৎকর বস্তু! যে সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইল তাহা একটি পাকাবাড়ী (ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট হাউস)—তাহার চারিদিকে বাগান—দু চারিটি তোপ, নারিকেল বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘর—কতকগুলি জেলের কুটীর ও প্রচুর পরিমাণে জীয়ন্ত ও পচা মাছ—এই যা ইংরাজদের ভোগে আসিয়াছিল। তথাকার জনসংখ্যা পলাতক ও তস্কর মিলিয়া বড় জোর দশ হাজার। আবহাওয়া মারাত্মক—তাহার কারণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব, যে বিজ্ঞানের প্রভাবে এখন সহরের আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়াছে। অনেক কষ্টে ৩০,০০০ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত। জমি এমন সস্তা যে সমুদায় মালাবার হিলের ইজারা দিয়া তখন যে টাকা লাভ হইত, এক্ষণে তাহাতে অর্দ্ধ কাঠা ভূমিখণ্ড পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইংরাজদের অধীনে আসিবা মাত্রই তাহার শ্রী ফিরিল। দুর্গ ও গৃহ নির্ম্মাণ, বন্দর স্থাপন, বাণিজ্য ব্যবসায়ে উৎসাহবর্দ্ধন এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে ইংরাজরাজ্যের সুফল ফলিতে লাগিল। ইংরাজ-রাজ-ব্যবহার এক প্রধান গুণ এই যে তাহা কাহারো ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না। যাহার যে ধর্ম্ম সে তাহা অকাতরে পালন করিতে পারে, মতভেদের জন্য কাহাকেও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সেকালে অঞ্জিয়ার (Aungier) নামে একজন প্রতিভাশালী সুচতুর গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিউ হইতে বণিকেরা বোম্বায়ে আসিয়া বাণিজ্য করিতে চাহে; তাহাদিগকে উৎসাহদানার্থ গবর্ণর সাহেব তাহাদের সঙ্গে যে কড়ার বন্ধন করেন তাহা হইতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মর্ম্ম এই যে বণিকেরা স্বাধীনভাবে তাহাদের শবদাহন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী

হউক না কেন—তাহার জাতি ও অবস্থা যাহাই হউক, বলপূর্ব্বক কাহাকেও খৃষ্টান করা যাইবে না। এই করার পত্রের তারিখ ২২ মার্চ্চ ১৬৭৭। বণিকেরা সেই অবধি এ পর্য্যন্ত 'ব্যাকবে'র তীরে অবাধে তাহাদের শবদাহন করিয়া আসিতেছে ও ইচ্ছানুরূপ নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছে।

পোর্ত্তুগীসদের শাসন অন্যরূপ ছিল। তাহাদের এক-হাতে তলবার, এক-হাতে বাইবেল হয় প্রাণ দাও, নয় খৃষ্টান হও। তাহারা বলে, আমার রাজ্যে বাস করিতে চাও ত আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ফলে কি হইল - ইংরাজের জয় পোর্ত্তুগীসদের পতন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি ধন মান বৈভবে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল—যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশ কম্পমান, তাহার নাম পর্য্যন্ত এক্ষণে শ্রুতিগোচর হয় না। আর ইংরাজসুশাসনে এইক্ষণে বোম্বায়ের অবস্থা দেখ। সাগরগর্ভ হইতে এই চিরবসন্ত সুন্দর পুরী সমুত্থিত হইল। বিশাল সুরম্য সৌধমালায় পরিপূর্ণ; শ্রমের জয়স্তম্ভ সূতা ও কাপড়ের কল এবং অন্যান্য কারখানা চতুর্দ্দিকে বিরাজমান; নানাজাতির আবাসস্থান এই বোম্বাই পুরী সমুদ্রের উপরে রত্নদীপতুল্য শোভা পাইতেছে।

যখন ইংরাজেরা বোম্বাই অধিকার করিয়া প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে তখন নিরাপদে রাজ্যভোগের সময় নহে—চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা, পদে পদে বিঘ্ন বাধা; উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম জলে স্থলে চারিদিকেই শত্রু। বোম্বায়ের শৈশবকাল কত ঝড় তুফান, কত প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে—সে সময়ে এই দ্বীপ অন্য এক প্রবল জাতির গ্রাসে কেন যে পতিত হয় নাই, সে কেবল ইংরাজ ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে। ইংরাজের এমনি ভাগ্যবল যে এই বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া—এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই সহর ক্রমে পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া ইংরাজ রাজমুকুটের অত্যুজ্জ্বল মণিরূপে শোভা পাইতে লাগিল--সকল শত্রু একে একে পরাস্ত হইল—সমুদ্র জলদস্যু হইতে মুক্ত হইয়া বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক হইল—পরস্পরবিরোধী যোদ্ধদলের মৃত দেহের উপর দিয়া ইংরাজ আধিপত্য ভারতভূমিতে বদ্ধমূল হইল।

তখনকার কালে ঐ অঞ্চলে ইংরাজদের তিন শত্রু ছিল, পোর্ত্তুগীস, মোগল ও মারাঠী। প্রথম হইতেই ভারতক্ষেত্রে এই দুই ইউরোপীয় জাতির মধ্যে রেষারেষি—কে কাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে স্থিরতা নাই। ঠানা বান্দরা, সালসেট প্রভৃতি বোম্বায়ের নিকটস্থ প্রদেশ সকল তখন পোর্ত্তুগীসদের অধীন; সুতরাং তাহারা নানাপ্রকারে বোম্বাইবাসীদিগের উৎপীড়নে সক্ষম ছিল।

এইরূপ কলহে কিছুকাল গত হইলে জিঞ্জিরার কাফ্রী নবাব পোর্ত্তুগীসদের পক্ষ

ধরিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। নবাব মোগল সম্রাটের পোতাধ্যক্ষ। সেকালে স্থলে যেমন ইংরাজ বণিকের প্রতাপ, জলেও তেমনি ইংরাজ জলদস্যুদের উপদ্রব। সেই সকল দস্যুদের শাসন করিবার উদ্দেশে ১৬৮৮ অব্দে কাফ্রী নবাব ঔরঙ্গজীব বাদসাহের আদেশক্রমে বোম্বাই দুর্গ আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা তখন অতি দুর্ব্বল, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠেন না, কৌশলক্রমে সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার প্রত্যাদেশে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। বোম্বায়ের উপর দিয়া সেই এক ভয়ানক ধাক্কা গিয়াছিল। নবাবের আক্রমণ নিষ্ফল দেখিয়া পোর্ত্তুগীসেরা ইংরাজদের উপর আরো জ্বলিয়া উঠিল, সাধ্যমত বৈরনির্য্যাতনে বিরত হইল না; কিন্তু তাহাদের জোরজার মন্ত্রতন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল। পোর্ত্তুগীস রাজ্য এদেশে আর অধিককাল টিঁকিতে পারে নাই। দিন দিন বর্দ্ধনশীল মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপের নিকট ফিরিঙ্গিদিগকে শীঘ্রই নতশির হইতে হইল। তাহাদের অধীনস্থ স্থান সকল একে একে মারাঠীদের হস্তগত হইল। পাণিপথ যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মারাঠীদের মহোন্নতি কাল। তাহারা হিন্দুস্থানের আর আর সকল জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে-দক্ষিণে কর্ণাটক হইতে উত্তরে আগ্রা দিল্লী পর্য্যন্ত তাহারা রাজ্য বিস্তার করিয়াছে—হোলকর সিন্দে গাইকওয়াড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে—আশা হইতেছে হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছগণ বহিস্কৃত হইয়া স্বাধীন পতাকা ভারতে পুনরুড্ডীন হইবে। এই সময়ে পোর্ত্তুগীসদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের অধিকারবর্ত্তী সালসেট, বাসীন, ঠানা, কারাঞ্জা প্রভৃতি স্থান কাড়িয়া লইয়া মারাঠীগণ শীঘ্রই তাহাদের বিষদন্ত উৎপাটন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্দ্ধভাগ গত হইতে না হইতেই ইংরাজেরা তাহাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীর উৎপাত হইতে বিনা ক্লেশে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর মারাঠীদের উপর ক্রমে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর হইলেন। বোম্বাই তাহার রাজধানী। বোম্বাই যে কি অমূল্য রত্ন তাহা তাঁহারা আগে হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন মোগল, মারাঠী, পোর্ত্তুগীস লোকেরা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিয়া আপনাদের অধঃপাতের সোপান প্রস্তুত করিতেছিল, তখন হইতে ঐ রত্ন তাঁহারা অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পরিশেষে তাঁহাদেরই জিৎ, আর সকলের হার।

১৮১৯ সালে মারাঠীসমরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাত্মা এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব বোম্বাই গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সময় হইতে বোম্বায়ের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়। পথ ঘাট গৃহনির্ম্মাণ, শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, বিদ্যাশিক্ষার নবপ্রণালী উদ্ভাবন, আইন সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠানহেতু তাঁহার শাসন

বোম্বাইবাসীদিগের বিশেষ আদরণীয়। তিনিই নব্য বোম্বাই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান এবং পরে স্যর বার্টল ক্রেয়ারের আমলে বোম্বাই সহর উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

নরনারীর মেলা

বোম্বায়ে গিয়ে প্রথমেই যা আমাদের চক্ষে নূতন ঠ্যাকে তাহা মেয়ে পুরুষের একত্রে মেলামেশা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বায়ের মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্রমহিলাগণ সকলেই অন্তঃপুরবাসিনী, বাহিরে কোথাও একটি কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যো নাই। বোম্বায়ে পথে ঘাটে যেখানে যাও ভদ্রমহিলা চোখের সামনে পড়ে। গবর্ণমেণ্ট হৌসের অভ্যাগতের মধ্যে, বিদ্যালয়ের ছাত্র পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে, দেশীয় স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত দেখিবে। বাগান, বন্দর, ব্যাণ্ড বাজিবার স্থান প্রভৃতি নগরের প্রকাশ্য স্থানে সন্ধ্যাবায়ু সেবনের জন্য দেশী ও ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত হয়। পারসীদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নামমাত্র। হিন্দু রমণীরাও লোকসমাজে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। আমাদের মেয়েদের মত কুলস্ত্রীদের তেমন সঙ্কোচভাব দৃষ্ট হয় না। গৃহিণী অভ্যাগত পুরুষকে অন্ন পরিবেশন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। নরনারীর সম্মিলনই বোম্বাই সহরের বিশেষত্ব। বাঙ্গলাদেশে নারীবর্জ্জিত জনতা কেমন অপ্রিয়দর্শন। বোম্বায়ে নরনারীর মেলা দেখিয়া বিদেশী পথিকের মন মোহিত হয়। যেমন আমাদের একজন কবি ইংলণ্ডযাত্রা মুখে বোম্বাই হইতে লিখিতেছেন :—

"সব চেয়ে যা দেখিয়া আমার হৃদয় জুড়াইয়া যায়—তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জ্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সে না দেখার একটা দণ্ড আছে। নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে, সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না?"

বোম্বাই সহর বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিতেছেন :—

"আমাদের গাড়ী মাথেরাণ * পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেশী কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পারসী রমণী নহে, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা মারাঠী মেয়েরাও বসিয়া

* বোম্বায়ের নিকটবর্ত্তী একটি শৈলনিবাস—মহাবলেশ্বর পাহাড়ের ছোট ভাই। গাছপালা বন উপবন পাহাড়ের দৃশ্যে পরিশোভিত—মুনিঋষির আশ্রমতুল্য মনোরম স্থান। মহাবলেশ্বরের চেয়ে নীচু কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুগম বলিয়া মাথেরাণ বোম্বাইবাসীদের স্পৃহণীয়।

মাহেশ্বরাপ (৮৬ পৃষ্ঠা)
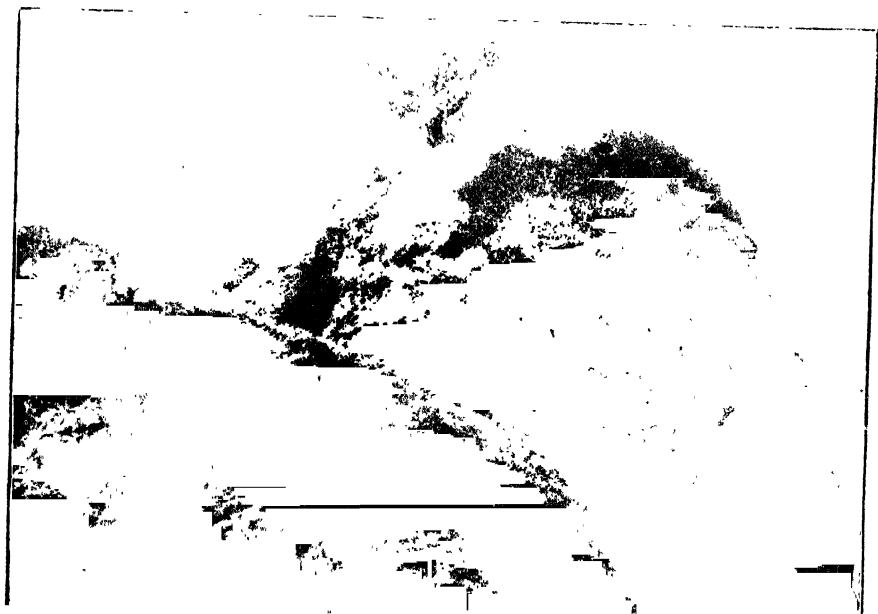
আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কতবড় একটা সঙ্কোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসঙ্কোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। মাথেরাণের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের ইডন পার্ক ও গোলদীঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কি লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা!"

বোম্বায়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার চিত্র যেমন তৃপ্তিজনক, বাঙ্গলাদেশে অবরোধ-প্রথা তেমনি আমার কষ্টকর। আমাদের দেশে এই প্রথা বদ্ধমূল হবার কারণ কি? ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ত ইহার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে না; আমার মনে হয় যে মুসলমান আমল থেকেই খুব সম্ভব এই কঠোর নিয়মের সূত্রপাত, সে সময়ে অত্যাচার-ভয়ে কুলস্ত্রীদের গৃহরুদ্ধ রাখা আবশ্যক হইত। কিন্তু এখন ত আর সেকাল নাই, এখনো যাহারা ঐ কারণে অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী আমি তাঁহাদের বলি, এ ত আর মোগলাই নয়, এ ইংরাজরাজ্য—স্ত্রীজাতির সম্মাননা যাহার মূলমন্ত্র, তোমাদের ওরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই। ওরূপ আশঙ্কা যে অমূলক, একবার বোম্বাই গিয়া সেখানকার নরনারীর সম্মিলন দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেও আমি তার প্রমাণ দিতে পারি। প্রথমে যখন আমি বোম্বায়ে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাই, তখন কত লোকে কত প্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষায় দেখিলাম, সে মিথ্যা জুজুর ভয় বই আর কিছুই নয়। আমরা স্বামী স্ত্রীতে প্রকাশ্যভাবে এতদিন বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কই আমাদের ত ওরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই! এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে বচন আছে তাহাই ঠিক—

> অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ
> আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

স্ত্রীরা আপ্তপুরুষ কর্তৃক গৃহরুদ্ধ থাকিলেও অরক্ষিতা, যাহারা আপনারা আপনাদের রক্ষা করিতে পারে তাহারাই সুরক্ষিতা। এই আত্মরক্ষার শক্তি ঘরে বদ্ধ থাকিলে হয় না, বাহিরে গিয়াই উপার্জ্জন করা যায়।

ভারত-মহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া উন্নত হইলে পুরুষেরাও যে সেই উন্নতির ফলভাগী হইবে ইহা কে না স্বীকার করিবে? তেমনি আবার "মুক্তবায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকার" হইতে বঞ্চিত করিয়া নারীকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার কুফলেও সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়াই সমাজ। স্ত্রীদের উন্নতিতে জাতীয় উন্নতি, স্ত্রীদের অবনতিতে জাতীর দুর্গতি, এটি বেদবাক্য।

পুরশ্রী

বোম্বাই সহরের পুরশ্রী বর্ণনা করিতে নানাজাতির সম্মিশ্রণ তাহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কত বিভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়াছে তার পরিচয় তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভজনালয়েই অনেকটা পাওয়া যায়। সহরের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত দুই তিন ক্রোশ চলিয়া গেলে নানাজাতীয় মন্দির—চিত্রবিচিত্র হিন্দুমন্দির, মুসলমানদের মসজিদ, পারসীদের অগ্নিগৃহ, ইহুদিদের সিনাগোগ--ইংরাজ-চর্চ্চ এই সকল একে একে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ময়দানে দেখিবে মুসলমান সান্ধ্য নামাজের জন্য কার্পেট বিছাইতেছে, তাহার পার্শ্বে হয় ত একজন পারসী অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া স্তুতিমন্ত্র পাঠ করিতেছে। পুরবাসীদের কোন এক বড় উৎসবের দিন এই মিশ্রজাতির মেলা দেখিতে হয়—সে এক অতুলনীয় শোভনদৃশ্য। বোম্বাইবাসীরা বাঙ্গালীদের মত হৃদ্ধস্থে 'নগ্নশির' নহে। বাহিরে পথেঘাটে সকলেরই পাগড়ীওয়ালা মাথা। বাঙ্গলা ও ভারতের অন্য স্থানে প্রথম দর্শনেই এই এক পার্থক্য ধরা পড়ে, বিদেশীগণ ইহা সহজে লক্ষ্য করিয়া থাকে। কেহ বলে খোলা মাথা অসভ্যতার লক্ষণ; কিন্তু তাহাদের প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। টোগাধারী মুক্তশির রোমকের পরিচ্ছদ বাঙ্গালীর বেশ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। বাঙ্গালীর যেমন খোলা মাথা, বোম্বাইবাসীর তেমনি পাগড়ীই ভূষণ। পাগড়ীর গঠন ও আকৃতি অনুসারে জাতি ও বর্ণ লক্ষিত হয়। মুসলমানদের জরির মোড়াশা পাগড়ী, মারাঠীর শ্বেত কিম্বা লোহিত রথচক্র, গুজরাটীর লাল রঙের গজমুণ্ড, পারসীদের ত্রিকোণ লম্বা টুপী (কতকটা পারসিক টুপীর অনুরূপ), সিন্ধিদের বিপর্য্যস্ত ইংরাজি হ্যাট—এইরূপ লম্বা, গোল, কোণবিশিষ্ট নানাধরণের পাগড়ী দেখা যায়। এই সকল চিত্রবিচিত্র শিরোভূষণ নাগরিক পথিকদের মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। বোম্বাই ও কলিকাতা এই দুই সহরের বাহ্য আকৃতিতে প্রভেদ দুকথায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলা যাইতে পারে—কলিকাতা আটপৌরে, বোম্বাই পোষাকী সহর।

শোভা সৌন্দর্য্য

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে কোন্ সহর প্রাইজ পাইবার যোগ্য? ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইডন্ পার্ক কিম্বা কোম্পানীর বাগানের মত বাগান বোম্বায়ে নাই, আর গঙ্গার মত নদীও নাই। বোম্বায়ের প্রধান নগরোদ্যান যে ভিক্টোরিয়া উদ্যান তাহা যৎসামান্য। তাহার ভিতরে একটি যাদুঘর আছে—তাহাও কোন কার্য্যের নহে। ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে হরিণ ব্যাঘ্র বানর ভল্লুক প্রভৃতি কতকগুলি পশু ধরিয়া

আদেনের বন্দর (৮৮ পৃষ্ঠা
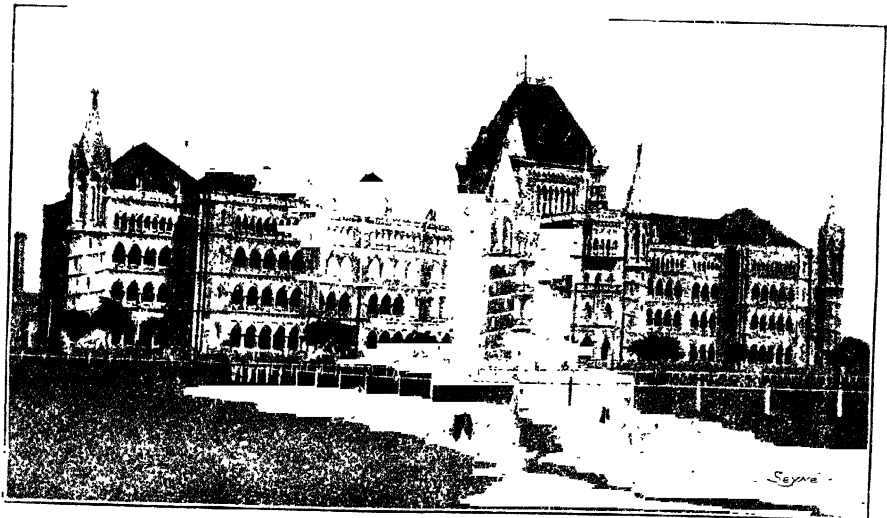
হাই কোর্ট—বোম্বাই (৯০ পৃষ্ঠা)

রাখা হইয়াছে কিন্তু সে পশুশালার নামমাত্র। আলিপুরের পশুশালার মত স্থান বোম্বায়ে নাই। সে যাহা হউক, বোম্বাই সহরের প্রাকৃতিক শোভা ব্যাখ্যাযোগ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রধান উপকরণ পাহাড় ও সমুদ্র, তাহা বোম্বায়ের নিজস্ব সম্পত্তি। একদিকে মালাবার শৈল, অন্যদিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরনিকর। সমুদ্রতটস্থিত যে সকল স্থান কিছুকাল পূর্ব্বে ময়লার খনি ও দুর্গন্ধ দূষিত বায়ুর আবাস ছিল, তাহা পরিষ্কৃত, প্রশস্ত, সুন্দর ভ্রমণপথে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার গলি দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ পথঘাট ছাড়িয়া একবার এই সমুদ্রতীরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর—এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। যদি বোম্বাই দ্বীপ ও বন্দরের নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সমুদ্রধারের রাস্তা দিয়া মালাবার শৈলে আরোহণ কর—তথাকার গিরিকানন, বন্দরের জাহাজশ্রেণী, নগরের গৃহাবলী মিলিত শোভনদৃশ্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত। যখন অস্তোন্মুখ দিনকর-কিরণে এই দৃশ্য সমুজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহার শোভা অতি চমৎকার। পশ্চিমের আকাশ চিত্রবিচিত্র মেঘজালে রঞ্জিত, নীচে উপসাগরের শাখাদ্বয় সূর্য্যের কনকবিম্বে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহার ক্রোড়ে মুম্বাপুরী শয়ান; সাগরবক্ষে দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান; বন্দরে নোঙ্গরবদ্ধ নানাজাতীয় তরণী, কখনও বা একএকটি নৌকা পালভরে চলিয়াছে। স্থলে নারিকেল বৃক্ষরাজি, মধ্যভাগে তরুরাজির অভ্যন্তরে বিরাজিত সুরাগরঞ্জিত হর্ম্ম্যাবলী, দূর হইতে একাকারে এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত; প্রান্তভাগে কোঙ্কনের পর্ব্বতশ্রেণী, সর্ব্বোপরি স্বচ্ছ নীলাকাশ। এখন মনে কর দিনমণি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গেলেন—সে পর্ব্বত জাহাজশ্রেণী ছায়ায় বিলীন হইল। সে পীতলোহিত স্বর্ণবর্ণের দৃশ্য আর নাই। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। আর এক নূতন জগৎ, নূতন রাজ্যের আবিষ্কার! নিশানাথ তাঁহার শুভ্র কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন। জলস্থল ক্রমে রজতবর্ণে রঞ্জিত হইল। এই সুস্নিগ্ধ বিমলজ্যোস্নাতে সমুদ্র-ভ্রমণে কি আরাম! আইস, বন্দরে গিয়া আমরা এক নৌকা করিয়া মাঝিদের গান শুনিতে শুনিতে খানিকদূর বেড়াইয়া আসি, আর তুমিও তান ছাড়িয়া দিবে—

ভাসিয়ে দে তরী সুনীল সাগর' পরি,
বহিছে মৃদুলবায়, নাচিছে মৃদুলহরী।

সৌধপুরী

ইংরাজিগ্রন্থে কলিকাতা সচরাচর "সৌধপুরী" (City of Palaces) বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু এ নাম কলিকাতা যে কেন একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছে আমি তাহা ভাবিয়া পাই না। কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুই সহরের ইমারতশ্রেণীর

পরস্পর তুলনা করিলে ত বোধ হয় না যে বোম্বাই কলিকাতার কাছে হার মানে। বুড়াবন্দর ষ্টেশনে নামিয়া একবার বম্বের ময়দান প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে কত প্রকাণ্ড সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি নেত্রপথে পতিত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। সেক্রেতার আফিস, হাইকোর্ট, ইউনিবর্সিটি হলের রাজাবাই স্তম্ভ ও সাসুন শিল্পালয়, স্যর জমসদজি শিল্প বিদ্যালয়, এলফিনিষ্টন হাইস্কুল, সেণ্টজেবিয়র কলেজ, পারসী দাতব্য বিদ্যালয়, অ্যালেকজান্দ্রা স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যালয়নিচয়, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিস, হাসপাতাল, নাবিকাশ্রম, হোটেল, কার্য্যালয়, বিপণিশ্রেণী এই সকল দেখিয়া বোম্বাই কাহার মনে না সুরূপা সৌধপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হয়? বম্বের নগরশালা কলিকাতার Town Hall অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো নয়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবে মধ্যে প্রকাণ্ড সভাগৃহ;—উপরে গিয়া দেখিবে বম্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠশালা ও পুস্তকালয়, দরবারশালা প্রভৃতি গৃহ দোতালা অধিকার করিয়া আছে। প্রবেশপথে সোপানের উপরে ও নিম্নদেশে কতকগুলি বিখ্যাত লোকের পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত; তন্মধ্যে এক পারসী ও একটি হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি নেত্র আকর্ষণ করে। পারসী সুবিখ্যাত ব্যারনেট স্যর জমসদজি জিজিভাই বাটলীওয়ালা। "স্যর" ও "বাটলিওয়ালা" এই পদবীদ্বয়ের মধ্যে তাহার জীবনের ইতিহাস অভিব্যক্ত; ইহারা বলিয়া দিতেছে কিরূপে তিনি সামান্য বোতল বিক্রী ব্যবসায় হইতে স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ব্যবহার চাতুর্য্যে প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া অবশেষে ব্রিটিষ নাইট শ্রেণীভুক্ত হইয়া সমাজের উদ্ধশিখরে আরোহণ করিলেন। হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি জগন্নাথ শঙ্কর শেটের। ইনি জাতিতে স্বর্ণবণিক, কিন্তু বুদ্ধি ও চরিত্রবলে জীবদ্দশায় হিন্দু জাতির প্রতিনিধিরূপে গণ্য ছিলেন। উপরি ভাগে বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব কতিপয় গবর্ণরের প্রতিমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, তন্মধ্যে ভারতের ইতিহাসলেখক মহনীয় কীর্ত্তি এলফিনিষ্টন, ইহার মূর্ত্তি সকলের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। ইনিই এ প্রদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্যবিজ্ঞানশিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। যে দুই বিদ্যালয় ইহার নাম ধারণ করিতেছে তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর অগ্রগণ্য।

নগরশালা হইতে বাহির হইয়া উদ্যানগর্ভ এলফিনিষ্টন চক্রের ইমারতশ্রেণী দেখিতে পাইবে। আচ্ছাদিত বারান্দার মধ্য দিয়া চক্রপথ গিয়াছে। এই সকল ইমারত "সেয়র মেনিয়া" কালের স্মরণচিহ্ন। সেই সুখ সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নকালে Sir Bartle Frere গবর্ণরের আমলে এই সৌধচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্থান তখন শূন্য ময়দান, মধ্যে কপোতকুলের আবাসস্থান একটি পুরাতন ভগ্ন মন্দির মিটমিট করিত, এক্ষণে তাহার কি আশ্চর্য্য রূপান্তর।

এই সমস্ত সৌধাবলির মধ্যে হাইকোর্ট আদালত সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও গৌরবশালী।

রাজাবাই স্তম্ভ—বোম্বাই (৯১ পৃষ্ঠা)
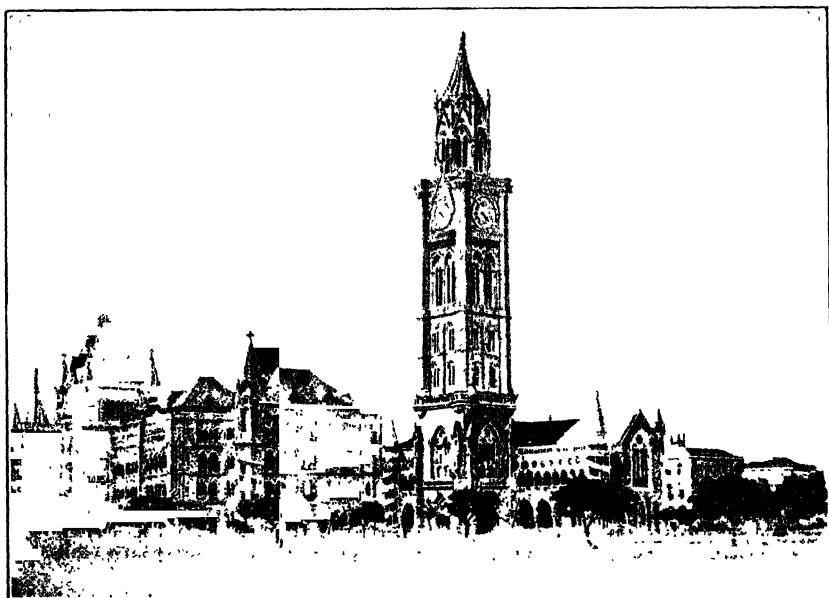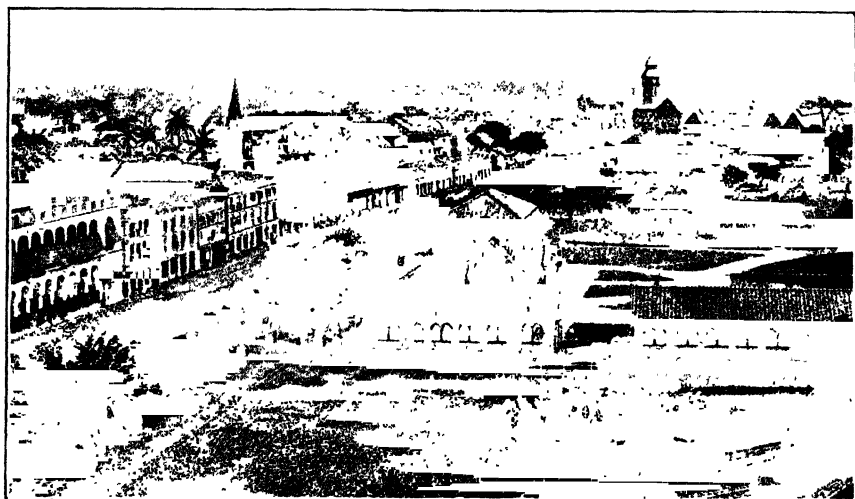
ক্রফোর্ড মার্কেট (৯১ পৃষ্ঠা)

ইউনিবর্সিটি গৃহ একটি শিল্পবত্ন; কি তাহার নির্ম্মাণকৌশল, কি তাহার কার্য্যকারিতা—অন্তর্বাহ্য উভয়ই ব্যাখ্যাযোগ্য। ইউনিবার্সিটি ঘটিকাস্তম্ভ গগনভেদ করিয়া আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ইহা আট স্তরে বিভক্ত ও ২৬০ ফুট উচ্চ—দিল্লীর কুতবমিনার অপেক্ষাও ৮ ফুট বেশী। এই স্তম্ভের ঘটিকাযন্ত্র হইতে সময়ে সময়ে তানলয় সমন্বিত সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি বিনির্গত হয়। ইহার শিখরদেশ হইতে বন্দর ও সহরের সর্ব্বাঙ্গীন শোভা এক কটাক্ষে দর্শন করা যায়। এই স্তম্ভ ও পুস্তকালয়ের জন্য স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ তাঁহার সেয়র-ব্যবসা-সংজাত অগাধ রত্ন ভাণ্ডার হইতে চতুর্লক্ষ মুদ্রা দান করেন। এই স্তম্ভের নামে তাঁহার মাতার নাম "রাজাবাই" চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

এই সমস্ত বিশাল সুন্দর অট্টালিকা মুম্বাপুরীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ইহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, এই সকল ইমারত গবর্ণমেণ্টেরই সর্ব্বাঙ্গীন দান নহে। পুরবাসীগণের বদান্যতাগুণে ইহাদের অনেকের জন্মলাভ। যে কোটি কোটি মুদ্রা গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার মোটামুটি চতুর্থাংশ পৌরজনেরা স্বাহাদের নিজস্ব ধনকোষ হইতে দান করিয়াছিলেন। বোম্বাই সহর কত শীঘ্র কি আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে, ১৮৬০ হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে আবাদ রাস্তা সরকারী ইমারত লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬ ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও তৎকালের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা-কার্য্যে ম্যুনিসিপালিটী প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয় করেন।

কেল্লা ও ময়দানের প্রবেশ পথে ক্রাফোর্ড মার্কেট। ইহা কলিকাতার নূতন ম্যুনিসিপাল মার্কেটের সমস্পর্দ্ধী। যিনি এই হাটের রূপগুণ ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রাতঃকালে ৬।৭ ঘণ্টা বেলায় দেখিলে ফল ফুল তরকারীর প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইবেন। নবেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফলের আমদানী। উৎকৃষ্ট লাল কদলী, চাঁপাকলা, বাতাবীনেবু, তরমুজ, খরমুজ, নাগপুরী কমলালেবু, ঔরঙ্গাবাদী ও কাবুলী আঙ্গুর, বঙ্গলোরের পীচ, মহাবলেশ্বরের ষ্ট্রবেরি, মস্কটের তাজা ও শুষ্ক খর্জ্জুর, নারিকেল, আনার, আঞ্জীর (Fig) আনারস, আতা, পাঁপিয়া, পেয়ারা ইত্যাদি ইত্যাদি ফলভারে তথাকার ভাণ্ডার তখন পূর্ণ। আঙ্গুর ও আঞ্জীর দক্ষিণের এই দুটি ফল অতি উপাদেয় আর ফলের রাজা আমের জন্যও বোম্বায়ের বিশেষ খ্যাতি। মাজাগামের আফুস এদেশের সকল আমের সেরা।

ক্রাফোর্ড মার্কেটের পর বম্বের তুলার বাজার উল্লেখযোগ্য। বোম্বায়ের বাণিজ্য ঘটা দেখিতে হইলে এই বাজার অবশ্য দর্শনীয়। এই স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ তুলার বস্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বার্ষিক রপ্তানি হয়। আমেরিকার New Orleans-এর নীচেই

ইহা গণনীয়। নানা জাতীয় লোক, নানা বর্ণের পরিচ্ছদ, কেনাব্যাচার কোলাহল মিলিয়া তুলার বাজারে বোম্বায়ের বাণিজ্য-শ্রী মূর্ত্তিমতী।

বোম্বাইযাত্রী এই সকল ইমারত দেখিয়াই যেন সন্তুষ্ট না থাকেন—দিশী পাড়াটা একবার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহার মধ্যে অনেক কৌতূহলজনক নূতন জিনিস দেখিবার আছে—ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্ত এইভাগেই বিশেষ দ্রষ্টব্য। দোকান হাটের ক্রয় বিক্রয়, ট্রাম, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চলাচল ও নানাজাতীয় লোকজনের সমাগমে এই স্থানেই সহরের জীবন্ত চলন্ত ভাব প্রতিবিম্বিত। কলিকাতার দিশী পাড়ার তুলনায় ইহা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও শ্রীসম্পন্ন মনে হয়।

বোম্বাই সহর সামান্যত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম এই দিশী পাড়া যাহা সহরের হৃদয়। দ্বিতীয়, কেল্লা যাহা সহরের মাথা—যেখানে ধনাগমের যন্ত্র সকল পরিচালিত। তৃতীয়, মালাবার শৈল যাহা ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং শ্রীমন্ত সওদাগরদের বাস ও আয়েসের স্থান।

এই যে কেল্লা অঞ্চল, ইহার শিরোভূষণ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি। কেল্লা ও আফিসাঞ্চলের দিকে রাজমার্গ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখে মহারাণীর শ্বেত পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাজ্ঞী উচ্চ সিংহাসনে সমাসীনা, সিংহাসন বিতান মণ্ডপিত, বিতানের মধ্যভাগে ভারতনক্ষত্র, তদুপরি ইংলণ্ডের গোলাপ ও ভারতনলিনী, রাণীর পরিচ্ছদ ও আর সব মিলিয়া প্রতিমূর্ত্তিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিভাত হয়। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া প্রতিমূর্ত্তি ইহার নিকট নগণ্য।

মন্দির

মুম্বাতলাও-এর সম্মুখস্থ কাংস্তবাজার হইতে গিরগাম পর্য্যন্ত হিন্দু ও জৈন মন্দিরে সমাকীর্ণ। বোম্বায়ে যে সকল হিন্দু মন্দির দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেব ও শ্রীব্যঙ্কটেশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাদের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুবসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপত্তি। সেকালে এই অল্পসংখ্যক মন্দিরগুলি হিন্দুদিগের পূজার্চ্চনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কালক্রমে হিন্দুসংখ্যার বৃদ্ধিসহকারে নব নব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগরীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। সুরাট হইতে ইংরাজ রাজধানী বোম্বায়ে উঠিয়া আসিবার পর অবধি ক্রমে বোম্বায়ের প্রজাপুঞ্জ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৩৭ অব্দে মহা অগ্ন্যৎপাতে সুরাট নগরী ভস্মসাৎ হওয়াতে অনেকানেক বাসচ্যুত নিঃস্ব হিন্দুসন্তান উপজীবিকা অর্জ্জনাশয়ে সপরিবারে বোম্বাই আসিয়া বাস করে। অনেকে বাণিজ্য

জাতি বৈচিত্র্য

(৯৩ পৃষ্ঠা)

ব্যবসাসূত্রে বোম্বায়ে আকৃষ্ট হয়। পেশওয়া-রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর পুণা, সাতারা, ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রদেশ হইতে মারাঠাদলের আগমন; কচ্ছ, মারওয়াড় ও দেশীয় রাজসংস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বণিক ও শ্রমজীবী লোকের সমাগম ইত্যাদি কারণে বোম্বায়ে হিন্দুসংখ্যা বহুগুণ বিস্তৃত হইয়া সেই সঙ্গে নানা সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবদেবীর মন্দির চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৈষ্ণব, ভাটিয়া ও বণিকদের ব্যয়ে জীবন লালের বল্লভাচার্য্য মন্দির, মারওয়াড়ীদের বালাজী ও জগন্নাথ মন্দির, স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের মন্দির, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, রাধাবল্লভী, রামানুজ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ভজন পূজনাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

বালুকেশ্বর

প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বালুকেশ্বর অগ্রগণ্য। প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্র সীতান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই স্থানে এক রাত্রি যাপন করেন। তাঁহার শিবপূজার জন্য ভাই লক্ষ্মণ প্রত্যহ বারাণসী হইতে নূতন শিবলিঙ্গ আহরণ করিয়া আনিতেন। এক রাত্রে তিনি যথানির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে না পারাতে রাম অধৈর্য্য হইয়া বালুকা হইতে লিঙ্গ গড়িয়া পূজার্চ্চনা সমাধা করেন। এই ঘটনা হইতে মন্দিরের নাম বালুকেশ্বর। এক্ষণে তাহাতে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা বারাণসী হইতে সমানীত। এইস্থানে একটা সুন্দর ঘাটবাঁধানো পুষ্করিণী আছে তাহার নাম বাণতীর্থ। রামচন্দ্র তৃষ্ণাতুর হইয়া ভূমধ্যে বাণক্ষেপ করেন আর অমনি জলস্রোত উথলিয়া উঠে—তাহা হইতেই এই জলাশয়ের জন্ম ও নামকরণ। এই পুষ্করিণীর চারিধারে বড় বড় ছায়াতরু, আর কতকগুলি মন্দির, ধর্ম্মশালা ও ব্রাহ্মণের বাসগৃহ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রতীরস্থিত পাহাড়ে একটা ছিদ্র আছে, তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারিলে হিন্দুর পাপক্ষয় হয় ও জনশ্রুতি এই যে, শিবাজী রাজা এই উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃশাঙ্গ ছিলেন বলিয়া তাহাকে এজন্য অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

জাতি-বৈচিত্র্য

ভাষা অনুসারে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সামান্যতঃ চার ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিন্ধুদেশ। ভাষার উপর হইতে জাতিনির্ণয় করাও কঠিন নহে। প্রেসিডেন্সির নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় লোক বোম্বাই সহরে একত্রিত হইয়াছে। তাহাদের ভাষাও পৃথক্ পৃথক্, তবে উর্দ্দু বা হিন্দির অপভ্রংশ সাধারণ সকল জাতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিসঙ্গমেই বোম্বায়ের জাতি-বৈচিত্র্য। ইহাদের সবিস্তার বিবরণ বলিতে গেলে স্বতন্ত্র

গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন—তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। পারসী জাতির বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে গুজরাটী, মারাঠী ও মুসলমানদের কথা কিছু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দুই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। গুজরাটের অন্তর্গত একটি দেশীয় সংস্থান আছে—গাইকওয়াড়ের বরদা, তাছাড়া কচ্ছ ও কাঠেওয়াড় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্য। এদেশে কচ্ছ ও কাঠেওয়াড়ের বন জঙ্গল এখন সিংহের একমাত্র আবাসভূমি, অন্য কোথাও পশুরাজের রাজত্বের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কাঠেওয়াড় গুটিকতক ছোট ছোট প্রদেশে বিভক্ত যাহা এক এক রাজপুত ঠাকুরের শাসনাধীন, যেমন রাজকোট, গোন্দল, ভাওনগর, নওনগর, জামনগর ইত্যাদি। বোম্বায়ে যে সকল গুজরাটী আসিয়া বাস করিতেছে—বানিয়া, ভাটিয়া, কচ্ছী—তাহাদের অধিকাংশ বণিকজাতীয় লোক, বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত। গুজরাটী বণিকদের অর্জ্জনস্পৃহা যেমন প্রবল, যেমন বিষয়বুদ্ধি, তাহার সঙ্গে তাহাদের উদ্যম ও কর্ম্মদক্ষতা তেমনি প্রশংসাযোগ্য। পারস্য উপসাগর ও ভারত সাগরের উপকূল প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্র এই সকল বণিকদের হস্তে অনেককাল চলিয়া আসিতেছে। জাঞ্জিবার মস্কট প্রভৃতি স্থানে বোম্বাই বণিকদের গতিবিধি—আফ্রিকা আরবস্থান প্রভৃতি দূর দূর দেশের সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ। ইউরোপীয়েরা প্রথম যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখন এই বণিকদের সঙ্গেই তাঁহাদের প্রধান কারবার। তাঁহাদের কোন একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া গিয়াছেন—"ইহুদী তিন এক চীন, তিন চীনে এক বেনে।"

মধ্য হিন্দুস্থান হইতে বহুসংখ্যক মারওয়াড়ীর সমাগমে গুজরাটী বণিকদের বিলক্ষণ দলপুষ্টি হইয়াছে।

মারাঠী

বোম্বায়ে মারাঠী দলবলও সামান্য নহে। দক্ষিণে কৃষ্ণানদী হইতে উত্তরে তাপ্তী পর্য্যন্ত তাহাদের ভাষা বিস্তৃত। মারাঠীরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ নহে, ও-হিসাবে বাঙ্গালীদের সঙ্গে সমান। উহাদের বুদ্ধির দৌড় অন্যদিকে। আগেকার সে শৌর্য্যবীর্য্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, কেননা এখনকার কালে অসিজীবির উপর মসিজীবিরই প্রভুত্ব। আমাদের দেশে জীবিকার সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে ডাক্তারি, ওকালতী, কেরাণীগিরি এই সকল কাজই শোভা পায়। মারাঠীদের রাজনীতি কুশলতা এখন কংগ্রেসের কার্য্যে পর্য্যবসিত, বড় জোর বড়লাটের মন্ত্রীসভা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহাদের পূর্ব্ববীরত্ব লোপ পাইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাসদায়ক বর্গীগণ এক্ষণে হলধারণ করিয়া যথাকথঞ্চিৎ দিনপাত করিতেছে। শিবাজীর সে মাওলী সেনার বংশ এক্ষণে কোথায়?

বদরুদ্দীন তৈয়বজী (০৫ পৃষ্ঠা)

মুসলমান

বোম্বাইবাসীর পঞ্চমাংশ মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুই শ্রেণী—সুন্নী ও সিয়া। মহম্মদের উত্তরাধিকারী কাহিকদের লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ। সুন্নী মুসলমানেরা আবুবকর ওমার প্রভৃতি পরম্পরাগত ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করে। সিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে মহম্মদের জামাতা—তাহার প্রিয়তমা দুহিতা ফতেমার স্বামী যে আলি—তিনিই তাহার সিংহাসনাধিকারী যথার্থ ইমাম। আলির অভাগা পুত্রদ্বয় হাসেন হুসেন কারবালা রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিহত হয়, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া মহরমের সময় সিয়াপন্থাগণ বক্ষাঘাত ও আর্ত্তনাদে হৃদয়-বিদারক শোকপ্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সুন্নীদিগের উল্লাস ও অভিনন্দন। তুর্ক ও আরবজাতি প্রধানতঃ সুন্নী মুসলমান, পারস্যদেশে সিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। বোম্বায়ে সিয়া মুসলমানদের সংখ্যা সম্ভবতঃ অধিক, অন্ততঃ উভয় পন্থীর সংখ্যা সমান সমান।

বোম্বাইবাসী মুসলমান অন্যতর প্রণালী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে—দেশী ও বিদেশী মুসলমান। যাহাদের আসলে হিন্দুস্থানে জন্ম ও যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বেচ্ছাক্রমে অথবা দায়ে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে তাহাদের দেশী মুসলমান বলা যাইতে পারে—তদ্ভিন্ন আর সকলে বিদেশী শব্দের বাচ্য। এই সমস্ত মুসলমান জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া এক্ষণে যদিও মিশ্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে তথাপি তন্মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় স্বাবিমিশ্র থাকিয়া এখনো পর্যান্ত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে যথা,—কোঙ্কনী, দক্ষিণী, কচ্ছী, মেমন ইত্যাদি। বোরা বলিয়া একজাতীয় মুসলমান ফেরীওয়ালার মত দ্বারে দ্বারে জিনিস বেচিয়া বেড়ায়, তাহাদের অধিকাংশ আসলে গুজরাট হিন্দুবংশীয়, একাদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহারা সিয়াপন্থী, তাহাদের আদিম নিবাস সুরাট ও সুরাটের মুল্লাসাহেব তাহাদের ধর্ম্মযাজক। তাহাদের ভাষা গুজরাটী। বোরারা অত্যন্ত উদ্যমশীল, এমন স্থান নাই যেখানে তাহাদের গতি নাই, এমন জিনিস নাই যা তাহাদের বোচকায় না পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুসলমানের মধ্য হইতেও বড় বড় লোক হইয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বর্গীয় জষ্টিস বদরুদ্দীন তৈয়বজী।

খোজা নামক আর এক সম্প্রদায় আছে তাহারাও হিন্দু-মুসলমান। খোরাসান হইতে সমাগত পীর সদরুদ্দীন কর্তৃক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চার শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। যদিও খোজারা আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়

তথাপি তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্ম মিশ্রিত। কাজী তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দেন বটে কিন্তু অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর হিন্দুমতে জাতক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোরাণের কিয়দংশ ও দশাবতারের উপাখ্যান উভয়ই পঠিত হইয়া থাকে। কোরাণ ও হিন্দুশাস্ত্র এ দুয়েতেই তাহাদের শ্রদ্ধা, উহারা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের তীর্থ পর্য্যটন করে এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দায়াধিকার প্রভৃতি ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলে। মহম্মদের জামাতা আলীর প্রতি তাঁহাদের বিশেষ ভক্তি, এবং আলী কল্কী অবতার বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। খোজা মুসলমানদের মধ্যেও বোম্বায়ে অনেকানেক দানশীল শ্রীমন্ত সওদাগরের নাম শুনা যায়।

মুসলমানদের বিবরণ বলিতে গিয়া তাহাদের ইদানীন্তন শোচনীয় দৈন্যদশার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সেদিন যাঁহারা সর্দ্দার জাগীরদার সেনাপতি ছিলেন, এইক্ষণে তাঁহারা অনেকে পেয়াদা ও খানসামার কাজে দীনহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাঁহাদের সধর্ম্মীগণ পুরাকালে কাব্যসাহিত্য বিজ্ঞানক্ষেত্রে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ নাই, কোরাণের দুপাতা উল্টাইয়াই তাঁহারা আপনা-দিগকে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মনে করেন। অনেকে নিষ্কর্ম্মা উদ্যোগশূন্য, অন্যেরা নির্ধন অন্নচিন্তায় আকুল। উহার মধ্যে যাঁহারা শ্রীমন্ত তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যবহার জানেন না —নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রায়ই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহারা যে এক্ষণে আপনাদের দুরবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যতদূর করিবার তাহা করিয়াছেন, তাহাদের নিকট কাতর ক্রন্দনের কোন ফল নাই। বিদ্যা ও যোগ্যতা ব্যতীত সরকারী চাকরী আদায় করা যায় না; এই বুঝিয়া তাঁহাদের সমাজের নেতাগণ যোগ্যতর উপায় অবলম্বনে তৎপর হইয়াছেন ইহা একটা শুভ লক্ষণ।

বন্ধুগণ! আমিও বলি তোমাদের নিজের হাতেই তোমাদের মুক্তি। তোমরা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না। শ্রমসাধ্য শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনোযোগ কর—আত্মনির্ভর শিক্ষা কর। ইংরাজ-রাজ্যে যে উন্নতির পথ হিন্দু মুসলমান সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই পথ অনুসরণ কর। তোমরা এককালে সাহিত্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ইউরোপের আদর্শ ছিলে—তোমাদের নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবার যদি তোমাদের বাসনা থাকে, তবে আপনাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নশীল হও। আলিগড় এখন তোমাদের একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি—ইহার উপর মসলিম ইউনিবর্সিটি প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হইবে। প্রস্তাবিত ইউনিবর্সিটি
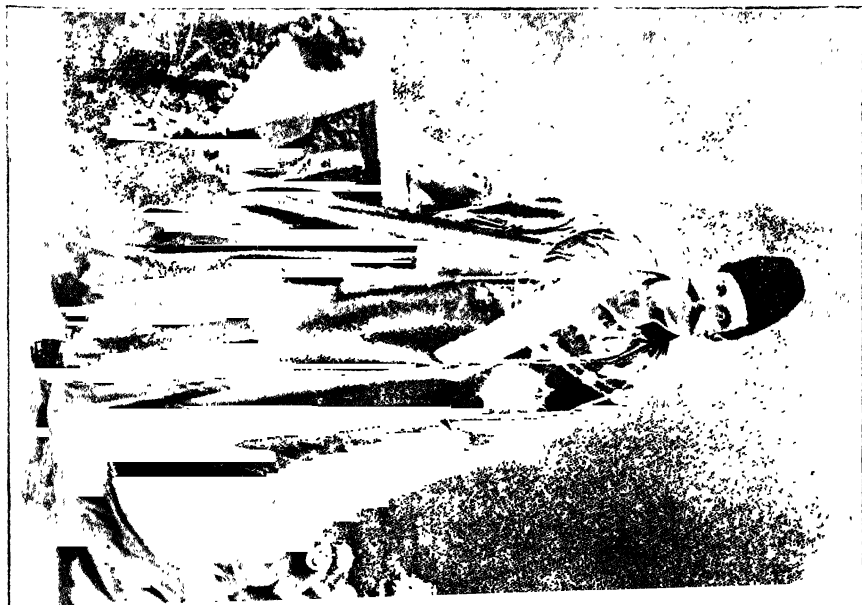
সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট যদিও তোমাদের মূল প্রস্তাব সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য করেন নাই তথাপি যতটা পাওয়া যাইতেছে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহা চাই সবটা পাইলাম না বলিয়া যতটা পাওয়া যায় তাহা ফেলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আমার শেষ কথা এই যে একতা তোমাদের জাতীয় সম্পদ, ইহা হেলায় ফেলায় হারাইও না। ইসলাম তোমাদের জাতীয় বন্ধনে আহ্বান করিতেছেন। সাবধান যেন তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ দলাদলি প্রবেশ না করে। ঐক্যবলের উপর তোমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এক হইলে তোমাদের উত্থান, ছিন্ন ভিন্ন হইলেই পতন।

বাণিজ্য ব্যবসা

বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের চেয়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ। বাঙ্গলা দেশের ধন চাকরীতে ও জমিদারীতে এইজন্য তাহা বড় ম্লান, তাহাতে ধনাগমের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। বোম্বায়ে জমিদারীর প্রতি লোকের লোভদৃষ্টি নাই, কেননা এ অঞ্চলে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসর অন্তর রাজস্ব পরিবর্ত্তনের নিয়ম আছে—সরকারী খাজনা দিয়া রায়তের হাতে মুনফা এত অল্প থাকে যে ভূসম্পত্তি করিতে লোকেরা লালায়িত নহে। এদেশে বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান উপায়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" একথা বোম্বাইবাসিরাই ভাল বুঝে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সুরাট পশ্চিম ভারতের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। ইউরোপের সহিত এ দেশীয় বাণিজ্য-কারবার সুরাট বণিকদের হাতেই ছিল। ১৬১২ সালে ইংরাজদের কুঠী সুরাট নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাট হইতে বাণিজ্য-স্রোত ক্রমে বোম্বায়ে বিবর্ত্তিত হইল। মোগলরাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাটের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান ও মুম্বাপুরীর সৌভাগ্য উদয়। এই শ্রীবৃদ্ধি লাভের অনেকগুলি কারণ আছে। ইংলণ্ডের সান্নিধ্য, প্রশস্ত সুন্দর বন্দর, পোত নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে বোম্বাই শীঘ্রই নদীতীরবর্ত্তী সুরাট নগর ছাড়াইয়া উঠিল। বোম্বাই তুলার ব্যবসার জন্য প্রাচীনকাল হইতে প্রখ্যাত। এখানে ভারতের নানাস্থান হইতে তুলার আমদানী হইয়া বস্তাবন্দী করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়। এক সময়ে বোম্বাই হইতে চীন দেশে অনেক তুলা রপ্তানি হইত, এখন তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ মারাঠী যুদ্ধের সময় তুলার ব্যবসা বন্ধ হওয়া—সেই সুযোগে চীনেরা আপনাদের দেশে তুলার চাস আরম্ভ করে। সেই অবধি বোম্বাই হইতে চীন দেশে তুলার রপ্তানি ক্রমশই হ্রাস হইয়া যায়।

১৮১৩ পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল, অন্য কেহ কোম্পানির পরওয়ানা ভিন্ন বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারিত না। বাণিজ্যের উপর এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া অবধি তাহার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত। বোম্বায়ে তুলার ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতিতে স্বাধীন বাণিজ্যের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। আমেরিকার যুদ্ধের সময় ঐ ব্যবসা বিশেষরূপে উত্তেজিত হয়। ১৮৬১ হইতে ৬৫ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর আমেরিকানদের ঘরাও যুদ্ধের দরুণ সে দেশ হইতে তুলার আমদানী বন্ধ হওয়াতে বোম্বায়ের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হইল। তুলার বাজার এমনি চড়িয়া উঠিল যে ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে বোম্বায়ের লোকেরা নিদান ৭১৮ কোটি টাকা উপার্জ্জন করে। টাকা হইলে তাহা বাড়াইবার চেষ্টা হয়—সকলে সুলভ উপায়ে ধনোপার্জ্জনে মত্ত হইয়া উঠিল। কত ব্যাঙ্ক, কত অর্থকরী অনর্থকরী কোম্পানি ভেকছত্রের ন্যায় গজাইয়া উঠিল তাহার সংখ্যা নাই। অর্থোপার্জ্জনের অন্যান্য ফন্দির মধ্যে ব্যাকবে আবাদের এক প্রস্তাব মস্তক উত্তোলন করিল। ব্যাকবে উপসাগরের তীরভূমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও অন্য আবশ্যকীয় কার্য্যে নিয়োগ করা ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লোকেরা ভাবিল জমির মূল্য তিনগুণ চারগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দ্বীপের মধ্যে বাসযোগ্য ভূমি দুর্লভ, এ সময়ে না জানি ভূমিলাভে কতই লাভ—প্রত্যেক কাঠার মূল্য ততটা সোনার দর মনে হইল। একটি কোম্পানি উঠিয়া এই কার্য্যে কটিবদ্ধ হইল—ব্যাক্‌বের সেয়ার বিক্রয় তাহার কাজ। সেয়ার কেনা ব্যাচা, এই এক রোগ জন্মিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেয়ার কিনিতে ব্যস্ত। যে দরিদ্র সে এক রাত্রির মধ্যে ধনী হইবে—লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইবে—সকলেই সহজ উপায়ে টাকা করিতে তৎপর।

এই রোগ শুধু যে ব্যাকবের সেয়ার ব্যাপারেই বদ্ধ তাহা নহে। ব্যাকবের তীরের সমতুল্য মূল্যবান্ অথবা তদপেক্ষা আরো কত অমূল্য ভূমি স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে, মাজেগাম, সিউরী প্রভৃতি তীরদেশও উৎকৃষ্ট বন্দরে পরিণত হইতে পারে, এই বলিয়া নানান্ ফন্দি বাহির হইল। যে কোন ফন্দি অর্থপিশাচ ধূর্ত্তের মনে উদয় হয়, তাহার পৃষ্ঠপোষক এক এক Financial কোম্পানী। পরে যখন বোম্বায়ের ভূমি ভাণ্ডার শূন্য হইল, ভূ-কোম্পানির গ্রাসোপযুক্ত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, তখন এক নূতন মড়ক আসিয়া উপস্থিত। বাঙ্গালার পোর্টক্যানিঙ কোম্পানি উঠিয়া অর্থনাশের আর এক সুগম পথ আবিষ্কার করিল। অন্যান্য কোম্পানির উপর পোর্টক্যানিঙ চাপিয়া বোম্বাই বণিকদের ভাণ্ডারে যা কিছু বাকী ছিল, নিঃশেষে যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল।

আমেরিকার যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। যেমন উত্থান তেমনি

পতন। তুলার দাম যেমন চড়িয়াছিল তেমনি উতরিয়া গেল। সে যে হুলস্থূল বাধিয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। এই সময়ে আমরা বোম্বায়ে মাণিকজীদের বাটি হইতে এই বিপর্য্যয় কাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। এই সেয়ার মেনিয়ায় সকলে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—এই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তেমনি আবার চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই জানিতে পারিল এই অসংখ্য কোম্পানির মূলধন কেবল কাগজ মাত্র, কেবল সেয়ার লইয়া ইহাদের মৌখিক কারবার। বিপদের সময় দেখা গেল তাহাদের হাতে কিছুমাত্র সম্বল নাই, এই অভ্রভেদী অট্টালিকার প্রকাণ্ড ইমারত তাসের দুর্গের ন্যায় এক ধাক্কায় চুরমার হইয়া গেল। তখন লোকের চোখ ফুটিল। দেখিতে পাইল যে তাহারা যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই। যে মাটী সে মাটীই রহিল, সোনায় পরিণত হইল না। বাণিজ্যে লোকসান অন্যত্রে ঘটিয়া থাকে কিন্তু ১৮৬৪—৬৫ সালে বম্বের যে দুর্দ্দশা তার তুলনা পাওয়া ভার। খ্যাতনামা লক্ষপতি ক্রোড়পতি একে একে নিঃসম্বল হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি, কিছুকাল পরে আমরা শুনিলাম যে সুবিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যিনি এককালে সেয়ার বাজারের অধিনায়ক ছিলেন, যাহার তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে লোকের ভাগ্যচক্র ঘূর্ণিত হইত, তিনি নিজেই ধরাশায়ী হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন--তাঁহাকেও শেষে Insolvency কোর্টের শরণাপন্ন হইতে হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বোম্বাই প্রাচীনকাল হইতে তুলার ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু এ শুধু তুলার বাজার নয়। বোম্বাই তুলা হইতে পরিধেয় বস্ত্র-বয়ন আরম্ভ করিয়া অবধি তাহার শ্রীসম্পদের এক নূতন দ্বার খুলিয়া গেল, সেই সঙ্গে শ্রমজীবিদিগের জীবিকার্জ্জনের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। কাপড়ের কল কারখানা খুলিয়া বোম্বাই আর সকল সহরকে হারাইয়া দিয়াছে। এই সকল কাপড়ের মিলে বোম্বাই সহর সমাকীর্ণ, তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৫৪ সালে তাহার প্রথম কাপড়ের মিলের পত্তন হয়। তখন হইতে তাহার যে উন্নতির সূত্রপাত হইল, বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী কলকারখানা মিলিয়া সেই উন্নতি স্রোত প্রতিরোধ করিতে পারিল না। বোম্বায়ের এই শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টর ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পরিণাম সকলেই জানেন। যখন দেখে বোম্বায়ের সঙ্গে সে সম্মুখ যুদ্ধে পারিয়া উঠে না, তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তার রপ্তানি কাপড়ের উপর কর বসাইয়া তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। একেই বলে Free trade! ইহার বিরুদ্ধে তাহার হাজার চীৎকার অরণ্যে রোদনই সার।

বোম্বাইবাসীগণ আমাদের মত নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া নাই। এই সকল কাপড়ের কল ছাড়া তাহাদের ধন আরো অনেক প্রকার ব্যবসা-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইতেছে। এখন যে বাঙ্গলা দেশও কিয়ৎপরিমাণে জাগিয়া উঠিয়াছে—শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের প্রতি

জনসাধারণেব মনোযোগ পড়িয়াছে ইহা এক শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের দেশে আপামর সাধারণ অধিকাংশ লোকেই কৃষিকার্য্যে রত, মধ্যবিত্ত লোকের সরকারী চাকরীই প্রধান উপজীবিকা। শ্রমের অভিনব দ্বার উন্মুক্ত হইয়া স্বাধীন ব্যবসাক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া ভিন্ন এদেশের কল্যাণ নাই। ঐদিকে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য, যত্ন ও উৎসাহ যতই যায় ততই দেশের মঙ্গল।

দানশীলতা

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে বোম্বাইবাসীগণ যেমন অর্জ্জনক্ষম তেমনি দানশীল—তাঁহাদের দানশীলতা আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধনকুবের—হিন্দু, পারসী, মুসলমান—দানে তাঁহারা সকলেই মুক্তহস্ত। সার্ব্বজনিক কার্য্যে বোম্বায়ের লোকদের যেমন দানের প্রাচুর্য্য, আমাদের তেমনি তঞ্চকতা। বাঙ্গলা দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় দানকুণ্ঠিত—সকলের চেয়ে কম দান করে। বদান্যতাগুণে বোম্বাই-বাসীরা আমাদের দৃষ্টান্তস্থল।

বোম্বায়ের নামকরণ

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে ষোড়শ বৈদিক সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কাব, জাতকর্ম্মের পর নামকরণ—সন্তান জন্মিবার দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সামান্যতঃ ইহার সময় নির্দ্দিষ্ট। সকল বর্ণের মধ্যে সময়ের এই নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস, ক্ষত্রিয়দের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদের ষোড়শ, শূদ্রদের দ্বাবিংশ দিবস নামকরণের নির্দ্ধারিত কাল। আর কার্য্যগতিকে এই কালের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে।

গুজরাটী ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতকর্ম্ম-প্রথা এক্ষণে প্রচলিত নাই, মারাঠী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা অনুষ্ঠান কবিয়া থাকে, কিন্তু নামকরণ সাধারণ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। লৌকিক ব্যবহারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

অশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের মতে -

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিবসে, কিম্বা প্রথম মাসের অন্য কোন দিবসে, অথবা প্রথম সম্বৎসরে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পিতা যদি বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নামকরণ করিবেন। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের তিনবার মস্তক আঘ্রাণ করিবেন:—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে
আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি স জীব শরদাং শতং॥

ক-কারাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্ব স্বর অন্তে থাকা বিধেয়।

প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি দ্বি অক্ষর নাম রাখিবেন; ব্রহ্মবর্চ্চসকাম চতুরক্ষরের নাম রাখিবেন; পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কন্যার নামে আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে এইরূপ নাম রাখিবে, যেমন সুখদা, সুভদ্রা, বরদা, যশোদা, সাবিত্রী, কলাবতী ইত্যাদি। পারস্কর গৃহ্য সূত্রের মতে পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত (দৈবদত্তিঃ ঔপমন্যবঃ ইত্যাদি) হওয়া বিধেয় নয়। স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইবার বাধা নাই, যথা—গান্ধারী, কৈকেয়ী, জানকী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস।

গোভিলীর গৃহ্য সূত্রে নামকরণ-প্রথা এইরূপ লিখিত আছে:—

কুমারকে শুদ্ধ বসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রমণকরতঃ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পরে "যজ্ঞে সুসীমে", "যথা যন্ন প্রমীযেত পুত্রো জনিত্র্যা অধীতি" প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে "যদদশ্চন্দ্রমসী ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবেন ও যথোক্ত-প্রকার হোমাদি অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রের নামকরণ করিবেন।

কালক্রমে এই বৈদিক-প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কার পদ্ধতি প্রয়োগে নামকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত প্রকার:—

একাদশ কিংবা দ্বাদশ দিবসে পিতা সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ উদ্দেশে নামকরণ সঙ্কল্প করিবেন। নিম্নলিখিত নাম হইতে নাম নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কৃষ্ণ	অনন্ত	অচ্যুত	চক্রী	বৈকুণ্ঠ	জনার্দ্দন,	উপেন্দ্র	যজ্ঞপুরুষ	বাসুদেব	হরি	যোগীশ	পুণ্ডরীকাক্ষ।

চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এক এক মাসের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—চৈত্রপ্রধান কৃষ্ণ, বৈশাখপ্রধান অনন্ত ইত্যাদি। এই হেতু যে মাসে সন্তান জন্মে সেই মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে তাহার নাম রাখিতে হইবে। চৈত্রে জন্মিলে তাহাকে কৃষ্ণের নাম দেওয়া বিধেয়।

অপিচ গৃহ-দেবতা কি কুল-দেবতার নাম হইতেও সন্তানের নাম দেওয়া যায়, যথা—শঙ্কর, মহাদেব, গোবিন্দ, গণেশ, গোপাল, বামন ইত্যাদি।

সংস্কার-পদ্ধতিতে নাম রাখিবার আর এক প্রথা নির্দ্দিষ্ট আছে।

একটি কাংস্যপাত্রে স্বর্ণ-লেখনী দ্বারা চতুর্ব্বিধ নাম লিখিতে হইবে। যথা,—

১। কুল-দেবতার নাম (রাম, কৃষ্ণ, বিঠোবা ইত্যাদি)

২। মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম (কৃষ্ণ, অনন্ত ইত্যাদি)

৩। রাশির নাম।

৪। কুলাচার অনুযায়ী নাম।

উল্লিখিত প্রকারের কাংস্যপাত্রে নাম লিখিত হইলে পিতা শিশুকে দক্ষিণ ক্রোড়ে বসাইবেন ও পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে নাম উচ্চারণ করিয়া "তদস্তু মিত্রাবরুণ" মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কর্ম্ম সমাপণ করিবেন।

এই সকল নিয়মের ও বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। কুল-দেবতার নাম ও রাশিনাম রাখিবার প্রথা বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল না। অবতারবাদ হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর এই সকল নাম প্রচার হইয়াছে ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। কি মহারাষ্ট্রে কি গুজরাটে পুত্র-কন্যার নাম অধিকাংশ দেব-দেবীর নাম হইতে গৃহীত। বৈদিক নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে দৌলত রায়, হুকুমত রায়, খুসাল, মহতাব, ন্যামত প্রভৃতি পারস্য ভাষায় সংরচিত কতকগুলি নাম দেখা যায়।

গুজরাটে নামকরণকে 'বারসা' (বার বাসর) বলে; ইহাতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই; নামকরণ কার্য্য স্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্তানের নাম রাখিবার ভার বিশেষরূপে তাহার ফোই অর্থাৎ পিসিমার হস্তে সমর্পিত, ও এই উপলক্ষে তিনি ভ্রাতার নিকট হইতে উপহার প্রত্যাশা করেন।

গুজরাটে নামকরণের প্রথা এইরূপ,—

চারিজন বালক যাহাদের উপনয়ন হয় নাই, অথবা চারিজন স্ত্রী একখণ্ড রেশমের কাপড়ের চারি কোণ করিয়া দাঁড়ায়, পরে মাতা সন্তানকে তাহাতে রাখিয়া দেন। বালকেরা অথবা মেয়েরা সেই ঝোলা দুলাইতে দুলাইতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে :—

ঝোলী পোলী পীপল পান
ফোইয়ে পাড্র্যু (অমুক) নাম।
(পিসি রাখে অমুক নাম)

পরে মিষ্টান্ন পরিবেশন হইয়া ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের সচরাচর দুই নাম থাকে, এক ডাক-নাম, এক রাশি-নাম।

মারাঠীদের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জনসাধারণে তাহারা এক নামে পরিচিত, আপনাদের মধ্যে তাহাদের আর এক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—

কৃষ্ণরাও—নানা সাহেব
ভীমরাও—তাত্যা সাহেব
খণ্ডেরাও—ভাই
গণপতরাও—বালা

এইরূপ আপ্পা আন্না প্রভৃতি আরো কতকগুলি ঘরাও নাম আছে, গুজরাটীদের মধ্যে এইরূপ নানু, মনু, মোটাভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ করা যায়। অনেক সময় পিতাকে পুত্রেরা বাবার পরিবর্তে হয়ত মোটাভাই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতাকে

বাল্‌কেশ্বর মন্দির (৯৩ পৃষ্ঠা)
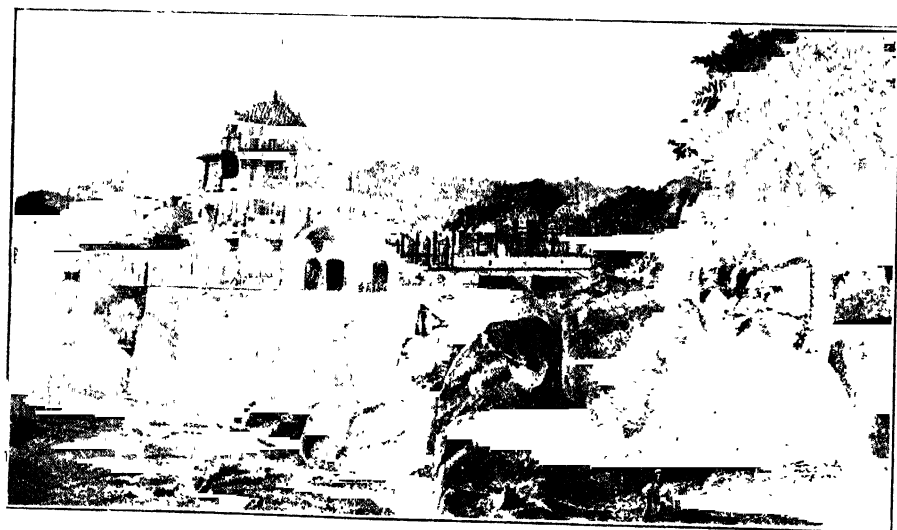
জৈন মন্দির—আবু (১০৮ পৃষ্ঠা)

'মা' না বলিয়া মোটী বেন (দিদি) বলিয়া ডাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনার জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোন নাম নাই।

মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী ও বাঙ্গলা ভাষায় সম্বন্ধসূচক নামাবলী পাঠ করিয়া পাঠকগণ এই তিন ভাষায় সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি কবিতে পাবিবেন।

বাঙ্গলা	মারাঠী	গুজবাটী	বাঙ্গলা	মাবাঠী	গুজবাটী
বাপ / পিতা	বাপ / পিতা	বাপ / পিতা	ননদ	ননদ	ননদ
মা / মাতা	আই / মাতুশ্রী	মাতা / মাতা	শ্যালা	মেহুনা	শালা
ভাই	ভাই	ভাই	ভাজ	ভাউজাই	ভোজাই / ভাবী
ভগিনী / বোন	বহিন	বেন	ভগিনীপতি / বোনাই	বনেবী / দাজী	বনেবী
খুড়তুতা ভাই	চুলত ভাউ	পিত্রাই	সতীন	সবত	সোখ
কাকা	কাকা	কাকা	মামা	মামা	মামা
কাকী	কাকী	কাকী	পিসি	ফোই	ফোই
স্বামী	নবরা / ভ্রতার	ধনী, বর	মাসী	মাউসী	মাউসী
স্ত্রী	বায়কো	বায়ডী	বউ	সুন	বহু
বড়ঠাকুর	জ্যেঠ	জ্যেঠ	জামাই	জাঁবাই	জমাই
দেওর / ঠাকুর-পো	দীর	দের	ঠাকুর-দাদা	আজা	দাদা
			দিদিমা	আজী	দাদী
			পৌত্র / নাতী	নাতু	পৌত্র
			ভাইপো	পুতনা	ভতৃজ

জ্যেষ্ঠা ও মূল, এই দুই নক্ষত্র অশুভ বলিয়া পবিগণিত। এই দুই নক্ষত্রে পুত্র কি কন্যা জন্মিলে জননী অল্পকালেই মৃত্যু আশঙ্কা করেন। এই অমঙ্গল নিবারণহেতু সেই নক্ষত্রেব নামে সন্তানের নাম রাখিবার নিয়ম আছে। জ্যেষ্ঠাতে জন্ম হইলে নাম জেঠা কিম্বা জেঠী, মূল নক্ষত্রে জন্ম হইলে নাম মূলজী, মূল, শঙ্কর অথবা মূলী রাখা হইয়া থাকে। যদি অনেক সন্তান মৃত হইয়া দৈববশাৎ এক সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকেব সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের যত্ন নাই, তথায় হয়ত ধূলা, কচবা, জূঠা, পূঁজা প্রভৃতি অযত্নসূচক নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

এদেশের নাম রাখিবাব সময় পুত্রেব নামেব সঙ্গে পিতার নাম যোগ করিয়া দিবাব এক রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত। মাবাঠী গুজরাটী পারসী সকলেরই মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট

হয়; যথা—পিতার নাম সারাভাই, পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই, পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ। পারসীদের মধ্যেও এইরূপ—পিতার নাম খরসদ্‌জী, পুত্রের নাম মানকজী খরসদ্‌জী, পৌত্রের নাম জাহাঙ্গীর মানকজী। অনেক স্থলে এই স্বনাম ও পিতৃনাম ভিন্ন জাতিসূচক নাম কিম্বা মর্য্যাদাসূচক কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন বন্দ্য, ভট্ট, মিত্র, দাস প্রভৃতি জাতিসূচক নাম ব্যবহৃত হয়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। তবে মারাঠীদের মধ্যে অনেকেরই কুল-পদবী থাকে; যথা—গোড়বোলে (মিষ্টভাষী), কড়কড়ী, জোষী, মুনসী, তর্খড়কড় ইত্যাদি। ইহা অপরিবর্ত্তনশীল বংশগত নাম।

গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত, কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে; যেমন জগজীবন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস ইত্যাদি। এক প্রদেশে রণছোড় নামক এক ভীরুস্বভাব দেবতা আছে, অনেকে সেই নাম ধারণ করেন। একজন নব্যসম্প্রদায়ের গুজরাটী কায়স্থ, ঐ নামের উপর চটিয়া আপনার পুত্রের নাম রণজিৎ রাখিয়াছেন। বাঙ্গলা নামের অনুকরণেও উহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুত্র-কন্যার নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মারাঠা দেশে বিঠোবা নামক দেবতা বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু মারাঠীদের মধ্যে বিঠোবা, বিঠ্ঠলরাও অনেকের এই নাম শোনা যায়।

স্ত্রীলোকের নাম অধিকাংশ দেবী ও নদী হইতে গৃহীত হয়; যথা—পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, উমা, দুর্গা, রেবা, যমুনা। সীতা চিরদুঃখিনী বলিয়া কন্যার ঐ নাম রাখিতে বঙ্গবাসীরা যেরূপ কুণ্ঠিত, এখানে সেরূপ ভাব দেখা যায় না। সীতা, জানকী প্রভৃতি নাম এদেশে অত্যন্ত প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন পুষ্প, স্বর্ণ, মণিমানিক্য হইতেও নাম দেওয়া হয়। মোতী, সোনু, জহর, রত্ন, চম্পা, চামেলী এ সকল নামও প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রী পতিগৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নাম সচরাচর লক্ষ্মী রাখা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে স্বামীর নাম অনুসারে স্ত্রীর নাম রচিত হয়। স্বামীর মহাদেব হইলে স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবা হইলে রুক্মা, রাম হইলে সীতা। কন্যার নাম যদি আওড়ী (আদুরী) থাকে, তবে আত্মারামের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহার নাম রাধা হইতে পারে, কেননা কৃষ্ণের আর এক নাম আত্মারাম ও কৃষ্ণের আদরিণী রাধা। গুজরাটে অনেক সময় অবিবাহিতা কন্যার প্রতি কুমারী ও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি বধূ শব্দের প্রয়োগ হয়।

বাই শব্দ মর্য্যাদাসূচক—স্ত্রীদের নামের প্রথমে কি শেষে ইহা যুক্ত হয়; যথা—সোনুবাই, আনা বাই, দুর্গা বাই, বাই রতন, বাই মাণক ইত্যাদি।

স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর রেডিমণি

(১০৫ পৃষ্ঠা)

পারসীরা তাহাদের পারস্যদেশীয় বীরপুরুষদের নাম সচরাচর ধারণ করে ; যথা— রোস্তম, যমসেদ, কাইখসরু, জাহাঙ্গীর, খুরসদ, সোরাব, সোরাব ইত্যাদি। এই সকল নামে গুজরাটের প্রথা অনুসারে জী কিম্বা ভাই যোগ করিয়া দিলে পারসী নাম সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি হিন্দুনামও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, রতন-জী, পদম-জী, দাদা-ভাই, আদর-জী, জীবন-জী ইত্যাদি। পারসী রমণীগণ হিন্দু-স্ত্রীর নামানুযায়ী নাম ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি পারস্য নামও প্রচলিত আছে ; যথা—সিরীণ, পরোচিস্তা ইত্যাদি।

পারসীদের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত পদবী ও উপাধি দৃষ্ট হয়। তাহা অনেক স্থানে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ব্যবসা হইতে কল্পিত বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বাটলীওয়ালা, দারুখানাওয়ালা, ঘাসওয়ালা। এই সকল নামের মধ্যে দুটি নাম বোম্বায়ের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ - বাটলীওয়ালা ও রেডিমনি (নগদ কড়ি)। স্যর জমসদজী জিজি ভাই প্রসিদ্ধ নাইটের পদবী বাটলীওয়ালা। প্রবাদ আছে যে প্রথমে স্যর জমসদজী বোতল বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বাণিজ্য কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় দ্বারা ব্রিটিস নাইটের উপাধি প্রাপ্ত হন। অপর একজন পারসী নাইটের উপাধি Readymoney, ইনি ভারত বর্ষের নাইট, ইহার নাম স্যর কাভয়াসজী জাহাঙ্গীর, ইনিও উদারতা এবং বদান্যতাগুণে নাইট পদবী পাইয়াছেন। এমন কোন হিতকর বিষয় নাই যাহাতে ইহার বদান্যতা প্রকাশ না পায়, ইহার দান দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ নহে। সকল জাতির জন্যই ইহার ধনাগার মুক্ত রহিয়াছে। ইংলণ্ডবাসীদের দারিদ্র্য মোচনই বল, আর স্বদেশের কল্যাণ সাধনই বল, ইহার নগদ টাকা সর্ব্বত্রই কার্য্যে আইসে।

বঙ্গদেশ ও বোম্বায়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে নামরাজ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ। বঙ্গবাসীর মধ্যে দেব দেবীর নামেরও অভাব নাই, এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির মনোহর সুন্দর পদার্থ হইতে আমরা অনেক সময়ে নাম গ্রহণ করি—এদেশে প্রায় সেরূপ নাম শুনা যায় না, যেমন চারুচন্দ্র নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র নীলকমল ইত্যাদি। কতকগুলি নাম গুণবাচক ; যথা—সত্য, করুণা, প্রতাপ, মনোমোহন ; আর কতকগুলি নাম রাজা অথবা বীরসংজ্ঞক ; যথা—দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র, নরেন্দ্র। এ সকল বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের নাম তুলনা করিয়া দেখিলেও বঙ্গাঙ্গনাদের প্রাধান্য দিতে হয়। বঙ্গাঙ্গনাদের নামে বিচিত্রতা ও শ্রীমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সৃষ্টির সমুদয় মধুর ও সুন্দর পদার্থ হইতে সেই সকল নাম সংগৃহীত। সৌদামিনী, উষা ; নলিনী কুমুদিনী মালতী প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প ; ঋতুপ্রধান বসন্ত

ও শরতের অধিষ্ঠাত্রী কুমারী; সুশীলতা দয়া করুণা প্রভৃতি গুণসমূহ; স্বর্ণ হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য এ সকলি বঙ্গনারীদিগের নামের কল্পতরু। নামের সঙ্গে গুণের যোগ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়, তবে বঙ্গস্ত্রীদের মত রূপগুণসম্পন্ন নারীরত্ন কোথায় পাওয়া যাইবে?

সর্ব্বিসে প্রবেশ

আমার হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় পরীক্ষা শেষ হইলে আমি আহমদাবাদে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর রূপে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। Sir Bartle Frere তখন বোম্বায়ের গবর্ণর ছিলেন। তিনি বিনয় সৌজন্য গুণে, ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্টালাপে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। যাহাতে আমার সেই প্রথম কর্ম্মভূমির পথ পরিষ্কৃত ও সুগম হয় সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রথম দুই এক বৎসর কলেক্টরি কর্ম্মে আমার ডিষ্ট্রিক্টের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইত—পরে যথাসময়ে ঐ প্রদেশের আসিষ্টণ্ট জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। জজীয়তি কর্ম্মের সুবিধা এই যে, কলেক্টরি কাজে গ্রামস্থ রায়তের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও রেবেন্যু কর্ম্মচারিদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ব্যাড়াইবার প্রয়োজন হয়, জজের সেরূপ করিতে হয় না। যাহারা গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ও আরাম ভালবাসেন, তাহারা এই কারণে রেবেন্যু ছাড়িয়া জুডিস্তাল ক্ষেত্র বাছিয়া লন। আর যাদের চলা ফেরা, শিকার করিয়া ব্যাড়ানো এই সবে আমোদ, তাঁহারা অনেক অর্থের প্রলোভন ভিন্ন কলেক্টর-মাজিষ্ট্রেটের কাজ ছাড়িতে চাহেন না। আমার এই জজীয়তী সর্ব্বিস সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমি যখন ধূলিয়ায় আসিষ্টণ্ট জজ হইয়া কর্ম্ম করি, তখন সেখানকার মাজিষ্ট্রেট প্রিচার্ড সাহেব আমার কোর্টে চারিজন আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্যের মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। সেই মকদ্দমায় তিনি নিজে ফরিয়াদী, নিজেই সাক্ষী, তাঁহার একতরফা সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে এই বলিয়া আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছিলাম। এই বিচারে প্রিচার্ড সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টে অভিযোগ করেন; গবর্ণমেণ্ট আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল আনিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ভাগ্যে হাইকোর্ট আমার পক্ষ লইয়া আমার রায় বাহাল করিলেন, তাই আমাকে আর বিশেষ কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইল না, কেবল ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হওয়াই আমার শাস্তি, সেও আবার অনেক লেখালেখির পর অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানেই হইল। খানদেশ হইতে পুণা, আমার শাপে বর হইল।

আমার বিদায় উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা আমাকে এক মানপত্র, সহজ ভাষায় Address দেয়—ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা আরো চটিয়া উঠিলেন। গোদের উপর আবার বিস্ফোটক! গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন কেন এইরূপ অ্যাড্রেস লওয়া হইল—অমনি তার কৈফিয়ৎ তলব। সেই অবধি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন সরকারী কর্ম্মচারী অ্যাড্রেস গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই কড়াক্কড় নিয়ম জারী হইল। আমার সমুদয় সর্ব্বিসের মধ্যে আমার উপরিওয়ালাদের সঙ্গে এই যা একটু গোলযোগ বাধিয়াছিল, তা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মতান্তর ঘটে নাই। আমার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে আমার বিশেষ কিছু দোষ ধরিবার নাই। পুণায় বদলী হইয়া অবধি জজীয়তি কার্য্যে আমার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। মাঝে মহারাজা হোলকর ও ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোচারণের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে আমাকে উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিতে হয়—এইটি ছাড়া উত্তরে সিন্ধুদেশ হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জজের কর্ম্মেই আমার সর্ব্বিসের সমুদায় কাল অতিবাহিত হয়। পুণার জজের হাতে সেখানকার সর্দ্দারদের সম্বন্ধে একটু Political কাজ আছে—তিনি দক্ষিণ সর্দ্দারের Political agent, আমিও এই কাজে দুই বৎসর জজের সহকারী ছিলাম। এই উপরি কাজ অতি সামান্য, সর্দ্দারদের খোঁজ খবর নেওয়া আর বৎসর অন্তর একবার দরবারের আয়োজন করা, এই বৈ নয়। এইরূপে ৩০ বৎসরেরও উপর জুডিশ্যাল খাতায় নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিয়া অবশেষে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বোম্বাই সহরের কথা অনেক বলা হইয়াছে, সে কথাগুলি ভূমিকা মাত্র। যতদিন মানকজীদের সঙ্গে বোম্বায়ে ছিলাম ততদিন আমার হাতে কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না—আমার একমাত্র কাজ ভাষাশিক্ষা। পরে ভাষার পরীক্ষা দিয়া আমার নিয়মিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

তখন হইতে আমার রীতিমত সর্ব্বিস আরম্ভ। আমি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া ও সেই সঙ্গে আমার আত্মকাহিনী যাহা কিছু মনে পড়ে তাহা যোগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে।

ফর্লো

আমার সর্ব্বিসের মধ্যে দুইবার ফর্লোর ছুটি পাওয়া যায়। প্রথমবার সপরিবারে ইংলণ্ডে যাত্রা করি। দ্বিতীয়বার ১৮৯৩ সালে এদেশেই অবকাশ কাল যাপন করি।

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গিয়া দেখি সে যেন এক নূতন দেশ, দুএকজন ছাড়া আমার পূর্ব্ব পরিচিত বাল্যবন্ধু কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, লোকদের সঙ্গে নূতন করিয়া আলাপ পরিচয় করিতে হইল। বৈলাতিক মোহ আর আমাকে আচ্ছন্ন করে না, ইংলণ্ড আর "হোম" বলিয়া বোধ হইল না। আমরা ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডন সহরে প্রথমে কিছুকাল বাস করি, পরে Brighton Torquay ও ফ্রান্সের প্যারী নিস্ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ছুটির সময়টা কাটাইয়া দিলাম।

আবু পাহাড়

পরের বার যে ফর্লো পাই তাহাতে সিমলা প্রয়াণ। রাজপুতানা লাইন দিয়া বোম্বাই ছাড়িয়া আগ্রায় আমাদের দলবলের সহিত মিলিত হইলাম। পথে আবু ও জয়পুর দেখিয়া লইলাম। আবু পাহাড় অতি সুন্দর রমণীয় স্থান, পাহাড়ের ক্রোড়ে একটি সরোবর শোভা পাইতেছে। দৃশ্য মনোরম, বায়ু স্বচ্ছ স্বাস্থ্যকর। দেলওয়ারা নামে সুবিখ্যাত জৈনমন্দির সেখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিস। মন্দিরগুলি শ্বেতপাষাণ নির্ম্মিত—জৈন নির্ম্মাণ কৌশলের উৎকৃষ্ট নমুনা। দুর্ভাগ্যক্রমে তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি সকল বিধর্ম্মীদের হস্তে পড়িয়া ছিন্ননাসা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের একস্থানে এক অদ্ভুত নিলাম চলিতেছিল। নিলামে পৌরোহিত্যের অধিকার মারওয়াড়ী ধরণে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। নিলামে যার ডাক সবচেয়ে বেশী, দেবার্চ্চনায় তার সর্ব্বোচ্চ অধিকার—পুরোহিতের প্রাপ্য দানসামগ্রী তাহারই।

জয়পুর

জয়পুর রাজপুতানার রাজধানী মধ্যে নব্যধরণে গঠিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী, পথ ঘাট প্রশস্ত, গোলাপী রঙের বাড়িঘরগুলি সূর্য্যকিরণে সুনীল আকাশতলে ঝক ঝক করিতেছে। বিপণি নানাবিধ সৌখীন দ্রব্যভাবে সুসজ্জিত। জয়পুরে হরিমোহন সেনের আমল হইতে বাঙালীদের আধিপত্য অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। দেওয়ান কান্তিবাবু আমাদের অশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহ পরিদর্শনে লইয়া গেলেন। নগরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে, তাহার মাঝখানে একটি যাদুঘর, এবং ভিতরে নানা কলকৌশলময় দেশী বিলাতী সামগ্রী সংগৃহীত। উদ্যানের উত্তর সীমায় ব্যাঘ্রাদি জন্তুর একটি পশুশালা আছে।
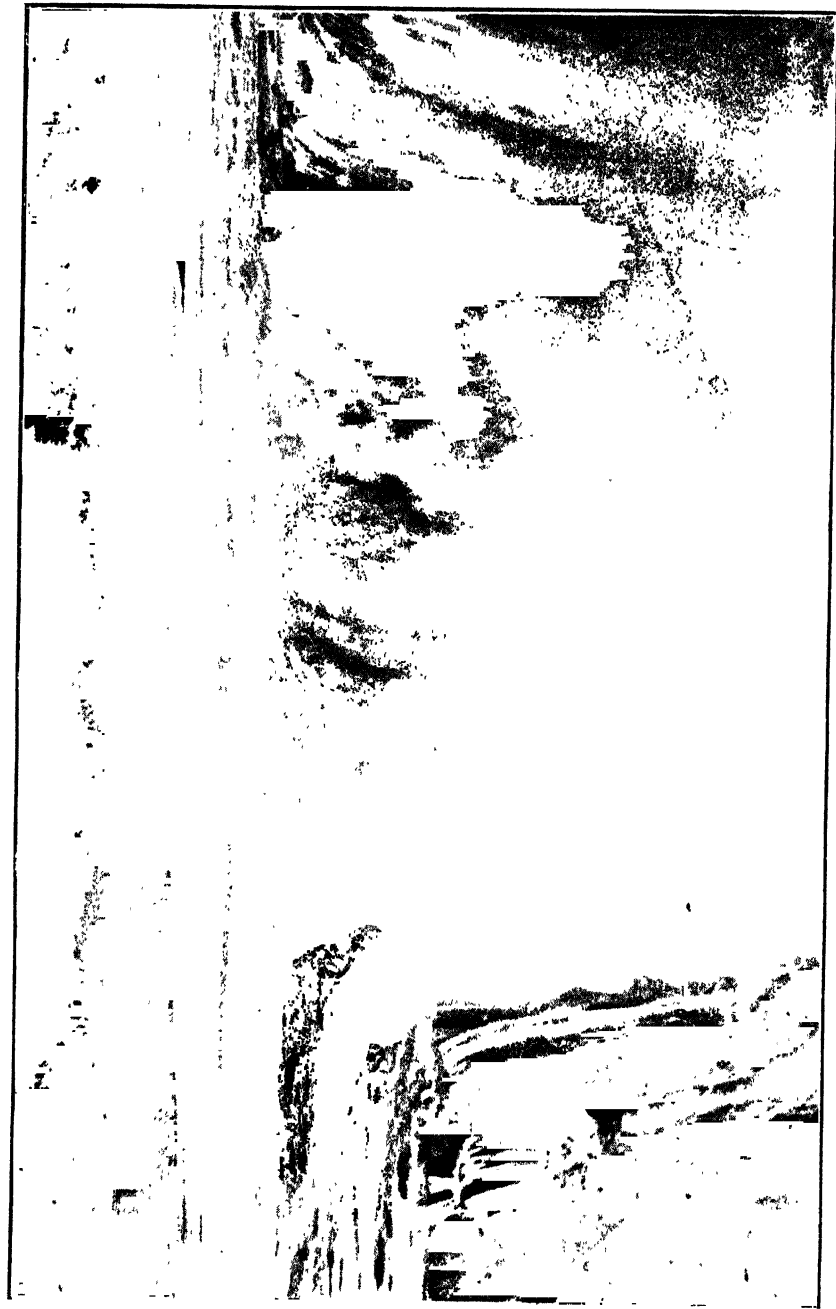
গোদাবরীর জলপ্রপাত

(১১০ পৃষ্ঠা)

তাজমহল

জয়পুর হইতে আগ্রা। বলা বাহুল্য যে তাজ দর্শন না করিয়া আগ্রা ছাড়ি নাই। সৌন্দর্য্যের আকর হৃদয়ানন্দকর পৃথিবীর তাজ। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন রাণীর ভাগ্যে এরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হয় নাই। ইহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে হৃদয় মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

সিমলা

১৮৯৩ সালে এপ্রিল মাসে সিমলা গিয়া পৌছান যায়; ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে আমাদের অধিবাস। সেখানকার গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা শীত সকল ঋতুই আমাদের উপর দিয়া একে একে চলিয়া গেল। এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুলের বাহার। গ্রীষ্মকালে Rhododendron ফুল ফুটিয়া চারিদিক লালে লাল, বসন্তে গোলাপের বাহার, বর্ষায় চন্দ্রমল্লিকা। Hydrangea পুষ্পগুচ্ছ সময়ে সময়ে রং বদলাইয়া বহুরূপীর ন্যায় নব নব বেশ ধারণ করে—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কর্পূরতলার কুমার ও রাণীসাহেবের আতিথ্যসৎকারে আমাদের প্রবাসযাপন সুখের হইল। শেষ দিকে তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়া এক সপ্তাহ কাটানো গেল। সিমলা পর্ব্বত যাহা দেখিলাম তাহা আমার কল্পনার হিমালয় নহে। কল্পনার সিমলা ও বাস্তবিক সিমলায় অনেক তফাৎ। দার্জিলিং হইতে তবুও দূর হইতে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়—সিমলায় তাহাও হয় না। সিমলার দৃশ্য অন্যরূপ। সেই দেবতাত্মা হিমালয়, যাহা—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ

পূর্ব্ব পশ্চিম সাগর-ধৌত পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান, ঐ স্বর্গীয় গিরি পার্থিব ধূলির আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। বাড়ী ঘরদুয়ার—মানুষের কারিগরিতে তাহার দেবত্ব ডুবিয়া গিয়াছে। সিমলা বড়লাটের আরাম নিকেতন। বড়লাট আর জঙ্গী ও পঞ্জাবী দুই ছোটলাট একত্র হইয়া ঐ স্বাস্থ্য-নিবাসের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন। 'জাকো' যক্ষপতির বাসগৃহ বলিয়া মনে হইল না। সেখানে একজন সন্ন্যাসী একদল বানর সৈন্যের সেনাপতি হইয়া বাস করিতেছেন। সিমলায় একজন ফিরিঙ্গি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিন্দু-যোগীর ন্যায় জীবনযাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

নাসিক

নাসিক দাক্ষিণাত্যের বারাণসী, গোদাবরী তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বহুযাত্রী সমাকীর্ণ ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। রাম সীতার বনবাস সম্বন্ধে রামায়ণে যে সকল ঘটনা বর্ণিত আছে ইহা তাহার রঙ্গভূমি। নদীর এপারে পঞ্চবটী, পরপারে

ত্র্যম্বক তীর্থ। পঞ্চবটী দণ্ডকারণ্যের সেই প্রদেশ—রামচন্দ্র সীতাদেবীর সঙ্গে বনবাসে গিয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাহা সীতা অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বিতীয়বার দর্শন করেন। এই দ্বিতীয় বনবাসের কথা লইয়া ভবভূতির "উত্তর চরিত" নাটক বিরচিত। পঞ্চবটীতে সীতারামের বনবাসের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে—রামকুণ্ড যেখানে রামচন্দ্র স্নান করিতেন, সীতাগুম্ফ যেখান হইতে রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ হয়, যেখানে সূর্পনখা লক্ষ্মণের মন ভুলাইতে গিয়া নাককাণ হারাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, পাণ্ডারা এই সকল মনঃকল্পিত স্থান দেখাইয়া যাত্রীদের কৌতূহল উদ্দীপন করে। কেহ কেহ বলে, সূর্পনখার নাসিকাছেদের প্রবাদ হইতে 'নাসিক' নামের ব্যুৎপত্তি। এই কি সত্যই সেই রামায়ণের পঞ্চবটী? ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা যায় না। পাণ্ডারা নিজেদের লাভ হিসাবে যাহা বলে তাহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না; কিন্তু তাহাদের কথায় সন্দেহ যাই থাক্ এটা ত নিশ্চয় যে কবিকীর্ত্তিত পুরাণো গোদাবরী এখনো যেমন তেমনিই রহিয়াছে। সেই নদী তাহার প্রাচীন স্মৃতি লইয়া এখনো পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গগুণে নাসিকের যে পদগৌরব তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

নাসিকে একটি মুসলমান যুবকের সহিত আমাদের আলাপ হয়, তাহার নাম আবদুল হক। লোকটা খুব মিশুক, চতুর ও উদ্যমশীল, নিজগুণে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে দাসীরূপে বশ করিয়া লয়। আমাদের সঙ্গে তিনি ভাই বোন পাতাইয়াছিলেন—আমি তাঁর ভাই-সাহেব, আমার স্ত্রী ভান-সাহেব। আমাদের বাড়ী সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেন ও আপনার জীবনের সমস্ত ভাবি সঙ্কল্প লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। সে সময়ে তিনি পুলিশের এক সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে হাইদ্রাবাদে গিয়া নিজামের চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমে নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রমে উচ্চপদে আরোহণ করিলেন ও যিনি সামান্য আবদুল হক নামে পরিচিত ছিলেন তিনি সর্দ্দার দিলার জঙ, দিলার-উদ্দৌলা উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবী উপার্জ্জন করিলেন। হাইদ্রাবাদে তিনি নিজামের ষ্টেট রেলওয়েতে নিযুক্ত হইয়া সেই সংক্রান্ত কার্য্যে ইংলণ্ডে গিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বোম্বায়ে তিনি বিস্তর বিষয়সম্পত্তি করিলেন এবং সেখানকার এক নামাঙ্কিত বড় হোটেল (Watson's Hotel) ক্রয় করিয়া তাহার অধিস্বামী হন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তিনি তাঁহার গরীব ভাইবোনকে ভোলেন নাই। আমরা যখনি বোম্বায়ে যাইতাম, তখনি নিজ হোটেলে আমাদের আতিথ্য করিতেন, আমাদের খাইখরচার বিল পাঠাইতেন না। ভান-সাহেবের খাতিরে আমরা তাঁর হোটেলে গিয়া দিব্য আরামে কাল কাটাইতাম। অনেক বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু

রামমন্দির—নাসিক (১১০ পৃষ্ঠা)

ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির (১১০ পৃষ্ঠা

সুন্দরনারায়ণ মন্দির—নাসিক (১১০ পৃষ্ঠা
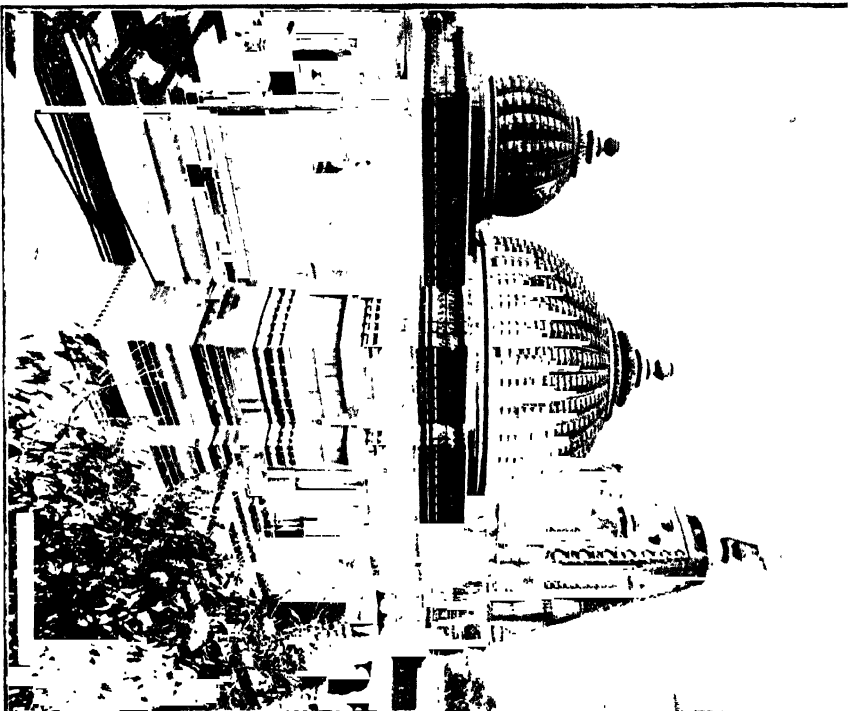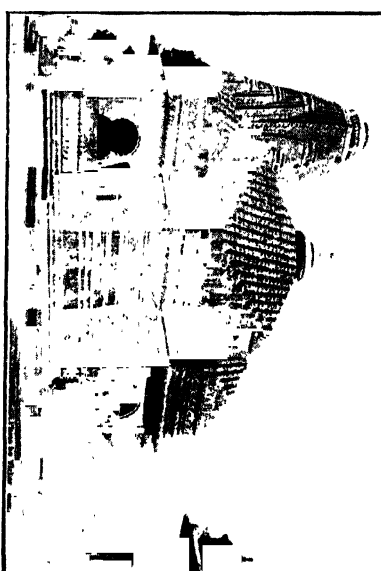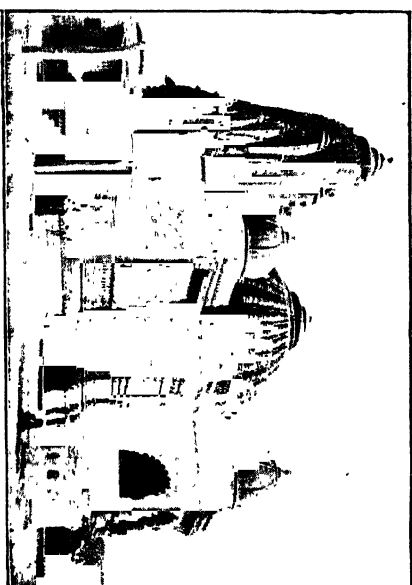
হইয়াছে। মহম্মদী আইন অনুসারে আমরা তাহার বিষয়ের অংশীদার। তাহার মৃত্যুর পর আমার এক বন্ধু আমাকে বঙ্গ করিয়া বলেন—"আমি ভেবেছিলাম মৃত্যুর সময় ভাই-সাহেব তাঁহার উইলে তোমাদের স্মরণ করবেন, কৈ তা ত কিছু করলেন না?" করেন নাই সত্য, আমরাও তাহার বিষয়ের অংশ দাবা করিয়া কোর্টে গিয়া মকদ্দমা করি নাই।

লেনা

লেনার গুহামন্দির সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরস্থিত একটি বৌদ্ধ মন্দির। ভিতরে অনেকগুলি প্রস্তরখোদিত বৌদ্ধবিহার ও চৈত্য দেখা যায়। ইহার কোন কোন অংশের নির্ম্মাণকাল খৃষ্টাব্দ ১৫০, কতক বা আরো প্রাচীনতর বলিয়া অনুমিত হয়। এই গুহা মন্দির এখনো একপ্রকার অক্ষত রহিয়াছে এবং গুহার অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিগুলির অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে।

পশ্চিম ভারতে গৃহনির্ম্মাণ কৌশলের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকানেক গুহামন্দির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ইহাদের কতক হিন্দু, কতক বা বৌদ্ধ-মন্দির—ইহাদের মধ্যে এলিফাণ্টা গুহামন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এলিফাণ্টা

যিনি বোম্বায়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন তিনি যেন এলিফাণ্টা না দেখিয়া বাড়ী না ফেরেন। এই এলিফাণ্টা দ্বীপে যে সমস্ত গুহামন্দির আছে তাহা পাহাড় খুদিয়া নির্ম্মিত। আপলো বন্দর হইতে ষ্টিমারে করিয়া এই দ্বীপে এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়, বন্দর বোটে করিয়া গেলে আর একটু বেশী সময় লাগে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বড় বড় পাথর ফেলিয়া সমুদ্রতীর হইতে গুহামুখ পর্য্যন্ত এক সোপানপথ প্রস্তুত, কিন্তু ভাটার সময় নৌকা কাছে ঘেঁসিতে পারে না, তীর হইতে অনেক দূরে রাখিতে হয়। নামিবার স্থানে পূর্ব্বকালে একটি হস্তীর বিশাল পাষাণমূর্ত্তি ছিল, তাহা হইতে পোর্ত্তুগীজ লোকেরা এই দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। দ্বীপে এইক্ষণে এই হস্তীমূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট পিণ্ড বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। গুহার প্রবেশদ্বারটি বেশ বড় এবং সারি সারি চারি স্তম্ভের মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদভার বহন করিতেছে। স্তম্ভের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া ৪১, তাহার কয়েকটি ভগ্নদশাপন্ন। মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩০ ফীট দীর্ঘ ও পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত ততটা প্রস্থ।

এই মন্দির এইক্ষণে নিত্যনিয়মিত পূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি কোন

কোন শৈব উৎসবে তথায় হিন্দু-যাত্রীর সমাগম হয় ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এক হিন্দু মেলা জমে। এলিফাণ্টা যে শৈবমন্দির এই মেলার প্রচলনই তাহার প্রমাণ কিন্তু তাহার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্দিরের অভ্যন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ মূর্ত্তিই শৈবমূর্ত্তি। উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার বামে বিষ্ণু দক্ষিণহস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ধারিয়া আছেন; দক্ষিণে মহাদেব —তাহার হাস্যদৃষ্টি করস্থিত ফণিফণার উপর নিপতিত। নরকপাল ও বিল্বপত্র তাহার শিরোভূষণ।

ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণে অর্দ্ধনারীশ্বর। বামার্দ্ধ গৌরী ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্ত্তি। মহাদেবের চারি হস্তের এক হস্ত নন্দী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এই মূর্ত্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এবং বামে গরুড়বাহন বিষ্ণু। উপরিভাগে ও পশ্চাতে অন্যান্য দেবদেবীগণ বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্রদেব ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীন।

ত্রিমূর্ত্তির বামে হর-পার্ব্বতীর বিশাল মূর্ত্তিদ্বয়। হরশির হইতে গঙ্গাযমুনা সরস্বতী নিস্যন্দিত। শিবের দক্ষিণে তাঁহার অন্যান্য অনুচরগণ। পার্ব্বতী শিবের দিকে ঝুঁকিয়া এক পিশাচীর উপর বাম-হস্তে ভর দিয়া আছেন, তদুপরি গরুড়াসন বিষ্ণু। সর্ব্বোপরি ছয়টি মূর্ত্তি, তাহার দুইটি নারী অন্যগুলি নরমূর্ত্তি।

ত্রিমূর্ত্তির আরও একটু বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ-সভা। একজন পুরোহিত লজ্জাশীলা বধূকে আগু বাড়াইয়া দিতেছেন।

অপর দিকের প্রকোষ্ঠে গণেশের জন্ম-অভিনয়। হর-পার্ব্বতী কৈলাস-পর্ব্বতে একাসনে উপবিষ্ট—আকাশ হইতে দেবগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পার্ব্বতীর পশ্চাতে ধাত্রী একটি শিশু কোলে করিয়া আছে।

দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে ফিরিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে দেখিবে রাবণ কৈলাস-পর্ব্বত সরাইয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এদিকে পর্ব্বত কম্পমান দেখিয়া পার্ব্বতী ভয়ে জড়সড়। মহাদেব তাঁহার পদাঙ্গুলির দ্বারা রাবণের শিরোপরি পর্ব্বত এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে, তাহার তলে দশানন দশ সহস্র বৎসর চাপা পড়িয়া থাকেন, অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

ইহা হইতে পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত খোদিত দেখা যায়। অষ্টভুজ কপালমাল রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দক্ষ-বধে নিযুক্ত—তাহার উপরিস্থিত একলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট দেবগণ হত্যাকাণ্ড সভয়ে দর্শন করিতেছেন।

আরো কতক পা চলিয়া গেলে প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরব-মূর্ত্তি ও যোগাসনস্থিত মহাযোগী এই মূর্ত্তিদ্বয় দৃষ্ট হইবে।

রামকুণ্ড হইতে গোদাবরী-সেতু

(১১০ পৃষ্ঠা
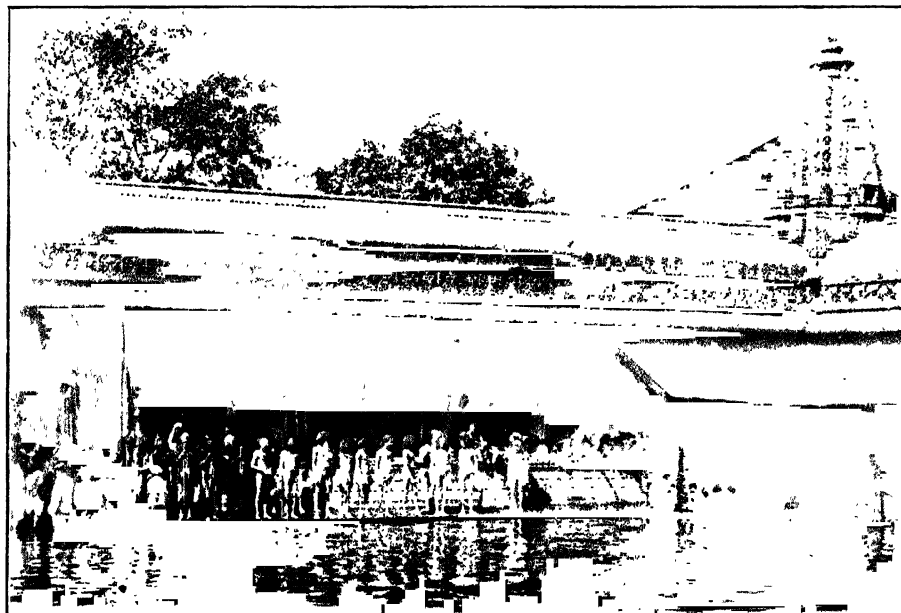
এই সকল দেবমূর্ত্তি কল্পনাযানে আমাদিগকে দেবসভায় লইয়া যায়। কোথাও দ্বারপালগণ পিশাচসঙ্গে যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান, কোথাও হর-পার্ব্বতীর বিবাহোৎসব, কোথাও কৈলাসে তাহাদের ঘরকন্না, কোথাও মহাদেব ভূতগণসাথে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্ত, কোথাও তিনি কপালধারী রুদ্রমূর্ত্তি, কোথাও ধ্যানমগ্ন মহাযোগী। কোন স্থানে দেখিবে কমলাসন ব্রহ্মা, কোথাও শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু, কোথাও ঐরাবতবাহন ইন্দ্রদেব, গণেশ ঠাকুর, কামদেব, তিলকধারী জটায়ু, কৈলাসতলে রাবণ, কোথাও গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্ত্তিমতী। দুঃখের বিষয় যে খোদিত মূর্ত্তি সকল বিকলাঙ্গ, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাদিগকে পূর্ব্বকালে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এক ত কালের দুর্ব্বার হস্ত, তাহার উপর মুসলমান ও খৃষ্টানের অত্যাচার। এই মন্দির তাহার পূর্ণযৌবনে যে কি সুন্দর ছিল তাহার চিত্র কল্পনাতেই রহিয়া যায়।

অজন্তা

এতদ্ভিন্ন কার্লী কান্হেরী সালসেট প্রভৃতি গুহামন্দির আরো অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে অজন্তা ও ইলোরা এই দুইটি সবিশেষ বর্ণনীয়। এই দুইটি ক্ষেত্রই নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভূত। অজন্তার মন্দির পশ্চিমঘাটের এক পাহাড়ে খোদিত, খানদেশে থাকিতে একবার ইহা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের গা দিয়া একটি ঝরণা পড়িতেছে, ৩০ ফীট উচ্চ হইতে পড়িয়া নীচে কতকগুলি জলকুণ্ড সৃজন করিয়াছে, এই নিম্নভূমি একটি সুন্দর বনভোজনের স্থান। গুহার পথে ঝরণাটি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। গুহাগুলি একটি নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত, পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খোদিত। দূর হইতে সেগুলি সারি সারি ছোট ছোট পায়রার খোপের মত দেখায়। গুহাগুলি দুই শ্রেণীর, বিহার ও চৈত্য। চৈত্য ভিক্ষুদের ভজন পূজনের স্থান, বিহার তাহাদের বাসগৃহ। খানিকদূর গিয়া সারি সারি বিহারের বারাণ্ডার থাম আর গোল গোল চৈত্য গুহার খিলানের আকৃতি চোখে পড়ে। এই পার্ব্বত্য আশ্রমটি অতি মনোহর নির্জ্জন স্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে।

গুহাচিত্রেতেই অজন্তার বিশেষত্ব। তাহার সকল গুহাই যে চিত্রিত তাহা নহে। সব শুদ্ধ প্রায় ২৮টা গুহা আছে তাহার ৭।৮টির গায়ে ছবি আঁকা দেখা যায়। প্রথম নম্বর গুহা হইতে বুদ্ধদেবের বাল্য কাহিনী আরম্ভ করিয়া ২৬ নম্বর গুহায় তাঁহার পরিনির্ব্বাণের চিত্র দেওয়া আছে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে স্থানে স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও জাতকাদি গল্পের ছবি আছে। অজন্তার চিত্রাবলীর অনেকগুলি বিলুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলি চিত্রকরেরা যতদূর সাধ্য সংস্করণ চেষ্টা করিতেছেন এবং আবশ্যক মত প্রতিলিপি তুলিয়া লইতেছেন। আমাদের একটি আত্মীয়, অসিতকুমার হালদার, আর্ট স্কুলের ছাত্র, অজন্তার শিল্প দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো তাকে চিত্রের অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনো বর্ত্তমান আছে আমরা যদি কেউ আজীবন ধরে সেগুলির প্রতিলিপি করি, তবে এ জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কি না সন্দেহ।" মোগল চিত্রের তুলনায় এই সকল চিত্রের কথায় তিনি বলিতেছেন, "মোগল ছবি সাধারণতঃ ছোটই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মত্ব হিসাবে সে সকল চিত্র অতুলনীয় কিন্তু প্রশান্ত ভাবপূর্ণ বড় বড় চিত্র দেখতে গেলে অজন্তাকেই প্রাধান্য দিতে হয়।"

Mrs. Herringham নামে একটি চিত্র-শিল্পী মহিলা অজন্তার চিত্রোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সেই সকল চিত্রের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা তাঁহার মুখে আর ধরে না। অসিতকুমারকে তিনি বলিতেন, "আমাদের দেশে এত প্রাচীনকালের আঁকা এ রকম নিখুঁত ছবি থাকলে আমাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও তাদের বেশী আদর যত্ন করতুম। বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।" এই বিদুষী মহিলার কার্য্য শেষ হইলে এই সকল অপূর্ব্ব গুহাচিত্রের অনেক তথ্য জানা যাইবে, আশা করা যায়।

এই সকল প্রাচীন চিত্র যেমন অজন্তার গৌরব, তাহার খোদিত মূর্ত্তিগুলিও তেমনি প্রশংসনীয়। ভিন্ন ভিন্ন গুহা বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত। যৌবনে তথাগত, মাতৃক্রোড়ে শিশু, ষড়রিপু প্রলোভনে বিজয়ী ধ্যানীবুদ্ধ, পরিনির্ব্বাণশায়ী বুদ্ধ —বুদ্ধদেবের এই ছোট বড় নানান্ মূর্ত্তি শিল্পকৌশলে অদ্বিতীয়। বুদ্ধমূর্ত্তি ভিন্ন অনেকানেক নরনারী ও হস্তী মূর্ত্তি এবং ভিক্ষুদের শয্যাগৃহ প্রভৃতি খোদিত জিনিষ আছে, সকলি চমৎকার। অসিতকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, খোদিত চিত্রের গঠন ও সজ্জার সহিত লিখিত চিত্রের গঠনাদির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

এই সমস্ত বৌদ্ধ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল ৮০০ বৎসরব্যাপী—অশোকের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ যুগের শেষভাগ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। শেষ ভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন ব্রাহ্মণ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে, মন্দির নির্ম্মাণেও সেই মিলনের চেষ্টা লক্ষিত হয়।
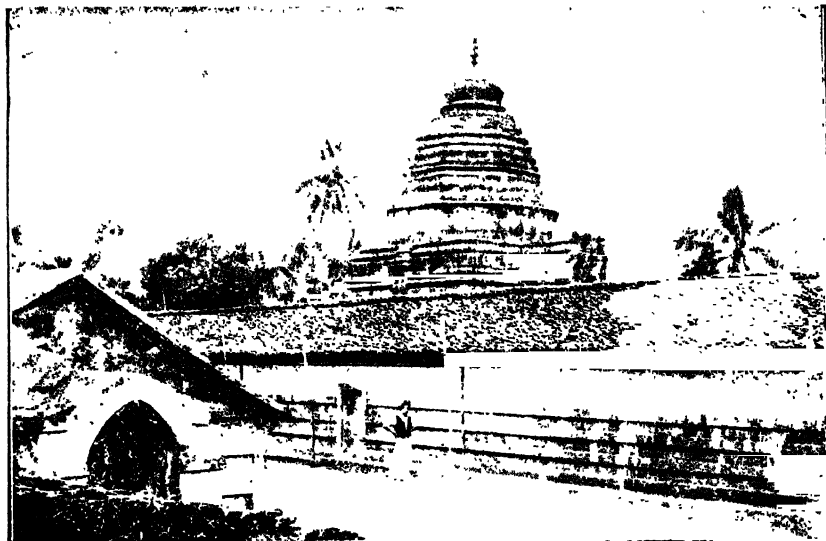
গোবর্ণ মন্দির—কারওয়াব (১১৫ পৃষ্ঠা)

এলিফাণ্টা গুহা—শিবপার্ব্বতী (১১১ পৃষ্ঠা)

কারওয়ার

কারওয়ার কর্ণাটকেব প্রধান নগর। আমি বোম্বায়ে যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি, তন্মধ্যে কারওয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে সর্ব্বাগ্রগণ্য, ইহা সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটি সুন্দর বন্দর, গিরি নদী উপবনে সুশোভিত। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউ গাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকুল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে। জজের বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্ম্মিত। সমুদ্রতীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন প্রথমে অসহ্য বোধ হয়, ক্রমে অভ্যাসবশতঃ তাহার কঠোরতা মন্দীভূত হইয়া যায়। সমুদ্রেব দৃশ্য সকল সময়েই মনোহর আব সমুদ্র-স্নানে বড়ই আরাম। সমুদ্রে সাঁতার দিবার আরাম, এমন অন্য কোথাও ভোগ করা যায় না। বন্দরের এই শৃঙ্খলবদ্ধ সমুদ্র পুরীর সমুদ্র অপেক্ষা অনেক শান্ত, সাঁতার দিয়া অনেক দূব যাওয়া যায়। বাঙ্গলার ক্রোশভর দূরে গুঢেলী নামে একটি ছোট্ট পাহাড় আছে, উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, সেখানে গিয়া আমাদের অনেক সময় বনভোজন হইত। সমুদ্রের নানা জাতীয় সুস্বাদু মৎস্য আমাদেব ভোগে আসিত; মৎস্যজীবির ভাগ্যে এমন স্থান সহজে মেলে না। বন্দরে আঞ্জদ্বীপ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়, পোর্ত্তুগীস নাবিকগণ ইউবোপ হইতে ভারতে আসিয়া যেখানে প্রথম পদার্পণ করে সে এই দ্বীপ। কালানদীতে অনেক সময় আমরা নৌকা করিয়া বেড়াইতাম, তাহার পরপারে হাইদার আলিব গিরিদুর্গ একটি দেখিবার স্থান। কানাড়া জেলায় আরো কত কত দর্শনীয় জিনিস আছে তন্মধ্যে গেরসপ্পা জলপ্রপাত ভুবনবিখ্যাত। তীর্থস্থানের মধ্যে গোকর্ণ তীর্থ উল্লেখযোগ্য, যাহা রঘুবংশে 'গোকর্ণ নিকেতমীশ্বরং' বলিয়া বর্ণিত—আমরা কারওয়ারে থাকিতে সেই তীর্থে গিয়া মহাদেবের মন্দির দর্শন করিলাম।

নারেল পুণম

বোম্বাই, কারওয়ার এই সকল সমুদ্রতীরের জায়গায় একটা পরব হয় যা অন্যত্রে নাই—তার নাম "নারেল পুণম", শ্রাবণী পূর্ণিমা তার সময়। এই সময় বর্ষা ঋতুর অবসান বলিয়া ধার্য্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক, পি·এণ্ড ও

কোম্পানির জন্য নয়) সমুদ্র পথ উন্মুক্ত, শুভযাত্রা উদ্দেশে ফলফুল নারিকেল উপহার দিয়া সমুদ্রের আরাধনা করিতে হয়। হিন্দুগণ ছোট বড় সকলে সাজসজ্জা করিয়া নারিকেল ও পুষ্পহস্তে সমুদ্রাভিমুখে বাহির হয়। লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগর অর্চ্চনায় সম্মিলিত—পুরোহিতের মন্ত্রপূত চাউল দুধ নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবের ভোগে আইসে তাহা নয়। নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একদল কুলী তাহা সাঁতার দিয়া ধরিতে যায় ও কাড়াকাড়ি করিয়া যে পারে বরুণের ধন লুটিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না, বরং উদার হস্তে তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করেন। বোম্বায়ে এই উৎসবে লোকের বিশেষ উৎসাহ। ময়দানে মেলা বসিয়া যায়। কোথাও খ্যালনা বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পালওয়ানের মল্লযুদ্ধ চলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জেতার প্রতি দর্শকমণ্ডলীর করতালি সাবাসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও একদল নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের জন্য কতপ্রকার ফন্দী করিয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে একজন গণকঠাকুর হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণিয়া দিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই তাঁহাতে দৈবশক্তি মূর্ত্তিমতী। অন্যত্রে নাগরদোলায় বালকেরা ঘুরপাক খাইতেছে। নানা দিক হইতে লোকজনের যাতায়াত, সকলেই দুদণ্ডের জন্য আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তৎপর।

কানাড়ায় চন্দন বৃক্ষ জন্মে, সেকানকার চন্দন কাঠের উপর নক্সাকাটা বাক্স টেবিল পরদা প্রভৃতি অনেক জিনিষ তয়ের হয়। তাহাদের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। অনেকানেক কারিগর এই কাজ করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। কারওয়ারের কথায় কর্ণাটী নর্ত্তকীদের লোভনীয় নৃত্যগীতের উল্লেখ না করিলে এ প্রসঙ্গ অঙ্গহীন হইয়া পড়ে কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহার সবিস্তার বিবরণ হইতে বিরত হইলাম। একটি কথা মনে হইতেছে বলি, আমরা কারওয়ারে একবার একটি নর্ত্তকীর মুখে জয়দেবের কাব্যগীত শুনিয়াছিলাম। গান অতি চমৎকার, আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও শুনা যায় না। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকদের প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিবার রীতি আছে কিন্তু সংস্কৃত যে তাহাদের মুখে কত ভাল শুনায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। কর্ণাট সম্বন্ধীয় আরো অনেক বলিবার আছে—নূতন জিনিস নূতন নূতন লোক কিন্তু সে সব অনেককালের কথা, লিখিবার মত তেমন স্পষ্ট মনে হইতেছে না। জায়গাটার কেবল এক দোষ যে যাতায়াতের অসুবিধা। সপ্তাহে সপ্তাহে একটা মেল-ষ্টীমার আমাদের ডাক বহন করিয়া আনিত;

কিছুকাল পরে তার আসা বন্ধ হইল, তখন বর্ষাকালে কাবওয়ার যেন বন্দীশালার মত বোধ হইত। কিন্তু—

একো হি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।

বহুগুণে একটি দোষ জানা নাহি যায়,
চাঁদের কলঙ্ক যথা কিরণে লুকায়।

সিন্ধুদেশ

ভূগোল।—কর্ণাটক আমার কর্ম্মক্ষেত্রের দক্ষিণসীমা, উত্তরসীমা সিন্ধুদেশ। সিন্ধুদেশ (গ্রীকদের সিন্দমানা) প্রাচীনকাল হইতে তিন ভাগে বিভক্ত; দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যসিন্ধু। লার অথবা দক্ষিণসিন্ধু, হাইদ্রাবাদেব দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। করাচী ও টাট্টা এই অঞ্চলের দুই প্রধান সহর।

করাচী বন্দর।—পূর্ব্বকালে করাচী মক্রাণ প্রদেশেব অন্তর্ভূত ছিল। ঐ বন্দর খেলাত সর্দ্দারেব নিকট হইতে তালপুব আমীবেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা ইংবাজ সিন্ধুরাজ্যের বাজধানী। সাগব সান্নিধ্য, উত্তম আবহাওয়া ও বাণিজ্য ব্যবসার সৌকর্য্যবশতঃ কবাচীব উত্তরোত্তব উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় সেখানে কতকগুলি শাকসব্জী ফলের বাগান দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চল সাধাবণতঃ লবণাক্ত মরুভূমি। করাচীর তিন ক্রোশ উত্তরে মগর (কুম্ভীর) পীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐ স্থানে কুঞ্জবন পরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরেব কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে কুম্ভকর্ণ-নিদ্রায় মগ্ন বড় বড় কুম্ভীব ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। খর্জ্জুববননিঃসৃত গন্ধকাক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি এবং উহাতে স্নান মহোপকারী বলিয়া গণিত। আমি ঐ জলে স্নান করিলাম, এমন গরম যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহাবো কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগরপীরে ছাগাদি উপহার দিয়া কুম্ভীররাজের পবিতোষ সাধন করে।

হিঙ্গুলাজ

এ অঞ্চলে অপর একটি তীর্থস্থান হিঙ্গুলাজ, ইহা হিন্দুতীর্থ। কবাচীর পশ্চিম সোনমিয়ানী বন্দরের অনতিদূরে এই তীর্থ অবস্থিত। হিঙ্গুলা কালীর নাম বিশেষ।

হালা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ইহার রাস্তা গিয়াছে ও অঘোর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূর্ণ। নদীর ক্রোড়ে কতকগুলি তরল কর্দ্দমকুণ্ড আছে তাহা 'রামকুণ্ড' বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিঙ্গুলাজ তীর্থযাত্রায় বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈন্যে গমনোদ্যোগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, পরে সন্ন্যাসীবেশে তথায় প্রবেশলাভ করেন। ভারতের উত্তরসীমায় হিঙ্গুলাজ ও দক্ষিণে রামেশ্বর—এই তীর্থদ্বয় প্রহরীর ন্যায় দুই দিক আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দ্বারকা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হিঙ্গুলাজ, হিঙ্গুলাজ হইতে লাহোরের জ্বালামুখী, জ্বালামুখীর পর কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র হইতে হরিদ্বার, হরিদ্বার হইতে গয়া কাশী, পরে মহানদী (জগন্নাথক্ষেত্র) গোদাবরী (নাসিক পঞ্চবটী) প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছিতে পারিলে ভারতের তীর্থমণ্ডল একপ্রকার প্রদক্ষিণ করা হইল।

পুরাকালে আলোর সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীক্‌গ্রন্থে এরূপ কোন নাম পাওয়া যায় না। "মুষিকানুস্" নামক এক রাজার সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বর্ণনা আছে, সম্ভবতঃ আলোর তাঁহার রাজধানী।

ব্রাহ্মণাবাদ

আর একটি প্রাচীন সহরের নাম ব্রাহ্মণাবাদ। কনিংহাম সাহেব ইহা "মুষিক" রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দুনগর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ইহার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড দুর্গের চিহ্নসকল অদ্যাপি বিদ্যমান। এই স্থান গ্রীক্ ইতিহাসে হর্ম্মতেলিয়া (ব্রাহ্মণস্থল) বলিয়া অভিহিত। এখানে সেকেন্দরের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হয়। আরব ইতিহাসেও ব্রাহ্মণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রোথিত নগর

হাইদ্রাবাদের কিয়ৎ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে একটি প্রোথিত নগরের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা বেলাসিস্ সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবৃত্তের চিরপরিচিত ব্রাহ্মণাবাদের ভগ্নাবশেষ। প্রবাদ এই যে এই নগর দুষ্ট রাজা দলুরায়ের পাপাচারে বিধ্বংস হয়। সিন্ধী ইতিহাসে তাহার বিবরণ এই :—

আলোর রাজধানী বিলুপ্ত হইলে পর দলুরায় ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া বাস করেন। ছোটা আমরাণী নামক তাঁহার এক ভ্রাতা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়েন। এই ছোটা সাহেব তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া মক্কা হইতে একজন

মুসলমানী বিবাহ করিয়া আনেন। ফাতিমা সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি দলুরায়ের হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ছোটা এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইলেন। এমন সময় দৈববাণী উঠিল "ব্রাহ্মণপুরী যায় যায়—সাবধান।" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম রাত্রে একজন বুড়ী চরকা কাটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহাতেই নগর রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় রাত্রে একজন কলুর সতর্কতায় নগর রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন সুযোগ পাইয়া পুরী একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন—তাহার একটি মাত্র দুর্গস্তম্ভ চিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট রহিল।

বেলাসিস্ সাহেব এই ভগ্নস্তূপ খনন ও বিস্তর অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে নগরী ভূকম্পন প্রভৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহসা এইরূপ প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেলাসিস্ সাহেবের খননে ভূমিকম্পই ব্রাহ্মণাবাদের প্রলয়ের কারণ বলিয়া সপ্রমাণ হয়। তিনি যে সকল নরকঙ্কাল দেখিতে পান তাহা প্রধানতঃ দ্বারমুখে —কতকগুলি ঘরের কোণে;—যেন লোকেরা কেহ প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত—কেহ বা ভয়ে জড়সড় হইয়া এককোণে বসিয়া মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ভগ্নস্তূপে চরকায় উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে—যেন স্ত্রীলোকটি চরকা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত। অগ্ন্যুৎপাতের কোন চিহ্ন নাই।

এই সকল ভগ্নরাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের বাসন, গজদন্ত, পিতল ও কাচের আভরণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা, ধান্যের জালা, সতরঞ্চী ও পাশা খেলার সামগ্রী, অশ্ব গো উষ্ট্র কুকুর কুক্কুট মানব-অস্থি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অস্থি সকল জীর্ণদশা প্রাপ্ত, অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত দৃষ্টে ব্রাহ্মণাবাদ এককালে ধনধান্যপূর্ণ জনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়।

এই শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন্ত নগর এক্ষণে কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহার প্রবল দুর্গের একটি মাত্র বুরুজ অবশিষ্ট। নদীতীরে এককালে যে সকল সুরম্য উদ্যান কানন নগরের শোভা সম্পাদন করিত এখন তাহা কণ্টকাবৃত বনজঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে স্রোতস্বতী আর নাই, তাহার প্রবাহ অন্যত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; চতুর্দ্দিক শুষ্ক নীরব মরুভূমি।*

* Cunningham's Ancient Geography of India.
The buried City of Brahmanabad by H. N. Birdwood I. C. S.

টাট্টা

টাট্টা মুসলমান আমলে দক্ষিণসিন্ধুর প্রধান সহর ছিল। এক সময় সিন্ধুনদী ইহার প্রাচীর দিয়া বহিয়া যাইত এবং যে বাণিজ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে সিন্ধু তাহা ইহারই দ্বারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী প্রায় তিন মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ১৫২২ সালে এই নগব নির্ম্মিত হয় ও ১৭৪২ সালে যখন নাদির সা তথায় পদার্পণ কবেন তখন সেখানে ৪০,০০০ ঘব বাড়া, ৬০০০ বণিক সৌদাগর ও ২০০০ অপর শিল্পী বাস কবে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাইদ্রাবাদ

হাইদ্রাবাদ টাট্টার উত্তরাধিকারী মধ্যসিন্ধুর রাজধানী। ইহা প্রাচীন হিন্দুনগর নীরণ-কোটের স্থান অধিকার কবিয়া আছে এবং ১৭৫৮ অব্দে গোলাম সা কাহ্লোরা ইহার পত্তন কবেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আমীরদের সাধের আবাস ছিল, নদী হইতে তাহাদের শিকার-বনে যাতায়াতের সুবিধা তাহার এক কাবণ। দুর্গের মধ্যে তাহাদের যে সমস্ত সুসজ্জিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে, মীর নসীব খাঁব প্রাসাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। নিজ্ সহরে কতকগুলি মাটির ঘর বাড়ী, দেখিবার মত ইমাবত অট্টালিকা কিছুই নাই। দুর্গই ইহার শোভন দৃশ্য, সিন্ধুশাখা ফুলেলী তাহার প্রাচীরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সহবের প্রান্তে কহ্লোরা ও তালপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধিমন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর। সহর হইতে নদী কয়েক মাইল দূব। সিন্ধুতীবে গিদুবন্দব, বন্দব পর্য্যন্ত এক সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ। এই সহর রেশম ও জরির কাপড়, সূক্ষ্ম মিনার কাজ ও অন্যপ্রকাব কারুকার্য্যেব জন্য সুবিখ্যাত।

উত্তর-সিন্ধু

উত্তর-সিন্ধু দক্ষিণভাগ হইতে অনেক তফাৎ। হাইদ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্র বায়ু সেবন করা যায় না; গ্রীষ্মকালে বায়ু বন্ধ হইয়া ঐ অঞ্চল উত্তাপকুণ্ডে পরিণত হয়। আট নয় মাসব্যাপী গ্রীষ্মকাল—বর্ষা নাই বলিলেই হয়—কখন একটু মেঘ কিম্বা দুচার ফোঁটা বৃষ্টি এইমাত্র। শীতকালে আবাব তেমনি ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মের যে প্রচণ্ড উত্তাপ সেই ঠাণ্ডায় তার ক্ষতিপূবণ হয়। মাঝে মাঝে মরুদেশের প্রবল বালুময় ঝড় উঠিয়া প্রকৃতিরাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলে। সিন্ধু নদী যেখান দিয়া গিয়াছে তাহার আশ পাশের ভূমি ফলবতী; নদী হইতে যতদূরে যাওয়া যায় ততই বালুময় মরুভূমি স্বীয় উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে।

হাইদ্রাবাদ

(১২০ পৃষ্ঠা)

উত্তর-সিন্ধুতে কতকগুলি নব্য ও প্রাচীন প্রখ্যাত সহর আছে। নবাব পশ্চিমে সেওয়ান, আরবদিগের সেউই-স্থান। নগরের মধ্যে লালসাবাজ নামক মুসলমান পীরের একটি সুন্দর মসজিদ আছে। লালসবাজ খোরাসান হইতে সমাগত সিন্ধুর একজন লোকমান্য পীর, ১২৭৪ সালে সেওয়ানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিমন্দির মুসলমানদের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র, বহুদূর হইতে যাত্রীরা সেখানে আসিয়া মিলিত হয়। অনেক ফকীর লালসার অনুচরবর্গের মধ্যে পরিগণিত। সেওয়ানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাহা সেকন্দরনির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সেওয়ান ছাড়াইয়া লাড়খানা—ইহা জলাময় শ্রীসম্পন্ন উর্ব্বরা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধুর পরপারে খয়েরপুর তালপুর রাজ্যের রাজধানী। খয়েরপুরের উত্তরে সক্কর, রক্কর ও রোড়ী—মুসলমান আমলের তিন প্রখ্যাত সহর। রক্কর সিন্ধুর ক্রোড়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ—পূর্ব্বে তাহা দেশের প্রবেশ-দ্বার বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশে মুসলমানদের বিদ্যালয় ও পীর পয়গম্বরদের বসতি ছিল, তাই অনেকানেক গোর মসজিদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সক্কর এইক্ষণকার ইংরাজ সেনানিবাস, এক বড় ষ্টেশন।

শিকারপুর

সক্করের উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর, ইহা জজ মাজিষ্ট্রেটের প্রধান মহল, আমার সুপরিচিত কর্ম্মস্থান। এখানকার সৌদাগরেরা বাণিজ্য কার্য্যে প্রসিদ্ধ, সমরকন্দ প্রভৃতি দূর দূর দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

সিন্ধু নদী

সিন্ধু নদীই সিন্ধু দেশের সর্ব্বস্ব। ইহা স্বীয় জন্মভূমি তিব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক প্রধান প্রধান নগরের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ প্রায় ১৭০০ মাইল বহিয়া গিয়া সহস্রধারে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। ইহা বসুন্ধরার ফলশস্যপ্রসবিনী, চলাচলের মার্গ-পরিরক্ষণী, বাণিজ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারিণী অশেষ গুণশালিনী সিন্ধু জননী। উত্তরের বর্ষাবারিধারা প্রবাহে ও হিমাচলের তুষার গলিয়া যে পূর সঞ্চিত হয় তাহা মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ, আগষ্টে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সপ্তম্বর হইতে হ্রাসোন্মুখ হয়। এই কয়েক মাসের মধ্যে নদী কোন কোন সময় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাপূরে ফুলিয়া উঠে ও স্রোতের বেগে বালুচর ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জলপ্লাবন কতকটা বর্ষার অভাব পূরণ করে। সিন্ধু নদী না থাকিলে সমুদায় দেশ লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হইত।

সিন্ধুকাহিনী

সিন্ধুদেশের কি দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষের মোহাড়ায় তার অধিষ্ঠান সুতরাং আততায়ীদের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপর গিয়াই পড়ে। প্রাচীনকাল হইতে পূর্ব্বাপর তাহার উপর দিয়া কত উৎপাত, কত ধাক্কাই গিয়াছে। প্রথম সেকন্দর বাদসার সিন্ধু আক্রমণ। পারস্যাধিপতি দরায়ুসকে ধনপ্রাণে বিনাশ করিয়া সেকন্দর সা সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া হিন্দুকুট পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও খাইবরের দুর্গমপথ অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অবশেষে তাঁহার রণমত্ত সৈন্যগণ সিন্ধুতীরস্থিত আটকে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আটকের আটক না মানিয়া মাসিডন্‌বীর সিন্ধু পার হইয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবে তক্ষশীলের প্ররোচনায় বীরশ্রেষ্ঠ পুরুরাজের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এস্থলে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আশ্চর্য্য এই যে, যে রণক্ষেত্রে গ্রীক ও হিন্দু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদলের সম্মিলন হইয়াছিল সেই স্থলেই দুই সহস্র বৎসরান্তে ইংরাজ ও শিখদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হয়। দুইবারই পঞ্জাবীদের পরাজয় কিন্তু সে পরাজয়ে শত্রুরাও তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। বন্দীকৃত পুরুরাজের সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার করিয়া সেকন্দর তাহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন। বিজয়ী গ্রীকরাজ জয়স্থলে নগরদ্বয় পত্তন করিয়া চেনাব ও রাবী নদী পার হইলেন। এই সময়ে মগধরাজের বিপুল কীর্ত্তি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ছয় লক্ষ পদাতিক ও সহস্র সহস্র অশ্ব-গজারোহী সেনা যে রাজার সৈন্যদল তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্রে জয়স্তম্ভ নিখাত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার লোভের অন্ত নাই কিন্তু বিধাতা বাম হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাংশুলভ্য ফলে উদ্বাহু বামনের ন্যায় তার দশা হইল। বেয়াস (বিপাশা) নদী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদল কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চায় না। সম্রাট তাহাদের বশ করিতে কত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সকল সাধ্য সাধনা নিষ্ফল,—ভর্ৎসনা গঞ্জনা কাকুতি মিনতি কিছুতেই কিছু হইল না, সুতরাং এখানে রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে অগত্যা ফিরিতে হইল।

পুরুরাজের হস্তে সপ্তরাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দর তাঁর সৈন্যসামন্ত লইয়া ঝীলমে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রণতরী সজ্জিত হইল। অনন্তর তিনি সৈন্যদের দুই দলে বিভক্ত করিলেন। সেনাপতির অধীনে একদল পৃথক্ পাঠাইলেন আর আপনি একদল সৈন্যসহ পঞ্জাবের নদী বাহিয়া সিন্ধু নদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। এই যাত্রার কতিপয় মাস সিন্ধু দেশ সেকন্দরের বীরদর্পে কম্পিত ও রাজ্যে তুমুল বিপ্লব সমুত্থিত

সেওয়ান দুর্গ—সিন্ধুদেশ

পৃষ্ঠ
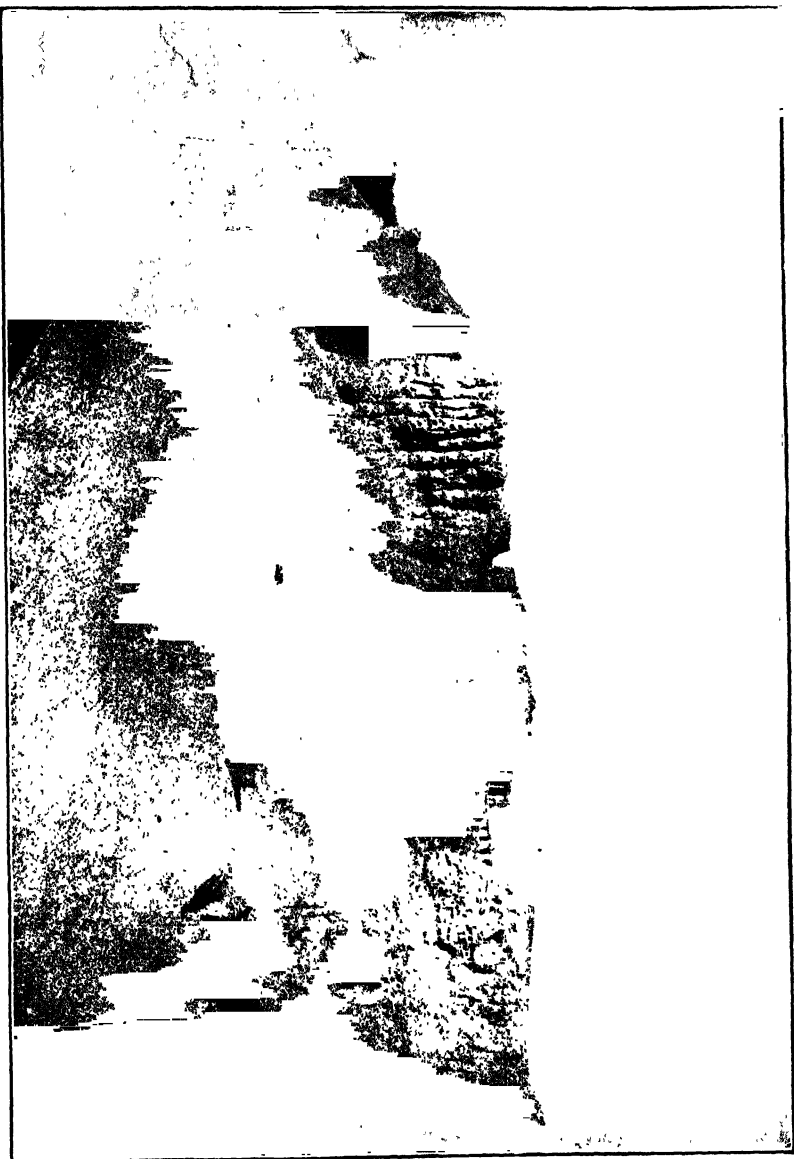
হয়। সিন্ধুপ্রবেশপূর্ব্বে মালীদের যুদ্ধে হারাইয়া মুলতান অধিকার করেন এবং আরো দক্ষিণে পঞ্চনদীর সঙ্গমে এক নগর পত্তন করিয়া যান।

সেকন্দর বাদসাহের সিন্ধু অক্রমণ কথা কোন হিন্দুলেখ্যে নাই—যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। গ্রীক্‌রাজ যে যে স্থানে যুদ্ধে জয়লাভ করেন সেখানে নগর দুর্গ প্রভৃতি কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়া যান, গ্রীক্ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা। কিন্তু এক্ষণে এদেশে সেই কীর্ত্তিকলাপের কোন নামগন্ধ নাই—কোথাও যদি তাহার চিহ্ন থাকে তাহা কেবলি অনুমান ও কল্পনা।

সেকন্দর বাদসার পর মুসলমানদের সিন্ধু আক্রমণ-পালা। সেকন্দর চলিয়া যাইবার পর সিন্ধু দেশ অনেককাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন রাজপুতবংশীয় পঞ্চরাহী সিন্ধুদেশে ১৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। আলোর তাঁহাদের রাজধানী ও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাসকল সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে রাহী সাহসীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্রসন্ততি ছিল না। রাজ্ঞীর এক ব্রাহ্মণ উপপতি ছিল। তাহার নাম কচ। কথিত আছে যে অন্যান্য অধিকারীদিগকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাণী স্বীয় প্রণয়ী কচ্ছের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। অবশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলে বলে কৌশলে পরাজয় করিয়া কচ্ছরাজা অন্যায়লব্ধ সিংহাসনে সুস্থির হইয়া বসিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ডাহির সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ডাহিরের রাজত্বকালে সিন্ধু দেশ ধর্ম্মান্ধ যবনদল কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হয়। আরবেরা প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদের একটি জাহাজ দেওয়াল বন্দরে ধৃত হওয়াতে রাজা ডাহিরের নিকট তাহা প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করা হয়। রাজা সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এই সামান্য কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত।

মহম্মদ কাশিম

৭১১ খৃষ্টাব্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের বালক মাত্র) একদল সৈন্য লইয়া দেওয়াল বন্দরে উপনীত হন। বন্দরের প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত একটি বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় ছিল, অন্তরে ব্রাহ্মণ বসতি ও রাজপুত সৈন্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। মন্দিরের একটি স্তম্ভের উপর এক নিশান উড়িতেছিল। কাশিম তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণে তাহা ধরাশায়ী করিলেন। পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মনে এমনি ভয়ের সঞ্চার হইল যে, তাহাদেরও যবন হস্তে পতনের

আর বিলম্ব রহিল না। মন্দির অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বলপূর্ব্বক মুসলমান করা, কাশিমের এই প্রথম কাজ। তাহাদের অসম্মতি দেখিয়া কাশিম এমনি ক্রুদ্ধ হইলেন যে, বয়স্ক পুরুষদের সমূলে নিপাত, বালক ও স্ত্রীলোকদের দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধনের আদেশ জারী হইল।

মন্দির পতনের পর বন্দর শীঘ্রই যবনদের হস্তগত হইল ও তদনন্তর কাশিম নিরণকোট (হাইদ্রাবাদ) সেওয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

অনন্তর ডাহিরের রাজধানী আলোরের নিকট এক মহা যুদ্ধ হয়। রাজা স্বয়ং ৫০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানী সংরক্ষণার্থে অগ্রসর হইলেন। কাশিম পারস্য হইতে নবাগত ২০০০ দুই হাজার অশ্বারোহী ও পূর্ব্বকার অবশিষ্ট বল লইয়া হিন্দুসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা যে গজপৃষ্ঠে অরূঢ় ছিলেন, দৈবঘটনায় এক অগ্নিগোলা তাহার উপর পড়িয়া হুলস্থুল বাধাইয়া দিল, অবাধ্য হস্তী রাজাকে লইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। এই ঘটনায় যুদ্ধের পরিণাম সূচিত হইল। রাজা ও আরব সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

বীরাঙ্গনা রাজমহিষী

এই যুদ্ধে রাজ্ঞীর অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্রিত করিয়া সেই বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণাবাদ রক্ষার একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, যতক্ষণ পারিলেন শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, পরিশেষে অন্নাভাবে তাঁহার সৈন্যদের প্রাণরক্ষা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। পরে তাহারা রাজপুত বীরোচিত 'জোহর' ব্রতে ব্রতী হইয়া স্ত্রীপুত্রদিগকে জলন্ত চিতানলে আহুতি প্রদান করিল—পুরুষেরা নগরদ্বার খুলিয়া তরবারহস্তে অরিদলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ডাহিরের রাজ্য মুসলমানদের পদতলন্যস্ত হইল। মুলতানে যবনপতাকা উড্ডীন হইল।

ক্রমে হিন্দু ও আরবদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সূত্রপাত হইল। হিন্দুশ্রেষ্ঠীরা যবনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু এই সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। প্রশ্নটী এই যে হিন্দু দেবালয় সকল অধিকৃত ও নষ্ট হইয়াছে, ব্রাহ্মণদের দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, করদ রাজ্যে কি এই সকল নষ্টাধিকার প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে? তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? কাশিমের মনে এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রভু সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সেখান হইতে হিন্দুদের প্রীতিজনক উত্তর পাওয়া গেল। তাহা এই যে, যে সকল হিন্দু

করদানে প্রতিশ্রুত তাহারা করদ রাজ্যের প্রজার ন্যায় সমস্ত অধিকার পাইবার যোগ্য, তাহারা দেবালয় পুনঃস্থাপন করিয়া পূজার্চ্চনা করুক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, অপহৃত ভূমিসম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যর্পণ করা হউক—হিন্দুরাজার আমলে তাহাদের যাহা ন্যায্য পাওনা তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা বিধেয় নহে।

এ পর্য্যন্ত কাশিমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি জয়লাভে স্ফীত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাহার মাথায় বজ্রপাত হইল। ডাহিরের পরাজয় ও পতনের পর তাহার পরমাসুন্দরী কন্যাদ্বয় যবনদের হস্তে পতিত হয়। কাশিম রাজকুমারীদিগকে দামাস্কাসের কালিফের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। কালিফের সম্মুখে আনীত হইলে জ্যেষ্ঠা যিনি তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিবেদন করিলেন, "আমি মহারাজের যোগ্য নই—কাশিম আমাকে বিদায় করিবার পূর্ব্বে আমার প্রতি ব্যভিচার করিয়াছে।" কালিফ রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় আদেশ দিয়া পাঠাইলেন, "কাশিমকে কাচা চর্ম্মথলিতে পুরিয়া মুখ সেলাই করিয়া এখনি আমার সম্মুখে হাজির কর।" কালিফের আদেশ সম্পন্ন হইলে পর রাজকুমারীকে ডাকিয়া আনিয়া কাশিমের মৃতদেহ দেখাইলেন। রাজকুমারী আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! কাশিম বাস্তবিক নিরপরাধ—আমার পিতৃহত্যা ও কুলকলঙ্কের এই প্রতিশোধ!"

কাশিমের সিন্ধু আক্রমণ হইতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব, অনেকানেক রাজবংশের উত্থান পতন হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে এ পর্য্যন্ত যত শতাব্দী গত হইয়াছে প্রায় ততগুলি রাজবংশ সিন্ধুরাজ্যে অবতীর্ণ। ৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর ঐ দেশ মুলতান ও মনসুরা এই দুই মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। মুলতান উত্তর হইতে আলোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মনসুরা সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণাবাদের নাম ধাম অধিকার করিয়া সমুত্থিত হয়, আলোর হইতে দক্ষিণ সাগর পর্য্যন্ত তাহার সীমা। কালিফ-প্রতিনিধিগণ প্রায় ৩০০ বৎসর সিন্ধু দেশ শাসন করেন, তদনন্তর যবনাধিপত্য ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে সুমরা ও সুম্মারাজপুতগণ কয়েক শত বৎসর উত্তরোত্তর রাজ্য করেন, তন্মধ্যে সুম্মাবংশীয় রাজগণ অনেকে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত। সম্রাট আকবরের সময় সিন্ধুদেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৪০ অব্দে পারস্যরাজ নাদির সা হিন্দুস্থান আক্রমণানন্তর সিন্ধু নদীর পশ্চিমে কতক প্রদেশ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে আত্মসাৎ করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে পাণিপত-যুদ্ধবিজেতা আহমদ খাঁ দুরাণী সিন্ধু দেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে কতককাল আফগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিশ্রিত দেখা যায়। এইরূপ

রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে ব্রিটিষ ধূমকেতু অকস্মাৎ উদয় হইয়া সকলি উলট্ পালট্ করিয়া দিল।

ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে দুই রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন তাহা কহ্লোরা ও তালপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কহ্লোরা রাজবংশের পত্তন ও প্রায় অশীতি বৎসর ঐ বংশের রাজত্বকাল। ১৭৮০ কিম্বা তার দুই এক বৎসর পরে তালপুরবংশীয় বলোচ আমীরগণ কহ্লোরাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইংরাজদের দেশাধিকার কালে এই আমীরদের আধিপত্য ছিল। তালপুর বংশের মূলপুরুষ ফতে আলি খাঁ, তিনি বংশের গৌরববর্দ্ধন ও কলহবিদ্রোহ নিবারণ আশয়ে স্বীয় ভ্রাতৃগণসহ একত্রে রাজ্যশাসনের সূত্রপাত করেন, তাঁহারা চার ভাইয়ে মিলিয়া এক মতে এক চিত্তে এমনি সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতেন যে 'চার ইয়ার' বলিয়া তাঁহাদের নাম রাষ্ট্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতন্ত্র তিন শাখার সৃষ্টি হইল—হাইদ্রাবাদ, মীরপুর, খয়েরপুর—তিন আমীরের তিন রাজ্য-বিভাগ।

আসিয়ার শান্তি

আফগান যুদ্ধাবসানের পর লর্ড এলেনবরা সিমলা হইতে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন যে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট রাজ্যসীমায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এইক্ষণ অবধি শান্তিস্থাপন ও রাজ্যরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইবেন। এই অভিপ্রায়ে "আসিয়ার শান্তি" চিহ্নিত এক মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই সিন্ধু দেশ ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত বলিয়া দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে সিন্ধু দেশ তখন তিন রাজ্যে বিভক্ত—উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যসিন্ধু; প্রত্যেক রাজ্যের এক একজন আমীর অধিস্বামী।

১৮৩৯ সালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও আমীরদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা সিন্ধু দেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি যদিও আমীরদের মনঃপূত হয় নাই কিন্তু কি করেন, দায়ে পড়িয়া ব্রিটিষ যূপে গ্রীবা অবনত করিতে হইল। আফগান যুদ্ধের তিন বৎসর আমীরদের আচরণে দোষ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের মধ্য হইতে ব্রিটিষ সৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা- জাহাজে খোরাক যোগান কিছুতেই তাঁহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। General Nott কাবুল প্রয়াণ কালে সিন্ধু হইতে তিন সহস্র উটের সাহায্য লাভ করেন। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের পরাজয় দেখিয়া দাঁত দেখাইতে সাহস করিয়াছিলেন। এই ছুতা ধরিয়া তখনকার এজেণ্ট Major Outram আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সন্ধিপত্রের

পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। গবর্ণর জেনারেল আদেশ করিলেন যে, যদি কোন আমীর ব্রিটিষ-রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক।

Sir Charles Napier.

৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৭২ সালে স্যর চার্লস্ নেপিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতারূপে সিন্ধু দেশে প্রেরিত হন। রাজদ্রোহ অভিযোগ বিচারের ভার তাঁহার হস্তে ও তাঁহার প্রতি আদেশ এই যে, দোষের স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমীরদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা হয়। সে যাহা হউক, তিনি বিচারে তাহাদিগকে দোষ সাব্যস্ত করিলেন ও বলিলেন ১৮৩৯ সালের সন্ধি অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই। আমীরগণ সন্ধিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী।

পূর্ব্বকার সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে এক নূতন সন্ধিলেখ্য প্রস্তুত হইবার কথা। মেজর্ আউট্রাম্ তাহার এক নমুনা তৈয়ার করিয়া লর্ড এলেন্‌বরার কাছে পাঠান। তাহা গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে ১২ই নবেম্বরে নেপিয়রের হস্তে ফিরিয়া আসে। এই সন্ধি স্বাক্ষর করাইবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিষ সেনাপতি আমীরদিগকে খয়েরপুরে মিলিত হইতে আদেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ আদেশ মতে উপস্থিত না হওয়াতে হাইদ্রাবাদ সমিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইতিমধ্যে সেনাপতি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। যখন নূতন সন্ধিপত্রের নমুনা গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে নেপিয়রের হস্তে আইসে, তখন আউট্রাম দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক হয় নাই—তাহার কতকগুলি কঠোর অনুশাসন সংশোধন করা আবশ্যক নতুবা বেচারা আমীরদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। সেনাপতি এই নমুনা আপনার কাছে প্রায় দেড় মাস কাল রাখিয়া দেন ও পরিশেষে যখন ভ্রম সংশোধনের অনুজ্ঞা আইসে তখন যতদূর অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন ফল হইল না। সন্ধিপত্রে আমীরদের নিকট হইতে যে সকল ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লইবার কথা ছিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত করলীকৃত হইল --আর বিলম্ব সহিল না। ওদিকে যে বলোচ সর্দ্দারগণ ঐ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী, তাহাদের মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দুর্ঘটনার মূল আমীরদের গৃহবিচ্ছেদ। আমারদের রাইস তখন ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ মীর রোস্তম। রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ আলি মোরাদ ইংরাজদের আগমনে নিজের কাজ গোছাইবার অবসর পাইলেন এবং স্বার্থসাধন মানসে ব্রিটিষ সেনাপতির তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। সেনাপতিকে

রোস্তমের উপর চটাইবার মতলবে দাদার নামে নানা মিথ্যা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। আলি মোরাদের প্রবোচনায় সেনাপতি মীর রোস্তমকে এক কটুকাটব্যপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে আলি তাহার ভ্রাতার স্বাক্ষরিত এক পত্র সেনাপতিকে দেখান, তাহাতে জানানো হয় যেন রোস্তম স্বেচ্ছায় তাহার পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া তাহার দেশ দুর্গ সৈন্য সামন্ত সকল সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত। নেপিয়র বলিয়া পাঠাইলেন, মীর রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে যথাকর্তব্য বিধান করিবেন। এইরূপ হইলে আলি মোরাদের সব জুয়াচ্চুরি ধরা পড়ে, -এই সাক্ষাৎকার নিবারণ উদ্দেশে তিনি মধ্যরাত্রে তাহার ভ্রাতাকে উঠাইয়া বলিলেন, "এই বেলা পালাও, নহিলে জেনারেল সাহেব সকালে তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসিবেন।" বৃদ্ধ মীর শশব্যস্ত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করেন। অমনি নেপিয়র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, মীর রোস্তম ব্রিটিষ-রাজের অপমান করিয়াছেন। আলি মোরাদকে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মীর রোস্তমের সমূহ বিপদ উপস্থিত। তিনি সেনাপতির নিকট আপন মন্ত্রীকে দিয়া বলিয়া পাঠান যে, আলি মোরাদ তাহাকে ভুল বুঝাইয়া পত্র স্বাক্ষর করিয়া লন -তাহারই প্ররোচনায় তিনি পলায়ন করিয়াছেন। নেপিয়র ইহার এক তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন এবং অরণ্যে গিয়াও ব্রিটিষ হস্ত এড়াইবার উপায় নাই ইহা জানাইয়া দিবার জন্য একদল সৈন্যকে পলাতক মীরের পশ্চাৎ ইমামগড়ের কেল্লার উপর হল্লা করিতে পাঠান। ইমামগড়ের কেল্লা নেপিয়রের মতে সিন্ধুর Gibralter—তাহা দখল করিতে পারিলে ব্রিটিষ গৌরবের সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদে উড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য Duke of Wellington পর্য্যন্ত তাহার যুদ্ধকৌশল প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু রণ-কৌশল যাহাই থাকুক এই কার্য্যে তাহার ন্যায়পরতা প্রকাশ পায় না, কেননা মীর মহম্মদ খাঁ যিনি দুর্গের অধিপতি তিনি যখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন অপরাধ করেন নাই, তখন তাহার উপর এ অত্যাচার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পলায়নে যদি মীর রোস্তমের দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁর রাজ্যত্যাগ কি সে দোষের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নহে?

যাহা হউক, মীর রোস্তমকে রাজ্যচ্যুত ও আমীরদের ভূমিসম্পত্তি হস্তগত করিয়া ব্রিটিষ সেনাপতি আমীরদিগকে প্রথমে খয়েরপুর, পরে হাইদ্রাবাদে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন।

মিয়ানির ব্রিটিষ রণক্ষেত্রের স্মৃতিচিহ্ন (১২৯ পৃষ্ঠা)

হাইদ্রাবাদ সমিতি

হাইদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত। তাঁহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—যে সকল পত্রে তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা দেখিতে চাহিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁহারা নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন কিন্তু মেজর আউট্রামকে স্পষ্ট বলিলেন যে, ব্রিটিষদের আচরণে, বিশেষত মীরদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে বলোচ সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তাহারা হঠাৎ যদি কোন বিদ্রোহাচরণ করে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নন। এই অবসরে সেনাপতি নেপিয়র স্বীয় সৈন্যসামন্ত লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বাধিবার উপক্রম হইল। সন্ধি স্বাক্ষরের পর আউট্রাম যখন কেল্লা হইতে বাহির হয়েন তখন লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রিটিষদের উপর ধিক্কার ও গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল। আমীরেরা অনেক কষ্টে মেজরকে বাটী পৌঁছিয়া না দিলে তাঁহার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইত। ইহার তিন দিন পরে একদল বলোচ সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করে—মেজর অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রবল শত্রু বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাকরতঃ নদীতে সেনারক্ষিত ষ্টিমারে উঠিয়া নিস্তার পান।

মিয়ানির যুদ্ধ

এখন যুদ্ধের সমূহ কারণ উপস্থিত—ইস্পার কি উস্পার যুদ্ধে যাহা হয় স্থির হইবে। নেপিয়র রাজধানীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া বলোচ সৈন্য দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাহারা মিয়ানি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের সংখ্যা ২০,০০০। নেপিয়র ২৭০০ সেনা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। বলোচেরা বীরোচিত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ইউরোপীয়দের শিক্ষিত বল ও মারাত্মক শস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের বলবিক্রম কতক্ষণ চলিবে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল—বলোচেরা তাহাদের তাম্বু অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিষদের হস্তে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। চার্লস্ নেপিয়র সৈন্যদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া হাইদ্রাবাদ-দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক আমীরদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পর ডব্বায় আর এক যুদ্ধ হয়—স্বাধীনতা রক্ষার সেই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়া কষ্টস্রষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন—সিন্ধু দেশ ব্রিটিষ-রাজ্যের লোহিত রেখাপাতের অন্তর্ভূত হইল। *

* Marshman's History of India.

এই ত ইংরাজদের সিন্দুবিজয়-কাহিনী। স্পষ্ট দেখা যায় যে স্যর চার্লস নেপিয়র পূর্ব্ব হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কার্য্যারম্ভ করেন—আমীরদের সঙ্গে তাঁহার যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাঘ্রের বিবাদের অনুরূপ। তাঁহার নিজ হস্তাক্ষর হইতেই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমীরদের দমন করিবাব জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য দুর্ব্বল সে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে, তাহার উপায়ান্তর নাই।"

তাঁহার নীতিশাস্ত্রে সৎকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে অসৎ উপায় যোজনা দোষের নহে। কথিত আছে যে সিন্ধুবিজয়ের পর তিনি দেশে তাবযোগে দ্ব্যর্থভাবে সংবাদ পাঠান "I have Sind" (Sinned) এই তিনটি বাক্যে সিন্ধুবিজয়-কাহিনী অভিব্যক্ত।

সিন্ধু দেশ ব্রিটিষ পরিবারের নবোঢ়া বধূ, এদেশ ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত হবাব পর এখনো শতাব্দী অতিবাহিত হয়নি। ম্যাপে দেখলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মনে হয় না, মনে হয় যেন পঞ্জাবেরই অঙ্গ। মধ্যে মধ্যে সিন্ধু দেশ পঞ্জাবে যোগ করবারও প্রস্তাবও শোনা যায় কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদেব তা ইচ্ছা নয়—তারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে আছে। এদেশের ভাষা সিন্ধি; গুজরাটীর সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। সংস্কৃতই এ সকল ভাষার আদ্য জননী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সিন্ধি লিখনপদ্ধতি উর্দ্দু, সংস্কৃতমূলক নয়। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হতে পারত। সিন্ধি-ভাষায় যতগুলি বর্ণ আছে তা নাগরীতে সহজে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। যে দুএকটা বর্ণের একটু আলাদা উচ্চারণ তাব মাথায় কোনরূপ রেখা বা বিন্দু দেওয়া; আমরা বাঙ্গলায় যেমন বিন্দু দিয়ে 'ড' ও 'ড়'র প্রভেদ নির্দ্দেশ কবি সেইরূপ কোন রকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার কবলেই হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তবে কেন নাগরীর বদলে উর্দ্দু বর্ণমালা চলিত হল? তার উত্তর এই—সরকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিন্ধু দেশ অধিকার করেন, তখন সেখানে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না। বণিকদের হিসাবপত্রে একপ্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত হত, তাছাড়া বর্ণাক্ষবের প্রচার ছিল না। যখন ব্রিটিষ আদালত সকল স্থাপিত হল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা আর তার সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। এ সঙ্কটে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপুরুষেরা পারস্য বর্ণমালা গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন। তাঁদের আদেশক্রমে আদালতে উর্দ্দু লিপির ব্যবহার আরম্ভ হয়, ক্রমে তাই আদালত হতে অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হল। সিন্ধি গ্রন্থাবলী এক্ষণে উর্দ্দু অক্ষরেই লিখিত হয়ে থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যত দেশ দেখেছি তার মধ্যে সিন্ধু দেশ আমার চক্ষে বিশেষ নূতন ঠেকেছিল। অন্যান্য প্রদেশ হতে এখানে প্রকৃতির মুখচ্ছবি, লোকের রীতি চরিত্র অনেক তফাৎ। প্রথমতঃ বর্ষার অভাব। এই খটখটে শুষ্কভাবের দরুণ সিন্ধের বহির্দৃশ্য নূতন প্রকার, ওরূপ সুবিস্তীর্ণ বালুময় মরুপ্রদেশ বোম্বায়ের অন্যত্র দেখা যায় না। নদী নালা খালের জল হতেই সিন্ধের প্রায় সমস্ত কৃতিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইন্দ্রদেব বারিবর্ষণ করেন না, পৃথিবীই আপনার স্তন্যনীর দিয়ে জলের অভাব পূরণ করেন।

সিন্ধু দেশের আবহাওয়ায় শীতোষ্ণের আতিশয্য ভোগ করা যায়, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে রাত্রে ছাতের উপর কিম্বা বাইরে খোলা জায়গায় শয়ন ভিন্ন গতি নেই। জল ছিটিয়ে বিছানায় প্রবেশ করতে হয়। শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা—ঘরের ভিতরেও অগ্নিসেবন ভিন্ন চলে না। সিন্ধু দেশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধু নদী আছে তাই রক্ষা, নইলে ও-দেশ মানুষের বাসযোগ্য হত কিনা সন্দেহ। আমরা যখন হায়দ্রাবাদে ছিলাম তখন সিন্ধু নদীর তীর আমাদের একমাত্র বেড়াবার স্থান ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একটি আরামের স্থান। সন্ধ্যাবেলা নদীতীরে গিয়া বায়ুসেবন আমাদের নিত্য নিয়মিত কাজের মধ্যে ছিল। নদীতীর পর্য্যন্ত বেশ একটি প্রশস্ত ছায়াপথ—দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করে ব্যাড়ান যেত। সিন্ধু নদী অনেকটা গঙ্গার মত প্রশস্ত, দেখলে আমার দেশ মনে পড়ত, মনে হত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভেসে ব্যাড়াচ্ছি। সিন্ধু নদীতে পাল্লা বলে একরকম মাছ পাওয়া যায়—আমাদের যা ইলিস। জেলেরা কলসী ভাসিয়ে দিয়ে মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলে প্রসিদ্ধ। আমাদের এক সিন্ধি চাকর ছিল, তার মুখে এক ছড়া শুনতেম মনে আছে—

পল্লা মচ্ছী খানা,
সিন্ধ মুলুক ছোড়কে নহী যানা।

নদীর ও খালের উপকূল ভিন্ন অন্যত্রে গাছপালা প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দ্দিকে বালুময় ক্ষেত্র ধূ ধূ করছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়েই গতিবিধি। এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। কলের জল, তেলের ঘানি উট দিয়েই চালিত হয়। উটে গাড়ীটানার কাজও করে—অনেক দূর পাল্লা যেতে হলে আমরা কখন কখন আমাদের বয়েল গাড়ীতে উট জুড়ে দিতাম। উটই মরুসাগরের জাহাজ। সমুদ্রপথে যেমন Sea-sickness, যার অনভ্যাস উষ্ট্রবাহনের ঝাঁকানিতেও তার তেমনি দুর্দ্দশা—দুধের

রক্ত দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুৎ, অভ্যস্ত সোওয়ার, এই তিন একত্র হলে উটে চড়বার আরাম আছে, নইলে নয়। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিতা সহজে মনে হয় না। তা এই যে বালির উপর যেমন সহজে পায়ের দাগ বসে তেমনি চোর ধরবার এ এক সহজ উপায়। আমি যখন শিকারপুরে কাজ করতাম তখন গরুচুরি মকদ্দমা রাশি রাশি আমার কাছে আসত। পশুহরণ সিন্ধিদের এক রোগ। এমন দিন যেত না যে ঘোড়া গরু উঠ মেষ মহিষ প্রভৃতি লুটের মকদ্দমা উপস্থিত না হত। কিন্তু তাও বলি 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর'। গ্রামে গ্রামে যে সকল চৌকিদার আছে তাদের নাম 'পগী', নাম থেকেই তাদের পরিচয়, পদচিহ্ন ধরে চোরামাল বার করা তাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রামে একটা উট চুরি গিয়েছে। অমনি সেই গাঁয়ের পগা অপহৃত উটের পদচিহ্ন দেখতে দেখতে চোরের সন্ধানে বেরুলো। সেই পদচিহ্ন সে যদি তার সমীপবর্ত্তী গ্রামে দেখিয়ে দিতে পারে তাহলেই সে তার দায়িত্ব হতে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি পড়ল। এই গ্রামের লোকেরা আপনাদের পগী সঙ্গে করে সেই চিহ্ন ধরে বাহির হয়। এইরূপে চোরের আড্ডায় গিয়ে চোরামাল ধরতে পারলে তাদের পরিশ্রম সার্থক। অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে। পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে প্রায় তারা শূন্য হাতে ফিরে আসে না। তাদের দক্ষতার প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া। মাল ধরা না পড়লে শুধু তাদের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। অনেক সময় মিথ্যা পদচিহ্ন দেখিয়ে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের উপর অপরাধ চাপাবার প্রয়াস পায় কিন্তু বিজ্ঞ বিচারপতির কাছে ওরূপ প্রযত্ন সফল হয় না।

শিকার

সিন্ধিরা অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। শিকারপুরে থাকতে মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার শিকারের সঙ্গী জুটত। একবার আমরা দলবলে সঞ্চর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শিকার করতে গিয়েছিলেম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাখালী পাওয়া যেত, আমরা বোটের উপর হতে পাখী শিকার করতেম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চকাচকির ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়ি। সংস্কৃত কাব্যে চক্রবাক চক্রবাকীর কথা পড়ে তাদের সঙ্গে এমনি সখ্যবন্ধন হয়ে গেছে যে সেই ঝাঁকের মধ্যে গুলি চালাতে আমার হাত উঠল না। সে দেবো পাদের মধ্যে গুলি চালাতে গিয়ে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করতে লাগল, আমিও শিকারে ক্ষান্ত দিলাম। সে যা হোক্, আমার ভারি দেখতে

জলতোলা যন্ত্র — সিন্ধুদেশ

(১৩৪ পৃষ্ঠা)
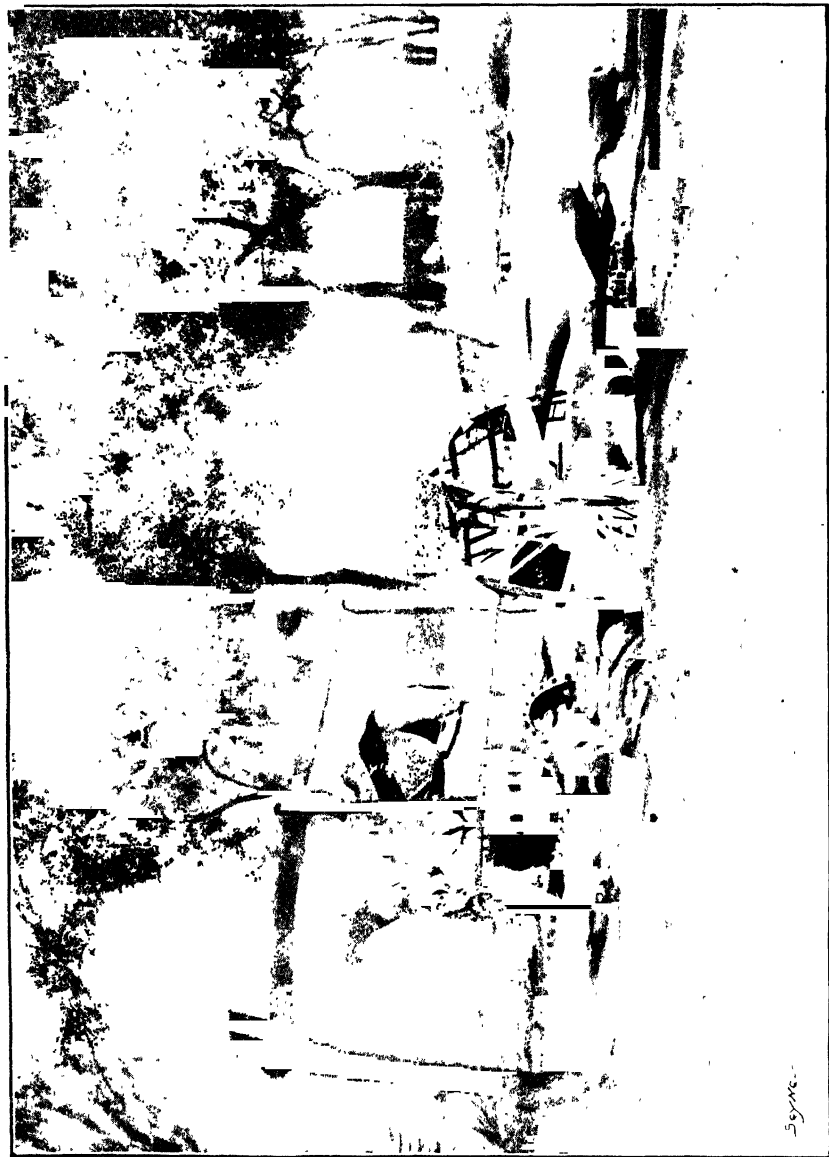
ইচ্ছা করে সংস্কৃত কাব্যের চকাচকির বিচ্ছেদ বর্ণনা কদ্দূর সত্য; তা বাস্তবিক ঘটনা কিম্বা কবির কল্পনামাত্র। সত্যিই কি বিধাতার এমনি কঠোর নির্ব্বন্ধ যে সন্ধ্যা হলেই চকাচকির ছাড়াছাড়ি হবে। এই পাখীদের সম্বন্ধে হিন্দিতে একটি কথা আছে মনে পড়ল। সমস্ত দিন তারা দুটিতে এক সঙ্গে চরে বেড়ায়---অন্ধকার হলেই বিযুক্ত হয়ে পড়ে। এ-পারে চখা ও-পারে চখী গিয়ে বসে। ওরা পরস্পর ডাকাডাকি করে তবু এ ওর কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না।

চকা—চক্কী মই আঁউ?
চকী—নহি নহি চক্কা
চকী—চক্কা মই আঁউ?
চকা—নহি নহি চক্কী

ইংরাজ-রাজের পূর্ব্বাধিকারী আমীরেরা বড়ই শিকারভক্ত ছিলেন। তাঁদের হাতে রাজ্য থাকলে এতদিনে সিন্ধুর সমস্ত প্রদেশ শিকার গাএ পরিণত হত। কথিত আছে তাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে কেহ রক্ষিত বনের একটা বরাহ বধ করলে তার প্রাণদণ্ড হত। এখন আর সেকাল নাই। আমীরদের হাতে সে ক্ষমতা নেই। আমীরদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের কাজ করছেন, কেহ বা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করেছেন। একজন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন—আমি তাঁর সঙ্গে কখন কখন শিকারে যেতাম। তিনি শিকারে বিলক্ষণ মজবুত, উড়ন্ত পাখী তাঁর গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হত। এই মীর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমায় একবার তিনি এক কাণ্ড করে বসেছিলেন। মকদ্দমা সেসনে কমিট হলে যে সকল জিনিষ নথীর সঙ্গে প্রমাণস্বরূপ পাঠাতে হয়, যা চলিত ভাষায় 'মুদ্দামাল' বলে, তার মধ্যে বুদ্ধিমান ম্যাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করে কাটা মুণ্ডটা সেসন কোর্টে পাঠিয়ে দেন। তা দেখে সেসন জজ ক্রোধান্ধ হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতিবুদ্ধির কাজ করে মীরসাহেব ভারি বিপদে পড়েছিলেন।

জাতি বৃত্তান্ত

সিন্ধুবাসী অধিকাংশ লোকই মুসলমান। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণে গঠিত। তাহারা আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপানে পরাঙ্মুখ নহে। মুসলমানদের মধ্যে কতক আদিম নিবাসী আসল সিন্ধী, কতক বা আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। আফগান বা পাঠান হাইদ্রাবাদ ও উত্তর সিন্ধে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকে বংশাদিক্রমে সিন্ধুতে এখন বাস

করছে ও অগাধ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী। দেখতে ইহারা বলিষ্ঠ, সুগঠন ও সুশ্রী, আসল সিন্ধী হতে ইহাদের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে।

হিন্দুরা সামান্যত ব্রাহ্মণ, বণিক ও শূদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের পোকর্ণ ও সারস্বত দুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ-ভক্ত বৈষ্ণবপন্থী। ইহারা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

সারস্বত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ প্রায় দুই শত বৎসর হতে সিন্ধু দেশে এসে বাস করছে। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহারা বোম্বায়ের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য। মৎস্য মাংস ভক্ষণ ইহাদের নিষিদ্ধ নহে।

বণিক জাতির মধ্যে লোহানা ও ভাটিয়া, এই দুই শাখা অগ্রগণ্য। মূলতানের লোহানপুর ও লোহানা বণিকদের মূলনিবাস। ঐ স্থান হইতেই তারা জাতীয় নাম গ্রহণ করেছে। তারা বলোচিস্থান আফগানিস্থান প্রভৃতি দূর দেশে ব্যবসা-সূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্লেচ্ছদেশে গমন করলে লোহানা হিন্দুরা জাতিভ্রষ্ট হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় লোহানা বণিয়াদের উদার বুদ্ধি প্রশংসনীয়।

লোহানাগণ ব্যবসা অনুসারে আমিল ও বণিক (বনিয়া) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা শ্মশ্রুমুণ্ডন, শিখারক্ষণ ও হিন্দুদের মত পাগড়ী পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমিলদের চালচলন কতকটা ভিন্ন।

আমিল

আমিলেরা সিন্ধী হিন্দুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজত্বকালে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাজকার্য্যে, বিশেষতঃ হিসাবপত্রের কাজে মুসলমান রাজাদের হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত চলিত না। আমিলেরা আমারদের মন যুগিয়ে চাকরি আরম্ভ করে ও ক্রমে নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির চাতুর্য্য প্রভাবে জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লয়। অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় আমিলেরা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী। মুসলমানদের সংসর্গে ও মুসলমান প্রভুদের অনুরোধে তাহারা মুসলমানদের মত বেশভূষা, পাগড়ী ও শ্মশ্রু-ধারণ করে—কপালে তিলক এইমাত্র প্রভেদ। পান আহারে তাহারা অনেকটা শাক্ত ধরণের লোক, মদ্য মাংসে অরুচি নাই। আমি যখন সিন্ধু দেশে কর্ম্ম করতেম, তখন গবর্ণমেণ্ট আফিস ও বিদ্যালয়ে আমিলদেরই প্রাধান্য দেখা যেত। ইংরাজ-রাজ্যে কি উপায়ে উন্নতি-সাধন করতে হয় তাহারা যেমন ভাল বোঝে অন্য জাতিরা তেমন বুঝে না, সুতরাং তাহারা আর সকলকে ছাড়িয়া উঠেছে, অন্যেরা পিছিয়ে পড়ে আছে।

এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাইদ্রাবাদ সেওয়ান ও অন্যান্য স্থানে অনেক শিখের বসতি,

সিন্ধী দেওয়ান গোপালদাস (১৩৪ পৃষ্ঠা)

(কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারী)

প্রত্যক্ষ হয়। খালসা ও নানকসাহী, তাহার দুই শাখা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই শিখধর্ম্ম গ্রহণের অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে স্নান করাইয়া শিখ মঠে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় তিনি গুরু নানককে উপঢৌকন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করে দীক্ষা গ্রহণ করেন

সৎনাম কর্ত্তা পুরুষ।
নির্ভউ, নির্বৈর, অকাল মূরত,
অযোনি সম্ভব, গুরুপ্রসাদ।
জপ—আদ সচ্, যুগাদ সচ্।
হৈ ভি সচ্—নানক হোসি ভি সচ্।

শিখ মঠে উদাসী (আচার্য্য) শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া আধিপত্য করেন।

অন্দরমহল

যেখানে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ-প্রথা পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হয়। সিন্ধু দেশেও তাই দেখলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে রুদ্ধ—সূর্য্য চন্দ্রও তাদের রূপ দেখতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হল কি না জানি না—চাঁদের অধিকার চাঁদের হাটে নেই এমন হতেই পারে না, তবে সিন্ধু রমণী যে অসূর্য্যম্পশ্যা এ কথা সাহস করে বলা যেতে পারে। আমি যতদিন ও-দেশে ছিলাম—কোন ভদ্র সিন্ধু-মহিলার সহিত আলাপ পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটেনি। সিন্ধি-বালিকা-বিদ্যালয়ে ও-দেশের মেয়েদের যে নমুনা দেখেছি তা বড় তৃপ্তিজনক নয়। তাদের সাজসজ্জায় একটি জিনিস চিরদিন মনে থাকবে—সে হচ্ছে কর্ণাভরণ। কাণের যত রকম গহনা থাকা সম্ভব তা তাদের কাণে ঝুলছে। সে এক মারাত্মক ব্যাপার, দেখলে কষ্ট হয়। ছেলেবেলায় কৈলাশ মুখুয্যে নামে আমাদের খেলার সঙ্গী একটি সুরসিক আমুদে লোক ছিলেন—ঐ দৃশ্যে তাঁর মেয়েদের গয়না বর্ণনা মনে পড়ে। ঘরে নতুন বৌ আসছে তাকে কি কি গয়না পরিয়ে সাজাতে হবে তার এক ছড়া তাঁর মুখে শুনতেম। তিনি কাণের গয়নার যে ছড়া আওড়াতেন—কাণবালা, কাণময়ূর, এয়ারিং বোঁদা—সে সকলি সিন্ধিবালাদের কাণে ঝুলছে, গয়নার ভারে কাণ ছিঁড়ে পড়ে না এই আশ্চর্য্য!

খ্যাতনামা মিস্ মেরি কার্পেণ্টর যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন, তখন আমরা সিন্ধু দেশে ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে কতকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। সিন্ধিরা তাঁর আতিথ্যসৎকার সেবা যত্ন অনেক করেছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলে এক নাটক অভিনয় করে, তাতে একটি কবিতা পড়া হয়, তার ধূয়া 'মিস্ মেরি কার্পেণ্টার'—

তা যেন এখনো আমার কাণে এসে বাজছে। তাঁকে নিয়ে অন্দরমহল পর্য্যন্ত তোলপাড় হয়েছিল, তা দেখে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল, কেননা তখনকার কালে সিন্ধী অন্তঃপুরে মেমদেরও প্রবেশ নিষেধ ছিল। তখনও পর্দ্দাপার্টির সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু Miss Carpenter-এর খাতিরে সেদিকের দরজাও খোলা হয়েছিল। যে অন্তঃপুরে আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত প্রবেশ অধিকার পান নি, তার মধ্যে একজন ইংরাজ-মহিলাকে ডেকে নিয়ে অভ্যর্থনা করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নয়। আমাদের একটি বিশেষ বন্ধু ন—রায় যদিও তিনি আমাদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন, আমাদের সঙ্গে একত্রে বসে আহারাদি করতেন কিন্তু তার পরিবার মধ্যে আমাদের কখন নিমন্ত্রণ করেন নি, মিস কার্পেণ্টরের বেলায় তাঁর ঘরেরও 'চার দরজা খোলা'—ধন্য মিস্ মেরি কার্পেণ্টর !

সুফী ধর্ম্ম

সিন্ধু দেশের বহুসংখ্যক মুসলমান সুফী পন্থী। মহম্মদী ধর্ম্মের সহিত সুফী ধর্ম্মের অনেক প্রভেদ; এমন কি, গোঁড়া মুসলমানেরা সুফীকে স্বধর্ম্মী বলে স্বীকার করিতে চায় না। সরস মধুর কবিতাযোগে, কতক বা হিন্দু ধর্ম্মের সংস্রবে বা অন্য কারণে কঠোর মহম্মদী ধর্ম্ম স্থানে স্থানে ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। সুফী ধর্ম্ম তার দৃষ্টান্তস্থল। এ ধর্ম্মের আকরস্থান হিন্দুস্থান বলে অনেকের বিশ্বাস। তাহারা বলে যে মুসলমানদের ভারতবর্ষ আক্রমণকালে কোন এক হিন্দু ঋষি কর্ত্তৃক এ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃও সুফী ধর্ম্মের সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। সুফীদের ঋজায়ৎপ্রণালী হিন্দু যোগশাস্ত্রের প্রকারান্তর। এই যোগবলে জীবাত্মার এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ হয় যে সে স্বৈরভাবে যথাইচ্ছা গমন করিতে পারে—শত্রুদমন, রোগনাশন, প্রেমপ্রজনন, ব্যোম সঞ্চরণ প্রভৃতি বিচিত্রশক্তি উপার্জ্জন করে, ভূতপ্রেতাদি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকল তাহার প্রত্যক্ষগোচর হয়। সুফী মতে জীবাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই, জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি, পরমাত্মাই উহার চরমগতি। সাদি হাফেজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি এই ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন, এ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম, কবি ইহার পুরোহিত, আধ্যাত্মিক মদিরা নৃত্যগীত ইহার পূজোপচার, সুমন্দ বায়ুসেবিত, পুষ্পসুবাসিত, বিহঙ্গ-কলনাদিত সুরম্য উদ্যানকানন ইহার ভজনালয়। সুফী কবি সা ভেতাই সিন্ধু দেশের হাফেজ। হাফেজের কবিতার ন্যায় সা ভেতাই-এর কবিতা সেখানকার লোকদের হৃদয়গ্রাহী। ভাবুক তার প্রত্যেক বাক্যে গূঢ় অর্থ দেখিতে পান, ইন্দ্রিয়সুখকর সামান্য পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্ব্বরাগে রঞ্জিত হয়।

লাল সা বাজের দরগা

(১৩৮ পৃষ্ঠা)
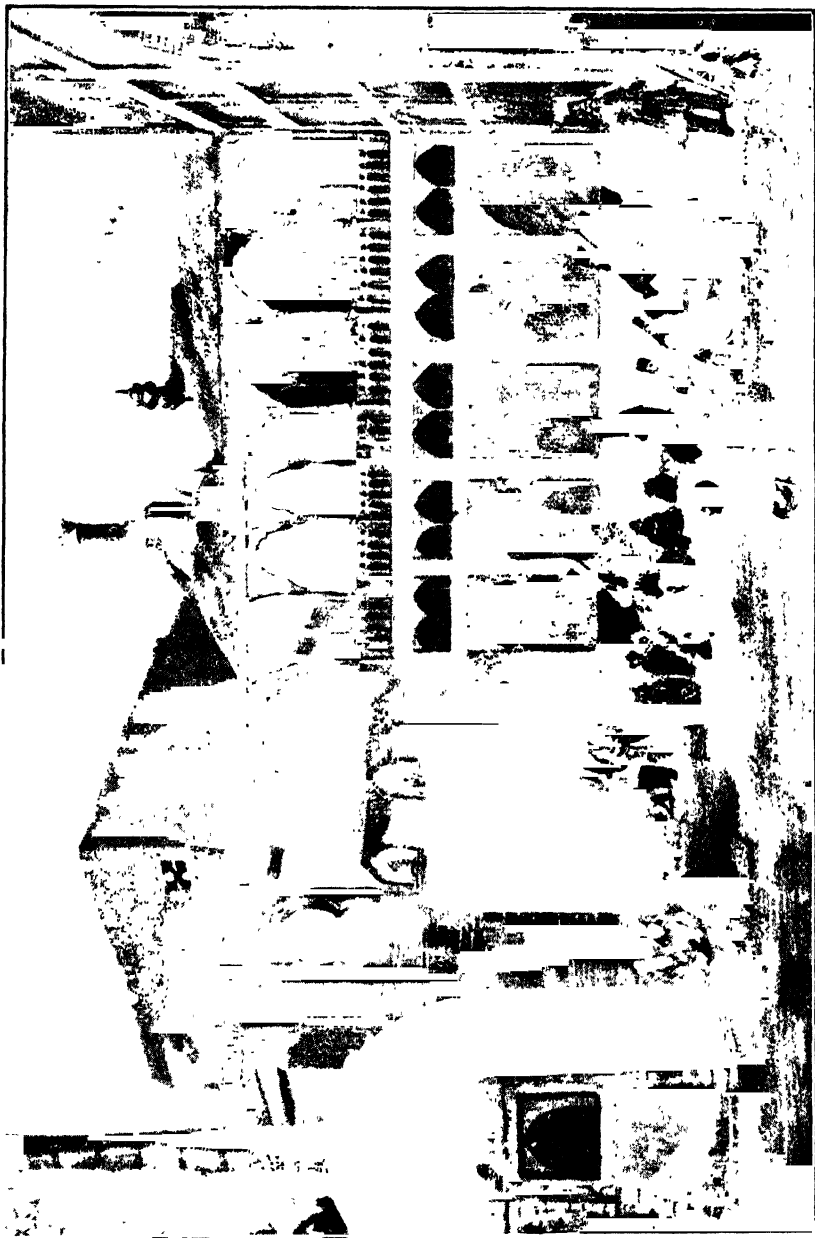
সিন্ধু দেশে সুফী সম্প্রদায়ের দুই শাখা জলালী ও জমালী। জলালীরা কতকটা শাক্ত ধরণের লোক—তারা অভক্ষ্যভক্ষণ অপেয়পান ইত্যাদি দুর্ব্যসনপরবশ, বল্লভী বৈষ্ণবদের মত পুষ্টিমার্গবিহারী। জমালীদের অন্য ভাব। গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপোষণ ভজন-পূজন ধ্যানধারণা ইত্যাদি সাধনে তারা অনুরত। তাদের যোগশিক্ষার নাম সুগল, তার নানা প্রকরণ আছে। সুগলযোগে পরিপক্ক হলে সাধক উচ্চতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন। এইরূপ সাধনাকে 'হজুর' বলে, কারণ উহাতে সর্ব্বদাই হাজির অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত থাকতে হয়। হজুর ধ্যানের অনেকগুলি সোপান। গুরু পীর মহাপুরুষদেব ধ্যান প্রথম সোপান। দ্বিতীয় সোপানে মহম্মদের সহিত জ্ঞান ভাব কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হওয়া। এই সোপানপরম্পরা হতে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হওয়া—'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'। সে অবস্থায় সুফী ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় সোঽহং (আনা'ল হক) জ্ঞানের অধিকারী হন।

পীর পূজা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সিন্ধুবাসী হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানীধরণে গঠিত। হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও অনেক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। আগেকার মত একালে জোর জবরদস্তী নেই, তবুও অনেকানেক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম আশ্রয় করে, মুসলমানও প্রায়শ্চিত্তের পর অনেকে পুনর্বায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরে আসে। ওদিকে আবার হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সকল মুসলমান সমাজে প্রবেশলাভ করেছে। পৌত্তলিকতার সংস্রবে ইসলামের একেশ্বরবাদও কলুষিত হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় হিন্দু যেমন মুসলমান মুল্লার শিষ্য, তেমনি আবার কখন কখন মুসলমানও হিন্দু আচার্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। মুসলমান পীরদের মধ্যে অনেকের হিন্দু নাম ও কোন কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি প্রতীকও রক্ষিত হয়েছে। পীর পূজা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত, ইহা হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামের যোগসূত্র। এই সকল পীর ঈশ্বর ও মানবের মধ্যস্থরূপে জীবের সদ্গতি সাধনে তৎপর, এই বিশ্বাসে লোকেরা পীর বিশেষের শরণাপন্ন হয়। পীরেরা ঐশীশক্তি সম্পন্ন, কত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাদের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, লোকদের পীরমাহাত্ম্যে অগাধ বিশ্বাস। এমন অনেকগুলি পীর আছেন যাদের উপর হিন্দু মুসলমান-দের সমান ভক্তি, তন্মধ্যে সেওয়ানের লাল সা বাজ একজন গণ্য। লাল সার স্তুতিবাদ পীর-ভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

পীর মহাপীর তুমি রাজরাজেশ্বর,
সঙ্কট সহায় ভবে সর্ব্বদুঃখহর।

তব ধন্য পুণ্য নাম নিখিল প্রচার,
তাপিত জনের তুমি হর দুঃখভার।
পাথর সুবর্ণ হয় তব কৃপাগুণে,
চরণে শরণ লাগি তব নাম শুনে।
করুণা অপার স্মরি লয়েছি শরণ,
অন্নদানে বঁধু মোরে করহ পোষণ।
মহারাজ বিতর তোমার কৃপাবারি,
তরাও ভকতে ওহে বিপদ-কাণ্ডারী।
আমার যে দশা প্রভু জানিছ সকল,
জীবন শরণ তুমি, সহায় সম্বল।
আশালতা নবীনপল্লবে প্রভু ছাও,
কৃপার দুয়ার তব দাও, খুলে দাও।
ভুবনবিদিত নামে ধরেছি আশ্বাস,
অভাগারে করোনা হে নিরাশে নিরাশ।
দুঃখশোক পাপতাপ করহ মোচন
*সেরবন্দ পীর তুমি, ঈশ্বরের জন,
অগতির পরে কর কৃপা বরিষণ।

জেন্দাপীর নামে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন তাঁকে স্মরণ করে এ সিন্ধুকাহিনী সমাপন করি। পীর জেন্দা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পূজার পাত্র। হিন্দুরা এঁকে সিন্ধু নদীর অবতার বলে বিশ্বাস করে। ইহার নামে ভক্তেরা যে স্তুতিমালা পাঠ করেন তার কিয়দংশ ভাষান্তরে উদ্ধৃত করে দিলুম :-

সবিৎ সুহৃদ সম কল্যাণ নিলয়,
মহারাজ মহিমা অপার,
ঢালিছ অজস্র স্রোত বল বেগময়—
সেবকেরে সুখে কর পার।
অগণ্য অগণ্য পাপে তাপিত অন্তর,
দূর কর প্রভু পাপভার,
তোমার দুয়ারে যাচে কত শত নর,
মনোরথ পূরহ আমার।

* লাল সা'র জন্মভূমি।

আপ্পাসাহেব বারদ (১৩৯ পৃষ্ঠা)

অন্নদাতা তুমি সদা কর অন্নদান,
হৃদি দেহ সত্য পুণ্যসার
চৌদিকে ঘিরেছে মোরে সঙ্কট মহান্—
দয়াময় কর হে নিস্তার।
বিশ্বায় তুমি হে মহামতি,
অপার প্রভুতা, অপার শকতি,
মায়াজাল রচয়িতা অগতির গতি,
পূর আজি ভক্ত মনস্কাম।
শরণ পরমগতি, বহুশক্তিধারী,
কর পার ভবতরি কত নরনারী,
বিপদ তরঙ্গ মাঝে তুমিই কাণ্ডারী;
পূর ওহে ভক্ত-মনস্কাম।
থাক মোর সাথে সর্ব্বকাল,
লোক মাঝে দেহ ধৈর্য্যবল,
সম্পদ বিপদে তুমি একই সম্বল,
অভাগার ঘুচাও অকাল।
সতত তোমায় সখা করি হে স্মরণ,
কাঙ্গালের তুমিই আধার,
সেবকের স্তব স্তুতি করহ গ্রহণ—
দয়াময় দেও হে নিস্তার।

সোলাপুর

সোলপুর জিলায় আমি অনেক বৎসর কর্ম্ম করি। ১৮৭৪ সালে বিজাপুর তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই দুই জিলা একটি জজিয়তীর অন্তর্ভূত হয়। আমি প্রথম হইতেই এই কোর্টের ভার গ্রহণ করি এবং কোর্টের সমুদায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কার্য্য শৃঙ্খলা বাঁধিয়া দেওয়া, এ সমস্ত আমাকেই করিতে হয়। সোলাপুরে মল্লাপ্পা (আপ্পাসাহেব) বারদ প্রমুখ কতিপয় দেশানুরাগী কর্ম্মিষ্ঠ সজ্জন ছিলেন, তাঁহাদের উদ্যোগে কাপড়ের কল-কারখানা ও অন্যান্য সার্ব্বজনিক মঙ্গল কার্য্যের সূত্রপাতে ঐ পুরী অনতিকাল মধ্যে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। আমার বন্ধু আপ্পাসাহেব বারদ এখন আর নাই, তিনি একটি নাবালক পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোকগত, কিন্তু

সোলাপুরে তাঁহার কার্য্যকলাপের স্মৃতি-চিহ্ন সকল বিদ্যমান*—তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা বৃথায় যায় নাই। আমার সময় একটি মাত্র কাপড়ের কল ছিল, এইক্ষণে ৫।৬টি যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, বড় বড় বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সোলাপুর ধন-দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, সে সোলাপুর বলিয়া এখন আর তাহাকে চেনা যায় না।

লিঙ্গায়ৎ

এ অঞ্চলে লিঙ্গায়ৎ বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়ের লোক অনেক দেখা যায়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহারা শৈব অথচ সাধারণ হিন্দুসমাজ বহির্ভূত বেদ-বিরোধী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। লিঙ্গায়ৎ স্ত্রী পুরুষ সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ করে। তাহাদের আদিগুরুর নাম বসপ্পা (বৃষভ শব্দের অপভ্রংশ), লিঙ্গায়তেরা তাঁহাকে নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি বিজাপুর অঞ্চলে একটি শৈব ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে উপনয়নের সময় বালক বসপ্পা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবীত ধারণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না—বলিলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমার কোন গুরু নাই। এই অপরাধে পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বসপ্পা পলায়ন করিয়া বিজ্জল রাজার শরণাপন্ন হন। বিজ্জলের রাজধানী কল্যাণ তথায় তাঁহার এক মাতুল পুলিশাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার বাটী গিয়া রহিলেন এবং তাঁহাকে মুরব্বি ধরিয়া সরকারী চাকরী-যোগে প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিলেন, এবং পরে তাঁহার উপার্জ্জিত বিত্ত দানধর্ম্মে ব্যয় করিয়া লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইল তখন জৈন স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার নূতন মত প্রচার আরম্ভ করিলেন। লিঙ্গোপাসনা, শৌচাশৌচ অবমাননা, বেদ-ব্রাহ্মণ নিন্দা ইত্যাদি উপদেশ সেই মতের অঙ্গীভূত। এই সকল কারণে তিনি জৈন ও অপরপন্থী লোকদের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহার বিপক্ষে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজার কোপানলে পড়িয়া অবশেষে তাঁহাকে কল্যাণ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। কিন্তু তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে গিয়া রাজা স্বয়ং বিপদে পড়িলেন ও বাসবের এক শিষ্য কর্ত্তৃক নিজ প্রাসাদেই নিহত হইলেন। বাসব (বসপ্পা) কল্যাণ ছাড়িয়া কৃষ্ণা ও মলপ্রভার সঙ্গমস্থল সঙ্গমেশ্বরে বাস করিতেছিলেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৃষভ পুরাণ নামক একখানি পুরাণে বাসবের চরিত্র বর্ণনা আছে। এই পুরাণ

* বারদ তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয় সম্পত্তি ট্রষ্টীর হস্তে দিয়া তার একটা সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সোলাপুর হইতে এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম।

লিঙ্গায়ৎ মন্দির—সোলাপুর

(১৪০ পৃষ্ঠা)
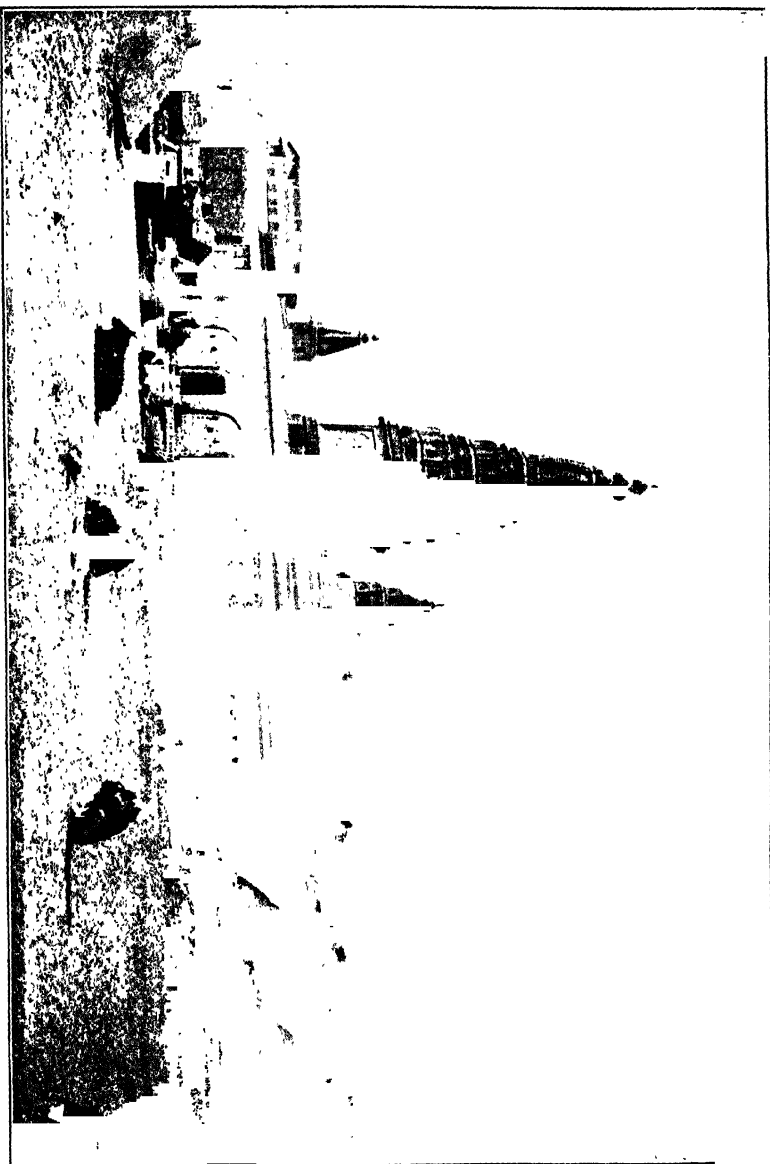
লিঙ্গায়ৎদিগের ধর্মগ্রন্থ। ইহার মতে জাতিভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ বিচার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতি, হিন্দুধর্ম্মের বিধি ও অনুষ্ঠান ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে হিন্দু আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র শিবপূজা তাহাদের শাস্ত্রবিধান হইলেও তাহার উপরে দেবদেবী ও সাধুভক্তের পূজা স্থান পাইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ পুরোহিতের নাম জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে গৃহস্থ ও বিরক্ত দুই শ্রেণী। গৃহস্থ জঙ্গম বিবাহ করে, বিরক্ত জঙ্গম অবিবাহিত। লিঙ্গায়ৎদের শবদাহন প্রথা নাই, গোর দেওয়া তাহাদের রীতি। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট ভয়ের জিনিস নহে, প্রত্যুত মৃত্যুই কৈলাস-শিখরে আরোহণের পথ, এই জানিয়া মৃত্যুতে তাঁহারা অভিনন্দন করেন। লিঙ্গায়ৎ শবগৃহে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করা যায়। এক দিকে বিধবার ক্রন্দনধ্বনি, অন্য দিকে বাদ্য-সমারোহে জন্দ দেশ ভোজ লাগিয়া যায়। মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুষ্পচন্দন বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া গাড়ী করিয়া সমাধিস্থলে সমানীত হয়। সম্মুখে বাদ্যের ঘটা পশ্চাতে শবযাত্রীর প্রোশেসন চলিয়াছে। তাহাদের গুরুভক্তি এমনি প্রবল যে গুরুর পাদোদক মৃতদেহোপরি সিঞ্চিত হয় ও মহাদেবের প্রতি গুরুর আজ্ঞাপত্র তাহাতে সংলগ্ন হয়, সে পত্র পাইবামাত্র মহাদেব প্রেতাত্মাকে স্বীয় দেবনিকেতনে সাদরে ডাকিয়া লইয়া যান। সমাধিস্থলে কুল পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া আত্মার সদ্গতি সাধনের বিবিধ উপায় সকল যোজনা করিতে তৎপর থাকেন।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার নিশিকান্তের সঙ্গে সোলাপুরে আমার প্রথম আলাপ। তখন তিনি ইউরোপ হইতে সদ্য প্রত্যাগত হইয়াছেন—বৈলাতিক তীব্রবাস তাঁহার গাময় লাগিয়া আছে। বিলাত হইতে খুব নাম করিয়া আসিয়াছেন—কোন এক জর্ম্মন য়ুনিবর্সিটি হইতে Doctor of Philosophy উপাধি পাইয়াছেন—রুষিয়ায় গিয়া কি সব কাণ্ড করিয়াছেন—তাঁহাকে গুপ্তচর (Spy) সন্দেহ করিয়া ও-দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল, সে নির্ব্বাসনবার্ত্তাও তাঁহার গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার উপর দেশের আশা ভরসা কতই ছিল! ইংরাজী ফরাসী জর্ম্মন রুষ—এই বিবিধ ইউরোপীয় ভাষা তাঁহার মুখাগ্রে—তাঁহার ইচ্ছা ছিল এদেশে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে Foreign office-এ প্রবেশ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহাতে যদিও কৃতকার্য্য হইলেন না, তথাপি দেশে ফিরিয়াই মহানুভব বড়লাট রিপণের অনুগ্রহে নিজামরাজ্যে শিক্ষা-বিভাগে একটা বড় কাজে নিযুক্ত হইলেন—হাইদ্রাবাদ কলেজের প্রিন্সিপাল, খুবই

উচ্চপদ! দুর্ভাগ্যক্রমে সে পদ অধিক দিন রাখিতে পারিলেন না। পরে অন্য দুই এক কাজে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিবার সুযোগ হইল কিন্তু নিজ দোষে একে একে সব হারাইলেন। নিজামরাজ্যে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাসোন্মুখ হইতে চলিল, শেষে হাইদ্রাবাদে অপদস্থ হইয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তার একে এই আর্থিক দুরবস্থা, তার উপর আবার পারিবারিক অশান্তি! আমি হাইদ্রাবাদে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই—তখনো তিনি মাথা তুলিয়া আছেন, Wolsey-র ন্যায় তাঁহার পতন হয় নাই। সে সময়ে নিজামৎগগনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গসূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে--দুই চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত ও অঘোরনাথ। এই শেষোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বনাম অপেক্ষা তাঁহার প্রতিভাশালিনী কন্যা সরোজিনী নাইডুর নামে লোকসমাজে সমধিক পরিচিত। এইরূপে দিন যায়, পরিশেষে একদিন শোনা গেল যে, নিশিকান্ত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক স্পৃহা এই ছিল কোন এক বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়া হাইদ্রাবাদ নবাব-পরিবারভুক্ত হন—তাঁহার বিশ্বাস এই যে, তাঁহার গুণে সেখানকার সকলেই এমনি মুগ্ধ যে তিনি একটুকু ইঙ্গিত করিবামাত্র কত শত বেগম তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। হায়, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না। এই গোলযোগের মধ্যেই সে-দেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি আপশোষ! তাঁর মুখে একটু জল দিবার জন্য আপনার লোক কেহ কাছে নাই—তাঁহার স্ত্রী তাঁহা হইতে বহু দূরে—একটিমাত্র পুত্র অনেক দিন মারা গিয়াছে, এই শোকতাপ দুঃখযন্ত্রণায় বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন—মনে হইলেও কষ্ট হয়!

লোকটার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল কিন্তু হইলে কি হয়, কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরে মনুষ্যত্ব হয় না। তাঁহার চরিত্রগত কি একটা নৈতিক বিকলতা ছিল--সেই এক ছিদ্র হইতে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পৌরুষ মানসম্ভ্রম একে একে সকলি ক্ষরণ হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ করিয়া ফেলিল। নিশিকান্তকে দেখিলাম, তড়িতের ন্যায় তাঁর প্রকাশ, তড়িতের ন্যায় অন্তর্ধান। যাক্, ওসব কথায় আর কাজ নাই—মৃতের ভাল দিক্ দেখাই ভাল—

De mortuis nihil nisi bonum—
Of the dead nothing but good!

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা

সোলাপুরে খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার সহিত আমার চেনা পরিচয় হয়। তাঁহার বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনকাহিনী কৌতূহলজনক। তিনি এদেশের একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন, প্রোফেসর মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের সহিত বিলাতযাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের

সিদ্ধেশ্বর মন্দির

(১৪১ পৃষ্ঠা)
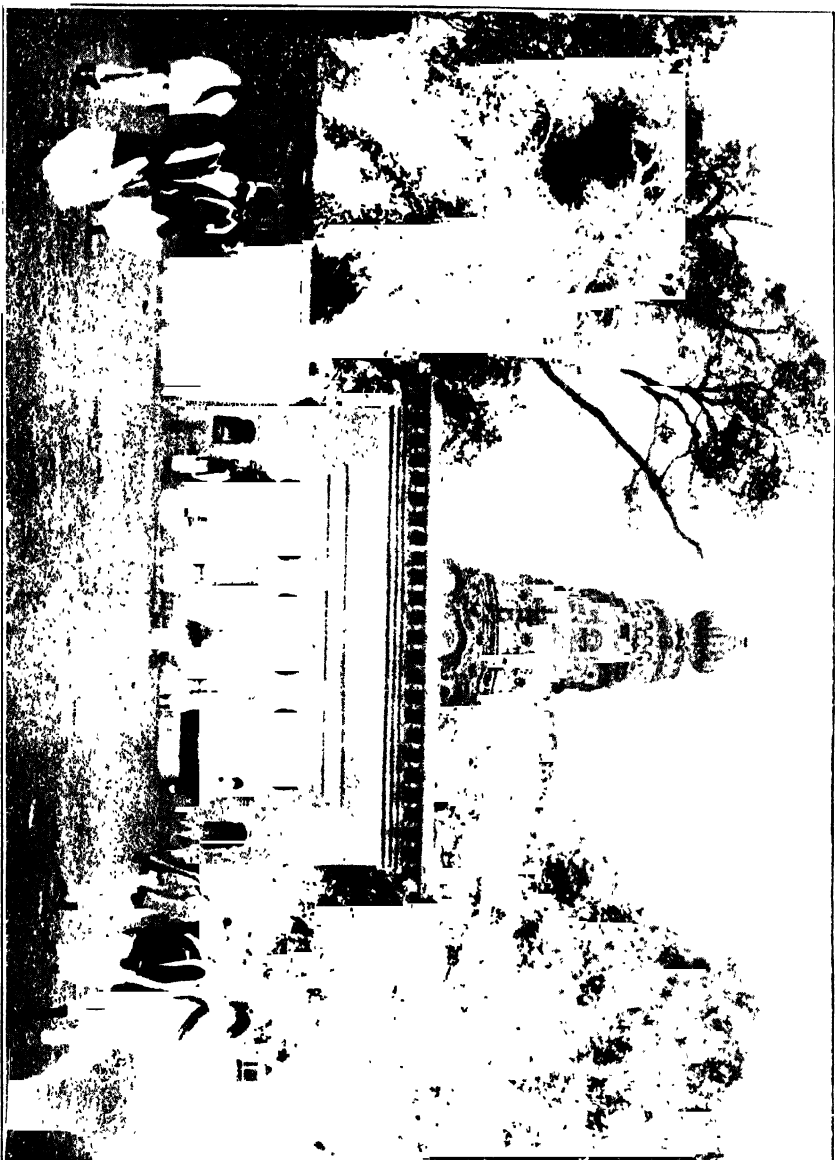
বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক অক্ষর জানিতেন না অথচ অল্পকাল মধ্যে এই দুই কঠিন ইউরোপীয় ক্লাসিকের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যে ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌স্‌ সে সময়ে তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজি অভিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, —শ্যামাজী ঐ কার্য্যে তাহাকে বিস্তর সাহায্য করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে Oriental Congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন ও ব্যরিষ্টর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই রতলমের দেওয়ানী পদ পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের অনুরোধে তিনি নাসিকে গিয়া শিরোমুণ্ডন ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া ম্লেচ্ছসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার পরেও বিলাতযাত্রার নেশা ছুটিল না, পুনর্ব্বার সিন্ধুপারে তাহার সাধের বিলাতভূমিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন! এবার কিন্তু সেদেশে গিয়া এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, ইংরাজ রাজদ্রোহী ঘোরতর Anarchist হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ মুখোস পরিয়া তিনি এদেশের গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন—দূর হইতে অশেষ প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপর দিয়াও অনেক ঝড় তুফান বহিয়া গেল—শেষে এমন হইল যে প্রাণের দায়ে ইংলণ্ড ছাড়িয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। এক্ষণে তিনি ফরাসী রাজধানী প্যারী নগরীতে বাস করিতেছেন ও সেখানে লুক্কায়িত থাকিয়া এই গবর্ণমেণ্টের উপরে যথাসাধ্য গোলাগুলি বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত নহেন।

'নবেলী' শকুন্তলা

সোলাপুরে থাকিতে বাহির হইতে গাইয়ে ওস্তাদ, নাট্যমণ্ডলীর লোকেরা মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। একবার এক পারসী নাট্যশালার ম্যানেজার আসিয়া আমাকে মুরব্বি ধরিয়াছিল, তাহার অনুরোধে আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাঁহারা জজ সাহেবের অভিমতে নাটক অভিনয় করিবেন কিন্তু কি নাটক? তাঁহাদের অভ্যস্ত নাটকের তালিকা আমার নিকট পাঠানো হইল—তাহার মধ্যে আমার যাহা ইচ্ছা বাছিয়া দিবার কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে অভিজ্ঞান 'শকুন্তলা' আমার মনোনীত হইল। ঘনঘটা করিয়া অভিনয় আরম্ভ হইল—সে অভিনয় দেখিয়া আমার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাপসকন্যা একেলে পারসী রমণীর বেশে রঙ্গভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, দুষ্মন্ত একালের নবেল বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্থানী ভাষায় গান করিতে লাগিল। দুষ্মন্তের পুত্র, সেও নব্য পারসী বালক,

পিতাকে দেখিয়া তাহার উপর একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল,—'সর্ব্বদমন' বালকের সেই আত্মপরিচয়! আর সে যে আশ্রম, সে ঋষিকুমার, সে কণ্ব মুনি—কালিদাস তাঁহার নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না। আমি মনে মনে ভাবিলাম—"কবির মুখ হইতে হঠাৎ দুর্ব্বাসার শাপের মত কি অভিশম্পাত বর্ষণ হইত কে বলিতে পারে—শেষে ম্যানেজার বেচারাকে মুস্কিলে পড়িতে হইত!"

পণ্ডরপুর

ভীমানদী তীরস্থিত সোলাপুর জিলায় এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে বিঠ্ঠল বা বিঠোবা দেবের মন্দির ও আর কয়েকটি মন্দির আছে। বিঠোবাদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত। শিবাজী রাজার সমসাময়িক সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারাম বিঠোবাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার রচিত অভঙ্গাবলি বিঠোবার স্তুতিগীতে পূর্ণ। তাঁহার পিতামাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপুরে তীর্থ করিতে যাইতেন। প্রবাদ এই যে, বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্ব্বপুরুষ চিরন্তন প্রথানুসারে এই তীর্থযাত্রায় যাইতেন। এইরূপ ষোলবার তীর্থ করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয় যে বিঠোবাদেব ও রুক্মাই দেবীর স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি তাঁহার গ্রামের এক আম্রবনে নিহিত আছে—এই স্বপ্নদৃষ্ট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া তিনি নিজ গ্রামে ইন্দ্রায়ণী নদীতীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবাদেব বিশ্বম্ভরের কুলদেবতা হইলেন। আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পণ্ডরপুরে বৎসরে দুইবার মেলা হয়—তাহাতে অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী নিশান উড়াইয়া বিঠোবা দর্শনে সমাগত হয়। এই সকল যাত্রীর নাম 'বারকরী।' পুরাকালে এই স্থান সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল, বুদ্ধ মূর্ত্তির স্থান এইক্ষণে বিঠোবাদেব অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। উৎসবের দিন জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও মন্দিরের ভিতর জাতি বিচার থাকে না- সেইটুকু সীমার মধ্যে অস্পৃশ্য জাতির হস্ত হইতেও অন্নগ্রহণ দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না।

মন্দিরে দুই শ্রেণীর পুরোহিত আছে—বড়ুয়া ও সেবাধারী। এই দুই দলের ঘরাও বিবাদে অনেক সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া পূজা বন্ধ হইত। আমি তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকার নিরূপিত হইয়া ডিক্রী জারী হইল, তবুও তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন হয় না। বড়ুয়াদের হস্তে শুধু যে ঠাকুর পূজার ভার তাহা নহে, তাহারা আবার মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ। পেশওয়া প্রভৃতি মহা মহা যাত্রীদের প্রসাদে বিঠোবাদেবের ধনরত্নের অভাব নাই, মন্দিরে স্থানাভাব প্রযুক্ত সেই সকল বহুমূল্য মণি মুক্তা বড়ুয়াদের ঘরে

বিঠ্ঠলদেব—পণ্ডরপুর (১৪৪ পৃষ্ঠা)
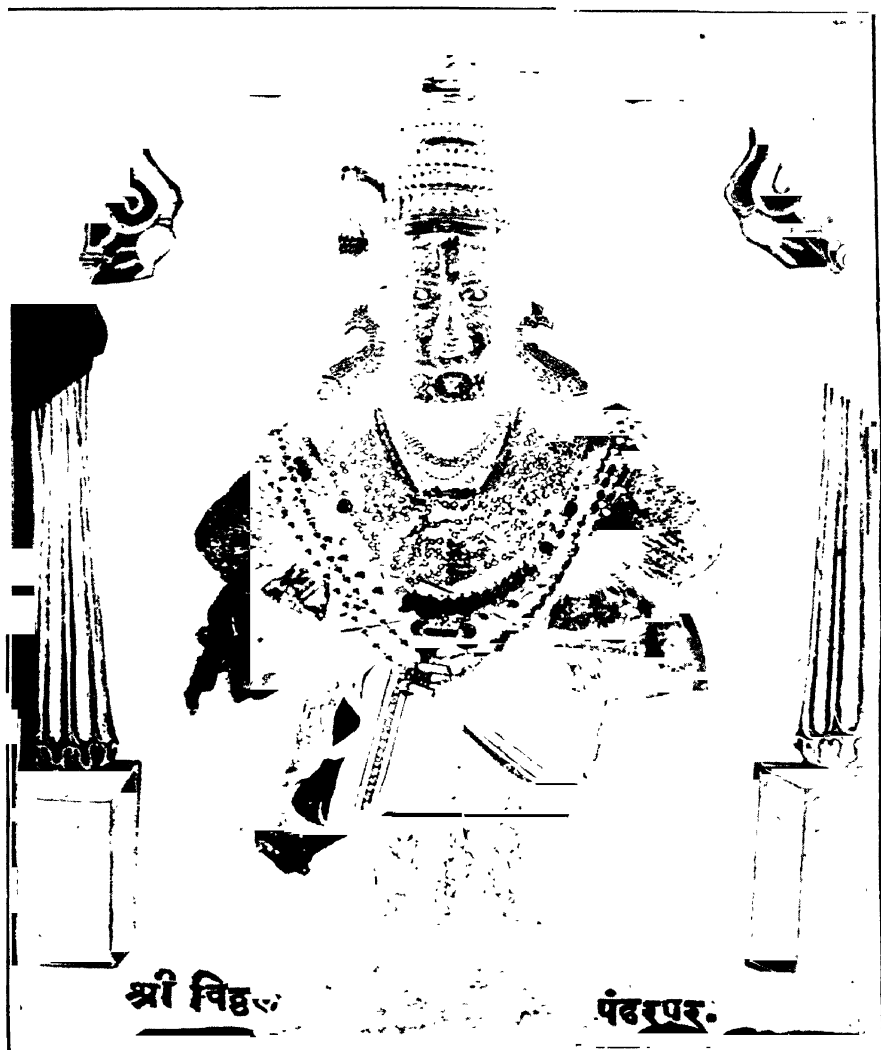
ঘরেই রাখিতে হইত, তাহাদের উপব সেই সমস্ত গহনাপত্রের অপব্যবহারের চার্জ আসে, ইহার মীমাংসা করা—বিঠোবাদেবের বিবিধ অলঙ্কারের তালিকা কবিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সামান্য ঝঞ্ঝাটের কর্ম্ম নহে। মোগলাই আমলে বিঠোবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বড়ুয়াদের হস্তে ছিল। তথাকাব যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তির মধ্যে ঠাকুরের অন্য একটি মূর্ত্তি গড়াইয়া তাহার সংবক্ষণের জন্য একটি গুপ্ত স্থান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। জজ সাহেবেব ভাগ্যে তাহারও দর্শন ঘটিয়াছিল—অন্য লোকেরা যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না।

পণ্ডরপুবে অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রম, এই দুইটি আশ্রম উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৬—৭৭ সালে সোলাপুব জিলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে পিতামাতা আপন শিশু সন্তান ছাড়িয়া অনেকে দূব দেশে চলিয়া যায়, কতক বা মবিয়া যায়, এইরূপ পিতৃমাতৃহীন অনেক শিশু সন্তান আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে প্রার্থনা সমাজের একটি সভ্য লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কব পণ্ডরপুর জিলায় সবজজ ছিলেন। তিনি এই নিরাশ্রিত শিশুদের আশ্রয় দানে কৃতসংকল্প হইয়া চাঁদা তুলিতে আবম্ভ কবেন ও ১৩০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদেব জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে একটি স্থানীয় কমিটি তাহাব কার্য্যনির্ব্বাহের ভাব গ্রহণ কবে ও পবে সেই কার্য্য বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের হস্তে আইসে। এইক্ষণে একজন বেতনভুক্ অধ্যক্ষ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে ভ্রূণহত্যা নিবাবণের উদ্দেশে একটি বিধবাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বিভাগ মিলিত হইয়া যে একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহাব জন্য ম্যুনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ৫০০ টাকা বার্ষিক দাতব্য নিরূপিত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় যে ইহা হইতে অনেকগুলি বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা বমণী বিবাহ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কবিতেছে ও অনেক অনাথ বালক শিক্ষা লাভ কবিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

পণ্ডরপুরের কথায় একটা ছড়া মনে হইতেছে, তাহা এই :—

পাউস পড়লা চিখ্‌খল ঝালা নদিলা আলাপব
মাঝা ইথেচ পণ্ডবপুব।
বৃষ্টি বাদল, কাদায় পিছল, নদী এল পূব
আমাব হেথাই পণ্ডবপুর।

বিজাপুর

আমি যখন সোলাপুরে জজ ছিলাম তখন বিজাপুর আমার অধীনে ছিল, ইহাদের কলেক্টর আলাদা কিন্তু একই জজ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্র পশ্চাৎ প্রায় দুই শত বৎসর বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ও আদিলসাহী বাদসাদের রাজধানীরূপে প্রখ্যাত ছিল। এই সহর সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণ সীমা ও কৃষ্ণা নদীর অধিত্যকায় অবস্থাপিত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ রেলওয়েব একটি নামাঙ্কিত ষ্টেসন। ইহার আশপাশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু নাই। বৃক্ষপল্লব পরিবর্জিত তরঙ্গায়মান মাঠ ময়দান—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র এই যা প্রকৃতির মুখচ্ছবি। রেলগাড়ীতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুরের দূতস্বরূপ "গোল-গুম্বজ" ইমারতখানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে—ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয়া দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়। পরে সহরের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই গোর মসজিদ ও অন্যান্য ছোট বড় ইমারতের ভগ্নমূর্ত্তি সকল নেত্র পথে পতিত হয়। সহরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর প্রাচীর, ইহার পরিধি অন্যূন তিন ক্রোশব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত ও অল্লাধিক বলশালী শতাধিক বুরুজে সুরক্ষিত।

পঞ্চতোরণের মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করা যায়। তাহার চারিটি অক্ষত রহিয়াছে; পঞ্চমদ্বার সরকারী ঘরবাড়ীতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিক্ দিয়া প্রবেশ কর সহরের এক সুমহান্ অপূর্ব্ব দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। বীজাপুরের প্রাচীর বুরুজ ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ইহা এক সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ভিতরে প্রবেশ করিলে সে ভ্রম দুব হয়। সহরে বসতিগুলি কেমন খাপছাড়া এবং গুটিকত প্রাচীন ইমারত ছাড়িয়া দিলে তাহাতে বাড়ী ঘর দুয়ার বিশেষ কিছুই বর্ণনীয়,নাই। প্রাচীন ও নব্য সহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আধুনিক লোকালয় পশ্চিমদ্বারের সন্নিহিত। তাহা ছাড়াইয়া গেলে অন্তরের ভগ্ন বিজনতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। নগরের মধ্যভাগে দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাজপথ গিয়াছে তাহা পথিককে মধ্যদুর্গে লইয়া যায়। এই দুর্গের নাম 'আর্ক কেল্লা'। ইহা গোলাকৃতি, ইহার বেষ্টন প্রায় এক মাইল হইবে। 'আর্ক কেল্লায়' যত বড় বড় সাহেব সুবার বাসগৃহ, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় প্রভৃতি সার্ব্বজনিক ইমারতশ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত 'সাত মজলী' প্রাসাদ, 'আনন্দ মহল', 'গগন মহল'—বাহিরে 'আসার মহল', 'মালক জহান', মস্‌জিদ এবং আলি আদিলসার অসম্পূর্ণ সমাধি মন্দির মিলিয়া যে সৌধমালা উন্মেষিত হয় তাহা বিজাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতিতে পূর্ণ। এই পূর্ব্বগৌরবের কঙ্কাল সকল সহরময় বিক্ষিপ্ত

গোলগুম্বজ
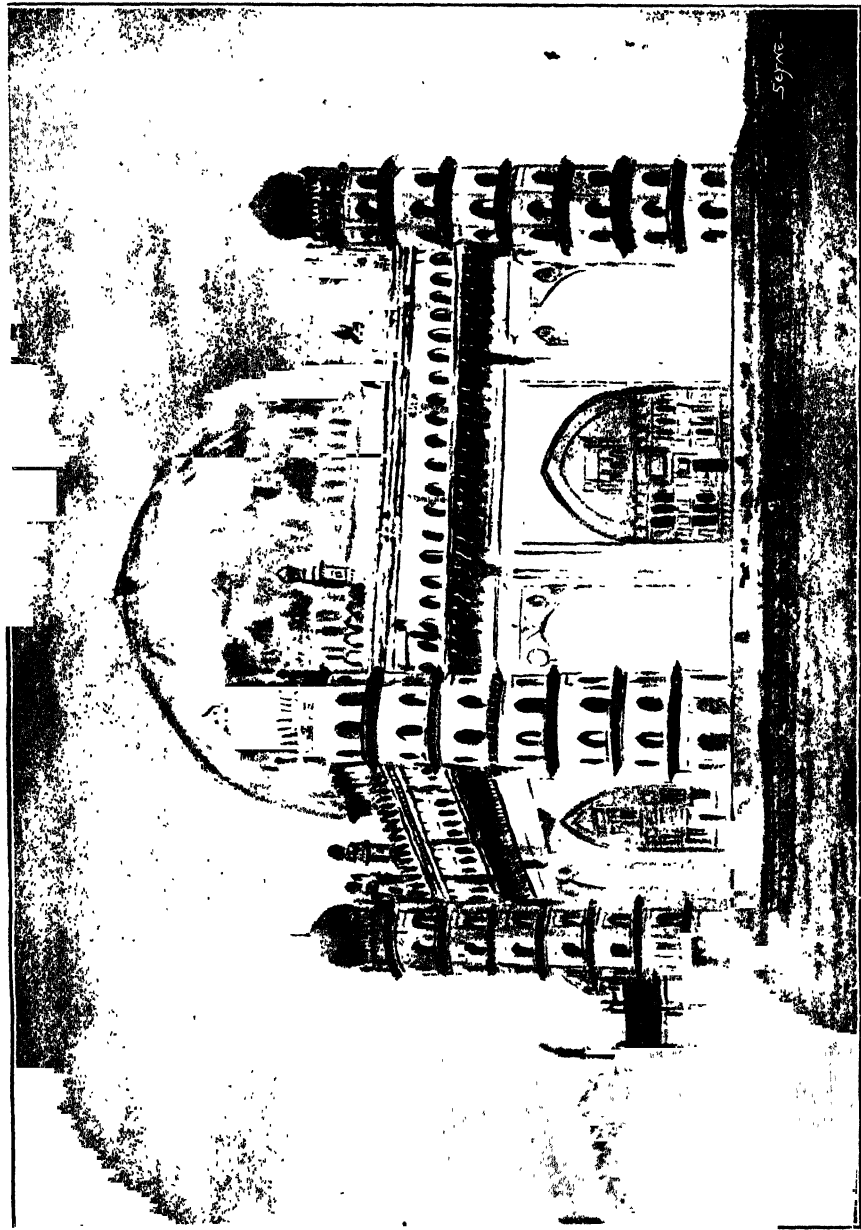
(১৪৭ পৃষ্ঠা)

দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গল পরিবৃত ছাদহীন ভগ্নগৃহ, কোথাও একটি গোর কিংবা মস্‌জিদ ঝোপঝাপের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে, কোথাও বা ভগ্ন স্তূপের মধ্যে ফোয়ারা ও জলযন্ত্রসংযুক্ত মনোহর উদ্যানের চিহ্ন সকল পড়িয়া আছে। কোথাও ভগ্ন জলযন্ত্র শুষ্ক, ফল-ফুলের বৃক্ষ সকল বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, কোনস্থানে হয়ত একটি অযত্নসম্ভূত জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়, সেই ভুবনবিখ্যাত বিজাপুরের এই দুর্দ্দশা—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

কোথা মথুরাপুরী গেছে যদুপতির।
রঘুপতির কোশলাও সেই পথে।
সবে এতেক ভাবি মন করহ স্থির
জেনো কিছুই স্থির নহে এ জগতে॥

উপরে আর্ক কেল্লার নামোল্লেখ করিয়াছি। আর্ক কেল্লাই বিজাপুরের শোভনতম স্থান, ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। য়ুসফ আদিল সা প্রথম স্থলতান এই দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, ইব্রাহিম আদিল সা'র আমলে ইহার কার্য্য শেষ হয়; ইহার প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক ভূমিখণ্ড প্রাচীন বীজাপুরের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এই দুর্গ আদিলসাহী বাদসাদিগের কত লীলাখেলা, যুদ্ধবিগ্রহের স্থান—ইহাই আবার সেই রাজবংশ নিপাতের সাক্ষী। বিজাপুর পতনকালে এই স্থানে স্থলতান সেকন্দর সহস্র সহস্র প্রজার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের মধ্যে বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজমুকুট সমর্পণ করেন। যদিও ইহার সৌধাবলী ভগ্নপ্রায়, ইহার উদ্যান কানন তৃণ কণ্টকাবৃত, ইহার উৎস জল-প্রণালী সকল শুষ্ক—তথাপি ইহা এক অনির্ব্বচনীয় মহিমামণ্ডিত, সেই সমুদ্ধত রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান।

বিজাপুরে যে সমস্ত প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান তন্মধ্যে "গোলগুম্বজ" সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা স্থলতান মাহমুদের সমাধি মন্দির। সহরের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়, পৃথিবীতেও দুএকটি ভিন্ন এমন বিশাল গুম্বজ আর নাই। গুম্বজরাজ বহির্ভাগ হইতে ১৯৮ ফুট উচ্চ ও যে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫

ফুট দীর্ঘ। ইমারতখানি সমচৌকস ১৮,২২৫ ফুট, রোমনগরের পান্থিয়ন হইতেও বৃহত্তর। বাহিরের চারিকোণে চারিটি গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটির সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছতালা পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভন দৃশ্য সন্দর্শন করা যায়। ভূচর নরকীটেরা কি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। এই গুম্বজে প্রতিধ্বনি গ্যালরি (Whispering gallery) এক চমৎকার জিনিস। তথায় প্রতিধ্বনির আর বিরাম নাই। একসীমায় কাণে কাণে কথা কহিলে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়। এককণ্ঠ বিনির্গত সুর হইতে শত শত কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়। দক্ষিণদ্বার হইতে সমাধি গৃহে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্তর মঞ্চের উপর সুলতান মাহমুদ, তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের গোর-প্রস্তর সকল দেখা যায়। দক্ষিণদ্বার নিকটস্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পারস্য লেখ আছে। তাহাতে সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ পাওয়া যায়—তাহা ১০৬৭ অর্থাৎ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ।

এই সকল বৃহৎ প্রস্তরের ইমারত, ইহাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া লোকের মনে সহজে কৌতূহল জন্মিতে পারে, কি উপায়ে কি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার সৃষ্টি হইল, না জানি ইহাদের উপর কত মজুর মিস্ত্রী খাটিয়াছে—কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইব্রাহিম রোজা নামক ইব্রাহিম বাদসার গোরস্থানে পারস্য ভাষায় একটি শিলালেখ আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হয়। সে লেখ এই:—"মালিক সান্দাল দেড় লক্ষ নব্বই হুন ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।" হুনের মূল্য ৭ শিলিং করিয়া হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌণ্ড দাঁড়ায়, মোটামুটি ধর ৫॥০ লাখ টাকা। কিন্তু এ হয়ত শুধু গুম্বজ নির্ম্মাণের ব্যয়—সমুদয়টা ধরিতে গেলে এক কোটি মুদ্রারও অধিক হইয়া যায়। ঐ লেখে আরো আছে যে এই কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাটিত, কার্য্য শেষ হইতে ৩৬ বৎসর ১১ মাস ১১ দিন লাগিয়াছিল। এই লোক সংখ্যায় মুটে মজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবি সামিল কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ উহা শিল্পী রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নির্দ্দেশক। তদ্ভিন্ন নিকৃষ্ট শ্রমজীবিদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার সন্দেহ নাই, নতুবা এই সকল ইমারত নির্ম্মাণ কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধি মন্দির প্রস্তুত করা, মুসলমানদের এক অদ্ভুত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভস্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণ-চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে উৎসুক, মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ। সুলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা গোলগুম্বজের সমস্পর্দ্ধী এক গোর মন্দির নিজের জন্য পত্তন করেন। তাহার ছায়া পিতার গোরের উপর গিয়া পড়ে, এই তাঁহার ইচ্ছা

ইব্রাহিম রোজ

(১৪৮ পৃষ্ঠা)
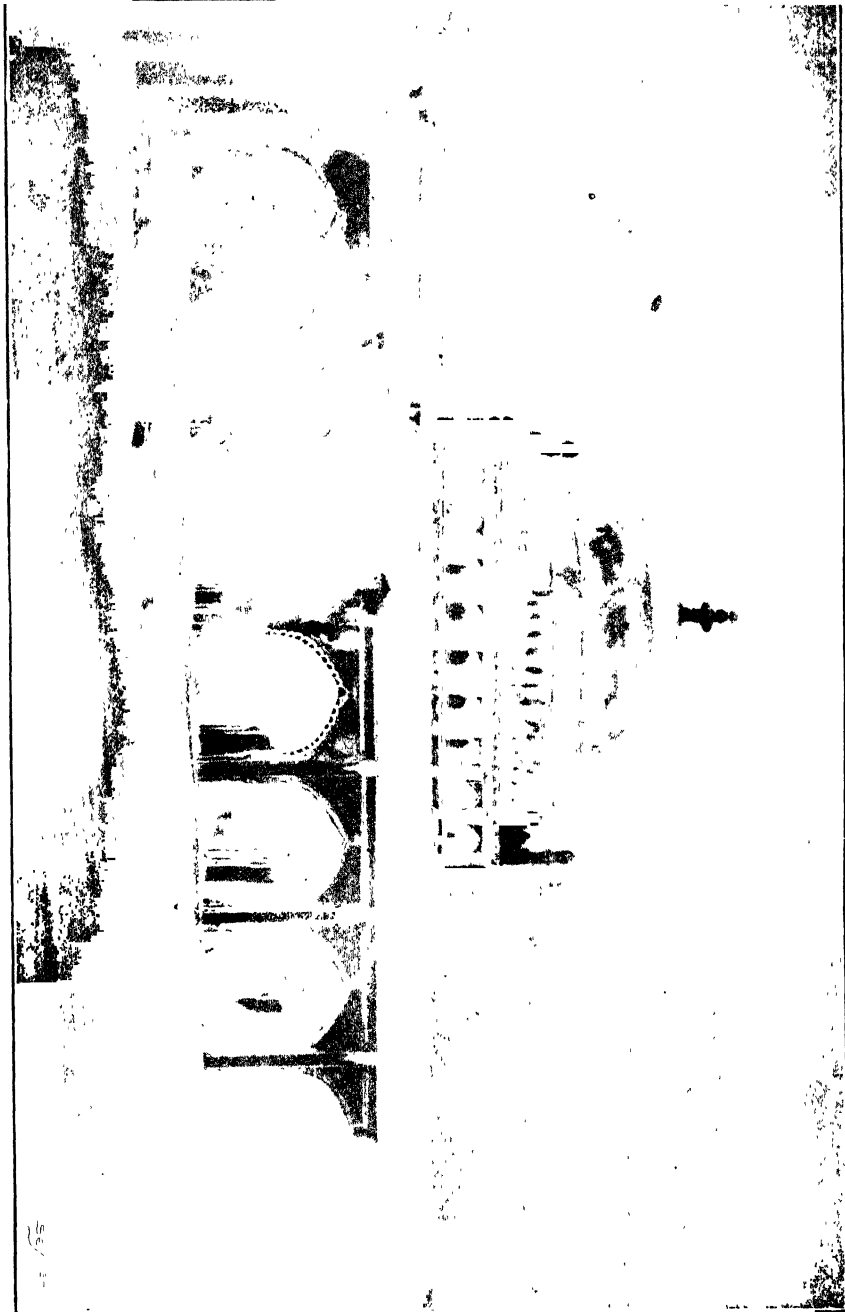
কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মন্দির প্রস্তুত হইতে না হইতেই রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন ও এই ভগ্নগৃহেই তাঁর সমাধি হয়। এই সমাধি মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "আলিরোজা।" কিন্তু মৃতহস্তীরও দাম লাখ টাকা; সেইরূপ ইহার ভগ্নমূর্ত্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে ইহা সত্য সত্যই গোলগুম্বজকে অতিক্রম করিয়া উঠিত—আলিও মনের সাধ মিটাইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় বিশ্রাম করিতে পারিতেন।

ইহার উত্তরে মক্কা ফটক হইতে কেল্লার পথ দুটি গোর মন্দিরে অলঙ্কৃত, তাহাদের পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ 'যমক বোন' নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় আলীর সচিবপ্রধান খাওয়াস খাঁ ও তাঁহার গুরু আবদুল খাদির এই দুই মন্দিরে শয়ান রহিয়াছেন। ইহাদের গোরগুলি ভিত্তি প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, গম্বুজগৃহ যেন বাসস্থানের জন্য নির্ম্মিত বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহার একটি গম্বুজ বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে, শ্মশানভূমির উপরে জীবন্ত মনুষ্য বাস করিতেছে।

যমকের অনতিদূরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। এই গোরের শ্বেতপাষাণ দিল্লী হইতে আনীত হয়, এরূপ প্রস্তর বিজাপুর অঞ্চলে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাটের কন্যার গোরস্থান। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শিবাজী রাজার দিল্লী প্রবাসকালে রাজকুমারী তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হন। শিবাজী মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করিলে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বাদসাহের কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনেকে উৎসুক ছিল কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অবিবাহিত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং বিজাপুর বিজয়ের তিন বৎসর পরে ঐ স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

গোরস্থান ভিন্ন মসজিদ অট্টালিকা অনেকানেক আছে—কতক ভাল কতক বা ভগ্নাবস্থায়, প্রাচীনের এই স্মৃতিচিহ্ন সকল যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। গোরের মধ্যে যেমন গোলগুম্বজ, মসজিদের প্রধান তেমনি জুম্মা মসজিদ।

দাক্ষিণাত্যে জুম্মা মসজিদের মত সুন্দর মসজিদ প্রায় দেখা যায় না। লালিত্য, শিল্প-কৌশল ও কার্য্যকারিতা ইহা সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার্হ। এ মসজিদ একজনের রচনা নহে। প্রথম আলি আদিল সা হইতে ঔরঙ্গজীব পর্য্যন্ত নৃপতিগণের হস্তচিহ্ন সকল ইহাতে বর্ত্তমান। প্রধান দ্বার দিয়া চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিবে তিন দিকে মসজিদের গৃহাবলী, প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি শুষ্ক ফোয়ারা। মসজিদের খিলান, স্তম্ভময় সুদীর্ঘ শালা, সুন্দর গুম্বজ, সুরঞ্জিত ভজনালয় (মেহরাব) সকলি চমৎকার। চকচকে

মেজের উপর এক একজন উপাসকের বসিবার আঁচড়কাটা আসন আছে, সে সকল গণনা করিলে দেখা যায় ইহাতে প্রায় ৪০০০ উপাসকমণ্ডলীর বসিবার স্থান সঙ্কুলান হয়। মেহরাবে কতকগুলি শিলা লেখ আছে, তাহার চারিটি বচন দিওয়ান হাফেজের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; অবশিষ্ট দুইটি লেখ হইতে জানা যায় যে, সুলতান মাহমুদের আদেশে তাঁহার ভৃত্য মালিক কাফুর কর্তৃক ১০৪৭ (১৬৩৬) অব্দে এই মেহরাব নির্ম্মিত ও অলঙ্কৃত।

আর একটি মসজিদ কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত—তাহাব নাম "মেহতর মহল"। ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দোতলার ছাদ এক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা সমতল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঠ বলা ঠিক হয় না, কেননা উহা প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহা বোঝা যায় না। পৃথিবী বাসুকীর পৃষ্ঠে—বাসুকির আশ্রয় কে? মেহতর মহলের ছাদ সম্বন্ধেও এই প্রহেলিকা,—ইংরাজ এঞ্জিনিয়রদেরও ধাঁদা লাগিয়া যায়। এই গৃহের শিল্পকার্য্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। পাথরের উপর ফল ফুল প্রভৃতি নানারকম নক্সা। ফরগসন সাহেব বলেন যে, অলঙ্কার ও শিল্পচাতুর্য্যে এই বাড়িটি মিশরের কায়রোর কোন বাড়ীর নিকট হার মানে না।

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দ মহলের সন্নিকট মক্কা মসজিদ। মক্কায় যে মসজিদ আছে তাহার আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া ঐ নাম। ইহা বেশ একটি সুন্দর ছোটখাট মসজিদ, ঠিক যেন একটি খেলানার জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত এবং মসজিদটি উন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত।

প্রাসাদের মধ্যে 'আসার মহল' অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহা সুলতান মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা আদালতের জন্য নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'আদালত মহল' অথবা 'দাদমহল' ছিল। আচ্ছাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে এক নূতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন ও ইহা কার্য্যান্তরে নিয়োজিত হয়। মহম্মদের শ্মশ্রুর দুইটি কেশ ইহার ভাণ্ডারজাত হওয়াতে ইহার পদোন্নতি হইয়াছে। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন উপদ্রব ঘটে নাই, মহম্মদের শ্মশ্রুর প্রসাদে সে অনেক বিঘ্নবিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। আসার মহল চতুষ্কোণাকৃতি, ১৩৫ ফুট প্রস্থ দ্বিতলগৃহ। দ্বিতীয় তলের একটি ঘরে মহম্মদের শ্মশ্রু রাখা হইয়াছে। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শন জন্য কেবল একবারমাত্র খোলা হয়—আর কতকগুলি ঘর কার্পেট, বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরাণো সামগ্রী সকলের ভাণ্ডার ঘর। এই

বাবদ ভবন
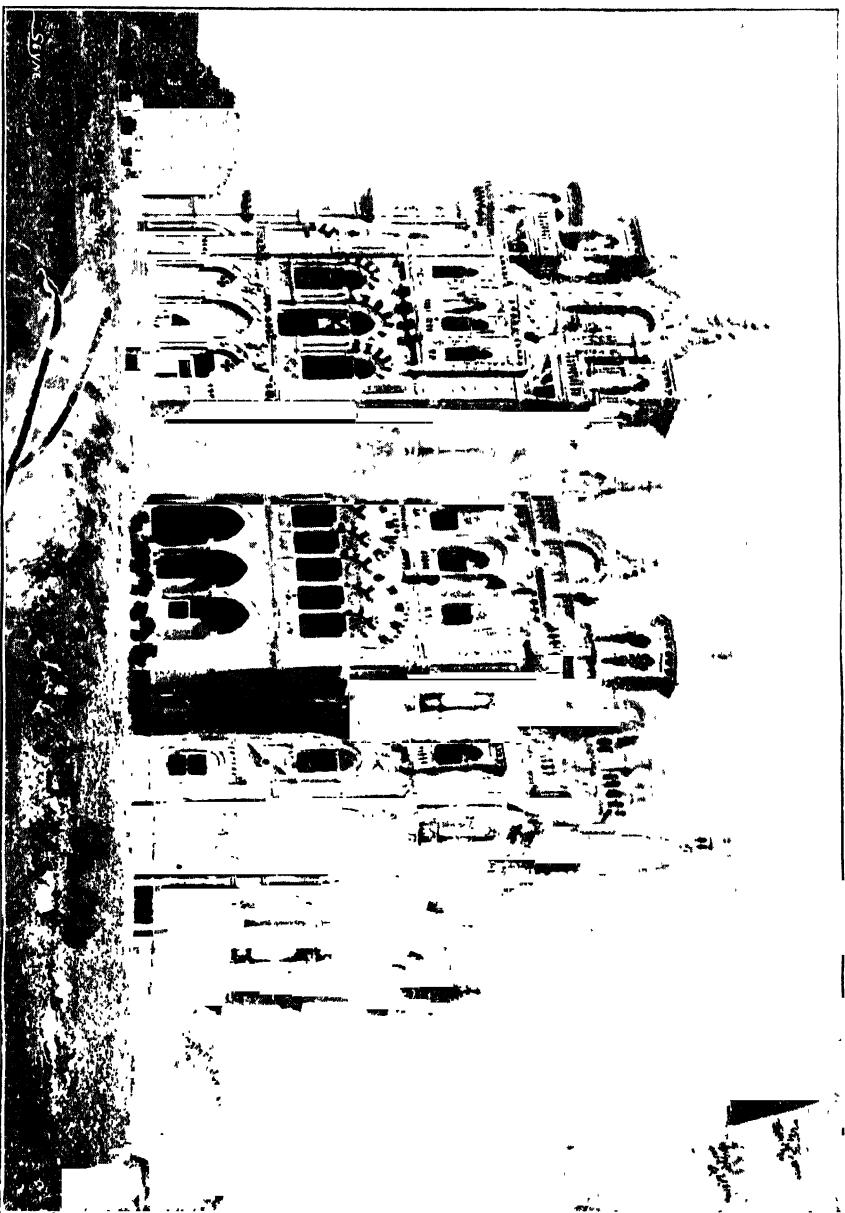
(১৩৯ পৃষ্ঠা)

সকল ঘরের প্রাচীর ও ছাদ বিচিত্র লতাপাতা ও মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের গায়ে মাহমুদ বাদশার ছবি মোগল সম্রাটের বর্ব্বর হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। আরো অনেকগুলি চিত্র কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আর্ক কেল্লা ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। এই কেল্লায় যে সকল বিশাল সুন্দর ইমারত একত্রীকৃত তাহার একভাগ চীন মহল। চীন মহলের সৌধমালা জজের আদালত, কলেক্টর মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে পরিণত হইয়াছে। এই মহলের এক কোণে এক সরোবরতীরে সপ্ততল প্রাসাদ (সাতমজলী) গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। "গগন মহল" রাজাদের দরবারশালা। তাহার সম্মুখে যে বিশাল খিলানদ্বার (arch) মুখব্যাদান করিয়া আছে তাহা বিজাপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খিলান। উদ্যানসংযুক্ত সুসজ্জিত "আনন্দ মহল" রাজাদের বিহারভবন ছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড তৃতলগৃহ। রাণীদের বায়ু সেবনের জন্য উপরে প্রশস্ত ছাদ—ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বাহিরের তামাসা দেখিবার সুবিধা। এই গৃহে কত সিঁড়ি, খুপরি খুপরি ঘর তাহার অন্ত নাই—বোধ হয় যেন ইহা রাজারাণী মিলিয়া লুকাচুরি খেলিবার জন্য নির্ম্মিত।

বিজাপুরে এইরূপ যে কত অট্টালিকা, কত কত গোর, গুম্বজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সবিস্তার বর্ণন করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, অতএব এইখানে শেষ করি। যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাতে যদি কাহারো কৌতূহল উদ্দীপন হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি একবার বিজাপুরে গিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া আসুন, এই আমার অনুরোধ।

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমরা যেন নিজ সহরটুকু বিজাপুর বলিয়া কল্পনা না করি। সহর অপেক্ষা সহরতলি ভারি, সহরের শাখা প্রশাখা অনেকদূর বিস্তৃত ছিল। আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতির বিবরণ শুনিতে পাই, সে সহর সহরতলি সবটা ধরিয়া। বিজাপুরের প্রান্তবর্ত্তী জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, সাহাপুর ইত্যাদি পুররাজির মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। এই সাহাপুর বিজাপুর মিলিয়া স্থান জুড়িয়া যে প্রদেশ তাহাই সাধারণভাবে বিজাপুর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহার মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ লোকের বসতি ছিল।

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজুলপুর সুবিখ্যাত আফজুল খাঁর বাসস্থান ছিল—সেই আফজুল খাঁ যিনি রাজা শিবাজীকে মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। গ্রামের কিয়দ্দূরে নবাব পরিবারের কতকগুলি গোর দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে এক লোমহর্ষণ গল্প আছে। গোরগুলি সকলি স্ত্রীলোকের গোর। এক লাইনে সাতটি গোর, এমন এগারো লাইন। সকলেরই আকার প্রকার প্রায় সমান। গল্পটা এই যে আফজুল যখন শিবাজীর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, তখন গণৎকারেরা গণিয়া বলে যে এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা, আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তাঁহাদের কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই গৃহ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার সপ্ত সপ্ততি বেগম ছিল, তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া পুকুরের ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন, এই ভাবিয়া তাহাই করিলেন। গল্পটা সত্য কি না ঠিক বলা যায় না, কিন্তু সারি সারি একই ধরণের এতগুলি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিজাপুর ছাড়িয়া এই এক নূতন রাজধানী পত্তনের সংকল্প করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশে ঐ স্থানে ১৬০০ অব্দে অনেক বড় বড় ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। স্থানটি গিরিকানন পরিবৃত, বিজাপুর অপেক্ষা দেখিতে সুদৃশ্য। ইব্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণৎকারের অন্তরায়। তাঁহারা তাঁহাকে রাজধানী পরিবর্ত্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আর সাহস করিলেন না। তাঁহার সে সংকল্প পরিত্যক্ত হইল।

বিজাপুরের সুখ সম্পদের পূর্ণাবস্থার মধ্যে এক একজন পরিব্রাজক আসিয়া বিস্ময়ানন্দ উচ্ছ্বাসে যে সহরবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সেকালের অবস্থা কতকটা অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে আসাদবেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আসাদবেগ লোকটা কে তাহা জানা আবশ্যক। ১৬০০ সালের প্রারম্ভে ইব্রাহিম আদল সা ও সম্রাট আকবর—ইঁহাদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। সেই উপলক্ষে সম্রাটের পুত্র রাজকুমার দানিয়েলের সহিত ইব্রাহিম স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে আসাদবেগ মোগল সম্রাটের দূত হইয়া বিজাপুর আসেন। তথায় সুলতান যথোচিত আতিথ্য সৎকার সহকারে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বহুমূল্য উপহার দিয়া তাঁহাকে রাজকুমারী সমভিব্যাহারে বিদায় করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তাও কন্যাযাত্রী দলে ছিলেন। এই সঙ্গে মোগল সম্রাটের জন্য বহুমূল্য মণি রত্ন ও বাছা বাছা হস্তী উপঢৌকন প্রেরিত হয়। এই বিবাহে রাজকুমারের নিজের ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভীমা তীর পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাত্রে এক প্রবল ঝড় উঠিল, তাম্বু কানাত ছিন্নভিন্ন হইল ও রক্ষকেরা ছড়িভঙ্গী হইয়া পড়িল। এই অবসরে রাজকুমারীও পলায়ন করিলেন। সকালে আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয় এবং আসাদবেগ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে পৌঁছিয়া দেন। এই আসাদবেগ বিজাপুর

বিজাপুরের অষ্ট বাদসা

(১৪৬ পৃষ্ঠা)

দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহর বর্ণনা এই ঃ—বিজাপুর প্রাসাদ অট্টালিকা-পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ নগর। বাজার ঘাট হস্ত প্রস্থ, দুই ক্রোশ বিস্তৃত। প্রত্যেক দোকানের সামনে এক একটি ছায়াতরু ও হাটবাজাব সকলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল দোকান যে সকল পণ্য সামগ্রীতে সজ্জিত, তাহা অন্যত্রে সচরাচর দেখা যায় না। গহনা, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মৎস্য মদ্য মাংস ফল মিষ্টান্নের ও অন্যান্য লোভনীয় জিনিসের দোকান, পান্থশালা, নাট্যশালা এই সকল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন--কোন স্থানে সহস্র সহস্র লোক নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদে রত, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, অবিরাম আনন্দ-ধারা; এরূপ সুচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়—মর্ত্ত্যে যদি কোথাও বেহস্ত্ (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা এই—

অগর বেহস্ত্ অন্দর জমীন হস্ত্
হমীনস্ত্ হমীনস্ত্ হমীনস্ত।
স্বর্গ যদি কেথাও থাকে মর্ত্ত্য ধামে,
সে তবে এইখানে এইখানে—এইখানে।

বিজাপুরের ইতিহাস

বিজাপুর-রাজ্য-সংস্থাপক য়ুসফ আদিল সা তুরস্ক সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৪৪৩ সালে তাঁহার জন্ম। সুলতান রাজবংশে একটিমাত্র পুত্রসন্তান জীবিত রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথানুসারে সুলতান মহম্মদ সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন —য়ুসফ তাহাদের মধ্যে একজন। য়ুসফের মাতা সন্তানেব প্রাণরক্ষার অনেক চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্দীন নামক জনৈক পারস্য বণিক স্তাম্বুল সহরে বাস করিতেন; তাঁহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থানে অপর একটি বালককে সাজাইয়া দিয়া য়ুসফকে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাঁহার জীবনরক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়া য়ুসফকে পারস্য দেশে লইয়া যান ও তাঁহাব বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানে তাঁহার জীবনরহস্য প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। অবশেষে অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর য়ুসফের স্বপ্ন হয় যে ভারতবর্ষ-প্রয়াণেই তাঁহার কল্যাণ,—সেই স্বপ্নানুসারে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে (রত্নগিরি) উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সতর বৎসর—তিনি রূপবান বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। জনৈক পারস্য বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাভোল হইতে বাহমন-রাজধানী বিদূরে গমন

করেন। তথায় রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়ানের অনুগ্রহে সৈনিকপদে নিযুক্ত হয়েন। সত্বর তাঁহার পদোন্নতি হইল। বিদুর হইতে বহ্রাডে গিয়া তিনি ১৫০০ অশ্বের অশ্বপতি ও আদিল খাঁ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহম্মদ গওয়ান তাঁহাকে দৌলতাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বাহমণী রাজার অধীনে তাঁহার কর্ম্ম হয়। ১৪৮৯ অব্দে তিনি অধীনতা-বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজপদবী গ্রহণ ও বিজাপুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮ অব্দে দক্ষিণ সুলতানেরা বাহমণী রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়া ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ য়ুসফের ভাগ্যে আইসে। যখন ভাস্কো-ডি-গামা ভারতবর্ষের নূতন পথ আবিষ্কারপূর্ব্বক কর্ণাটক-তীরে আবির্ভূত হন, তখন য়ুসফ বিজাপুরের অধীশ্বর। পোর্ত্তুগীসদের সঙ্গে গোওয়া লইয়া তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীসদের রাজপ্রতিনিধি আলবুকর্ক বিজাপুর বিপক্ষে বিজয়নগর রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকর্কের হস্তে বিজাপুর সৈন্যের পরাভব হওয়ায় গোওয়ায় পোর্ত্তুগীস রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

বিজাপুরে দুই শত বৎসরের মধ্যে নয়জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন; কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। সে কাল সুখশান্তিভোগের কালই নহে। ঘোর উপদ্রব—তুমুল বিপ্লব - গভীর অশান্তির মধ্যে তাঁহাদের রাজত্ব করিতে হইত। হয় বৈরী নির্য্যাতনের চেষ্টা, নয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তন—ইহাতেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইত। সিয়া ও সুন্নী মুসলমানে যুদ্ধ—প্রতিবাসী সুলতানদের সহিত যুদ্ধ—বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ধ—মোগলের সহিত যুদ্ধ—এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বিজাপুর রাজারা কখন্ যে রাজ্যশাসনে রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাইতেন তাহা ভাবিয়া ওঠা যায় না।

য়ুসফ আদিল সা পারস্যে বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া সিয়া ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় রাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়। তাঁহার সেনাদের মধ্যে তুর্কজাতীয় অনেক সুন্নী মুসলমান ছিল, আর প্রতিবাসী সুলতানেরাও এই নূতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই সূত্রে যে যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদূরের সুলতানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে পর য়ুসফ অনেক কষ্টে এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গোঁড়া সিয়া ছিলেন না—স্বরাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্নীদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ নিষেধ করিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত ছিল। তিনি বলিতেন, "যেমন স্বর্গের নানা নিকেতন, তেমনি ইসলামের নানা সম্প্রদায়।" হিন্দুদের উপর তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল,

সোলাপুর দুর্গ
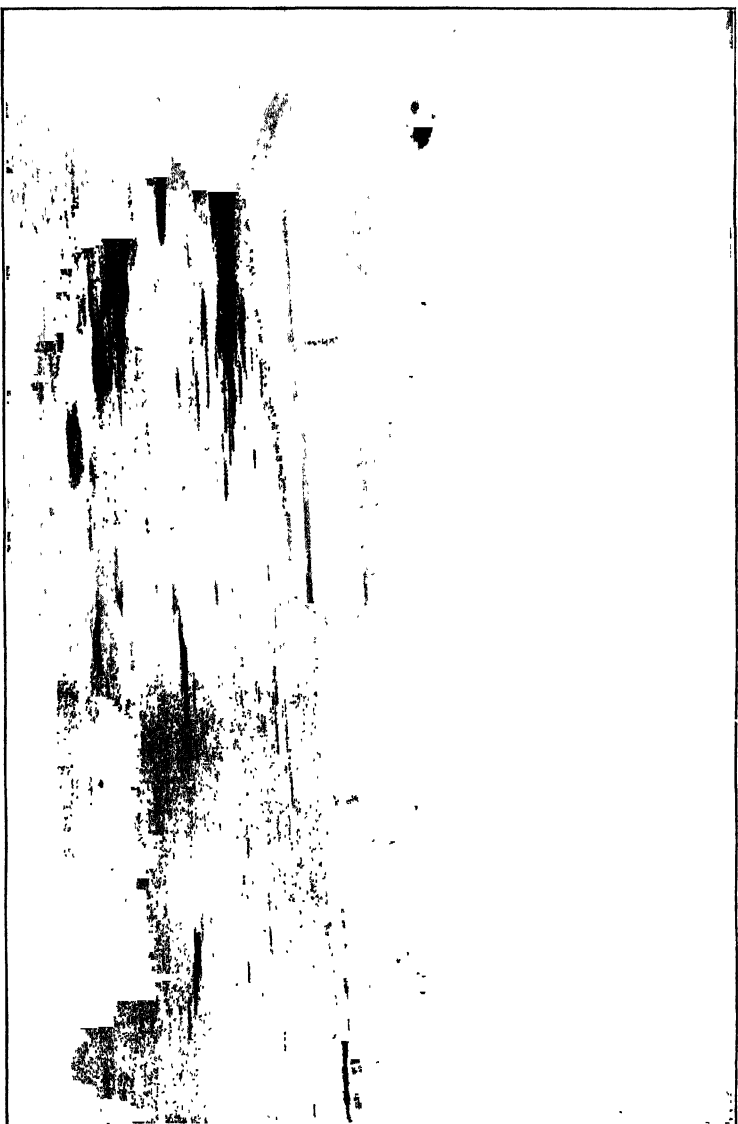
(১৪০ পৃষ্ঠা)

তিনি একজন মারাঠী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দু জাতির সহিত সহানুভূতির পরিচয় দিলেন।

মারাঠী মহিষীর গর্ব্তে তাঁহার এক পুত্র জন্মে—নাম ইস্মায়েল। য়ুসফের মৃত্যুর পর ইস্মায়েল আদিল সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। রাজ্যাভিষেক কালে তিনি সিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কমাল খাঁ সুন্নী। রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। মন্ত্রীর মতলব স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুন্নীধর্ম্ম প্রত্যানয়ন করেন।

বালক সুলতান ও তাঁহার মাতা, কমাল খাঁ কর্তৃক প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। মন্ত্রী স্বয়ং বলপূর্ব্বক রাজ্যলাভেব অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণৎকারেরা গণিয়া বলিল এখনো সময় হয় নাই, তাই তিনি নিজ গৃহে শুভলগ্ন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহার পুত্রের সমূহ সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া একজন বিশ্বাসী তুর্ককে কমাল খাঁ বধে নিযুক্ত করিলেন। তুর্ক মক্কাযাত্রীর ভান করিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। মন্ত্রী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর যেমন তুর্কের হাতে পান দিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি সে তড়িতের ন্যায় ত্বরিতে লুক্কায়িত খড়্গ বাহির করিয়া মন্ত্রীর বুকে বসাইয়া দিল; মন্ত্রীর অনুচরেরাও সেই দণ্ডে তুর্ককে কাটিয়া ফেলিল। মন্ত্রী ও তাঁহার হন্তা দুজনেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইলেন।

মন্ত্রীর মাতাও সুলতানা সদৃশী সাহসিকা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র হারাইয়া আপন পৌত্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার পুত্র কমাল খাঁ মরেন নাই, আহত হইয়াছেন মাত্র। মৃতদেহ বসন ভূষণে সাজাইয়া বারান্দায় পালঙ্কের উপর শোয়াইয়া রাখিলেন—যেন লোকেদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে রীতিমত বসিয়া আছেন। এদিকে সফদর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে চলিলেন।

রাজ্ঞীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দিলসদ নামক রমণী তাঁর সখী এবং তিনি নিজে যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ঘরে লোকজন বড় বেশী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে একদল সিয়াপক্ষপাতী সৈন্যের প্রবেশ লাভে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইল। সফদর খাঁ তাঁহার সুন্নীদের লইয়া যেমন প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন, অমনি উপর হইতে তাহাদের উপর গোলাগুলি প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সিয়া সুন্নীদের ঘোরতর সংগ্রাম। অনেকে হত ও আহত হইয়া পড়িল, পরিশেষে সফদর খাঁ দরজা ভেদ করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে একবাণে তাঁর নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই প্রাচীরের উপর বালক সুলতান উপবিষ্ট। শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইস্মায়েল এক

বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা সফদার খাঁর মাথায় পড়িয়া তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইস্মায়েল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইস্মায়েলের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্য-রাজা তাঁহার সম্মানার্থে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন।

ইস্মায়েলের পুত্র মল্লু তাঁহার উত্তরাধিকারী। মল্লু উগ্রচণ্ড দুরন্ত নরপতি ছিলেন। রাজ্য উচ্ছন্ন যায় দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ দেন। ছয় মাস রাজত্বের পর মল্লু অন্ধীকৃত বন্দীকৃত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন। সুন্নীদের মানবর্দ্ধন, সিয়াদের নির্য্যাতন ও অপদস্থ করা, এই তাঁহার কাজ; এমন কি, অনেক সিয়া মুসলমান তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া বিজয়নগর রাজার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অমিতাচারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার রোগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাজচিকিৎসকের মুণ্ডচ্ছেদ ও হস্তী পদমর্দ্দনে প্রাণদণ্ড হয়।

ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরে ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ত্রিংশবৎসর পরে হক্কা ও বুক্কা দুই ভাই শৃঙ্গিরি মঠাধিপতির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর পত্তন করেন। ১৩৩৫ সালে হক্কা হরিহর রায় নামে বিজয়নগরে রাজা হইয়া মুকুট ধারণ করেন। ঐ সময়ে আবার হসন গাঙ্গু নামক জনৈক পাঠান আল্লাউদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের সূত্রপাত করেন। হসন গাঙ্গু একজন ব্রাহ্মণ গণক ঠাকুরের উপকার ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি "বামণ" পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশ "বাহমণী" বলিয়া বিখ্যাত। বিজয়নগর ও বাহমণী সুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। বিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাঁড়াইলে সেও বিজয়নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম বাদসাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা। তিম্মা নামে তাঁহার মন্ত্রী ছিল। দেবরায়ের মৃত্যুকালে তাঁহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিম্মা একজন বালক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবনপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিয়া আর একটি বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয়;—এইরূপ উপর্য্যুপরি তিনজন বালক রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিম্মা দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রামরায়ের বিবাহ দিয়া রামরায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমূলে নির্ম্মূল করা তিম্মার অভিপ্রায়। সে
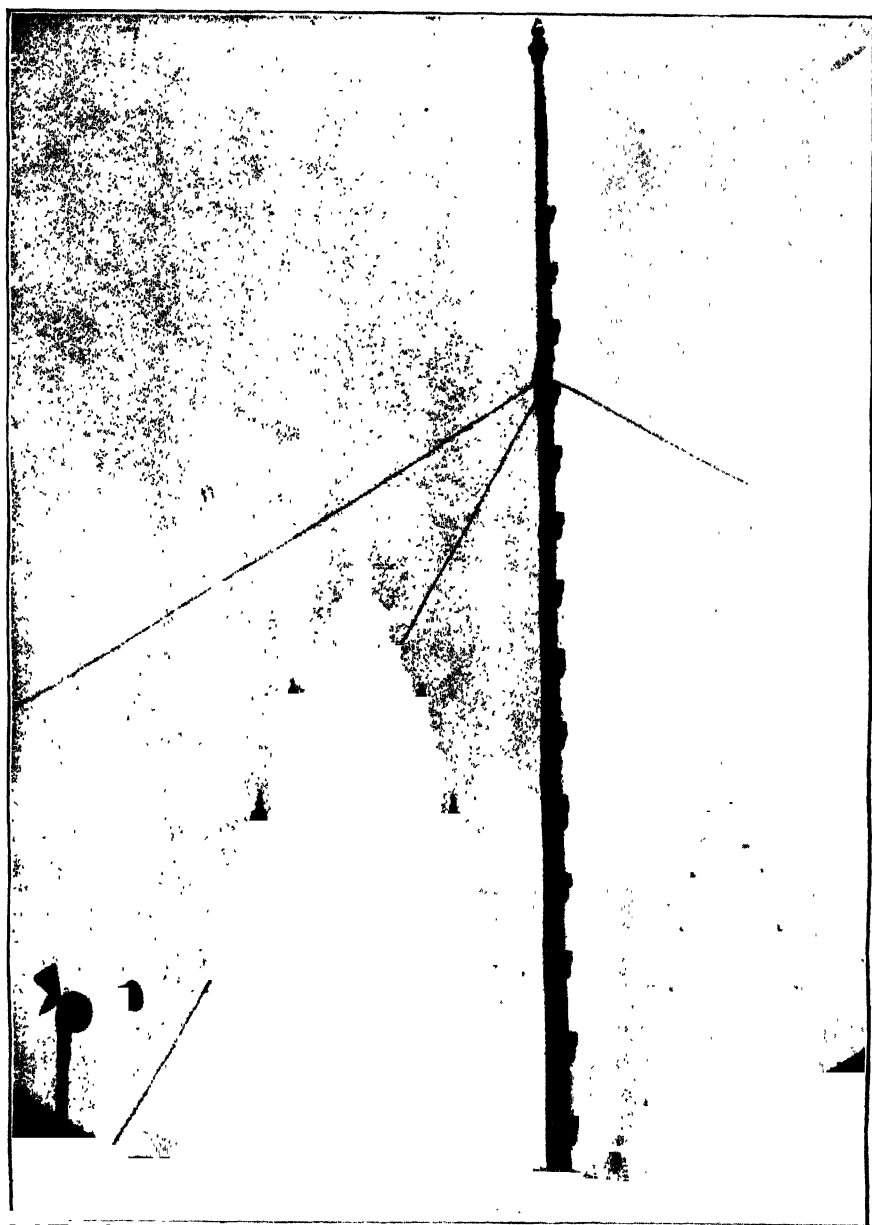
বিঠোবা মন্দির

(১৪৪ পৃষ্ঠা)

অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হইল। কেবল তির্ম্মল নামক একজন আধপাগলা জানোয়ার আর কন্যাকুলের একটি রাজকুমার এই দুই রাজবংশধর অবশিষ্ট রহিল।

রামরায় অবাধে রাজ্য লাভ করিলেন কিন্তু নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। রাজপদ পাইয়া তিনি প্রগল্‌ভ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রজারা তাঁহার উপর চটিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল—তাহারা বলিতে লাগিল, ইনি কোথাকার জালরাজা, আমরা একজন খাঁটি রাজা চাই। রামরায় বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট রাজকুমারটিকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে তাঁহার অরিকুল ধ্বংস করিয়া রাজাকে সরাইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও রাজ্যের শান্তি হইল না। এদিকে আবার আধপাগলা তির্ম্মল গোলযোগ আরম্ভ করিল, তাহারও রাজা হইবার চেষ্টা। তির্ম্মল ও রামরায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। অনেকে রামরায়ের পক্ষ হইয়া তির্ম্মলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। তির্ম্মল এই সঙ্কটে বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিমকে অনেক ধনরত্ন উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ইব্রাহিম আহ্লাদের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকারপূর্ব্বক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন, তির্ম্মল তাঁহাকে স্বাগত বলিয়া বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবনরাজের হস্তক্ষেপ সকলেরই অসহ্য হইল। রামরায় ও তৎপক্ষীয় লোকেরা তির্ম্মলকে সুলতান বিসর্জ্জনে অনুরোধ করিল—বলিল, আমাদের কথামত কাজ করিলে আমরা চিরকাল আপনার অনুগত ভৃত্য হইয়া থাকিব। তির্ম্মল আশ্বাস পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়া অনেক কষ্টে ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানেরা যেমন কৃষ্ণা পার হইল প্রজারাও আপনাদের বচন ভুলিয়া দাঁত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তির্ম্মলকে ধরিতে আসিতেছে। এই সংবাদে তির্ম্মল একেবারে অধৈর্য্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। অশ্বগজের চক্ষু উৎপাটন, রাজবাটীর গহনাপত্র জাঁতায় পিষিয়া চূর্ণীকরণ, এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শত্রুরা রাজভবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যা করিয়া বিপদ-রাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামরায় এখন নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন—তাঁহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সঞ্চার হইল।

এদিকে ইব্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল খাঁ বিজাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতাবন্ধন করেন। হিন্দু মুসলমানদের

এরূপ মিলন আর কখনও শুনা যায় নাই। রামরায়ের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়-নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিজয়নগরের রাজা ও রাণী আলিকে পুত্ররূপে বরণ করেন। আহমদনগরের সহিত আলির যখন যুদ্ধ হয়, তখন রামরায় বিজাপুর স্থলতানের সহায়তা করেন।

হিন্দুদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানের পর রামরায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া যবনরাজ্য তৃণবৎ দেখিতে লাগিলেন—মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর নাই। মুসলমানদের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। মসজিদে ঘোড়ার আস্তাবল, তাহাদের ধর্ম্মের অপমান। তখন স্থলতানেরা চটিয়া উঠিয়া প্রগল্ভ হিন্দুরাজাকে দমন করিতে কটিবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া বিদুর ও আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই চতুঃস্থলতান বিজাপুরে আসিয়া একত্র হইলেন। তথা হইতে চারি স্থলতান বিজয়নগরের উপর হল্লা করিতে কৃষ্ণানদী পার হইলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখেন রামরায়ের সৈন্যদল পরপারে সম্মিলিত। নদীর ঘাট সুরক্ষিত, পারাপার বন্ধ। স্থলতানেরা এক ফন্দী করিলেন। তাঁহারা নদীর কিনারা দিয়া কতকদূর চলিয়া গেলেন, যেন পার হইবার অপর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্বস্থান ছাড়িয়া পরপারে শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিতে লাগিলেন। তিন দিন এইরূপ চলিল। তৃতীয় রাত্রে স্থলতানেরা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা রামরায়ের সৈন্যের পাঁচ ক্রোশ দূরে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

প্রভাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। উভয়েই বন্দুক কামান ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। হিন্দুরা মহারোষে আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল কিন্তু মধ্যভাগ অটল। মধ্যভাগের নেতা আহমদনগরের 'দিওয়ানা' স্থলতান হুসেন নিজাম সা শীঘ্রই রামরায়ের সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কামান ছিল তাহাতে পয়সা পুরিয়া হিন্দুদের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন—সেই মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দুসৈন্যের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটিল। ক্রমে হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রামরায় তাহার পালকীতে উঠিয়া বেহারাদের দূরে যাইতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ খানিক দূরে গিয়া পালকী রাখিয়া পলায়ন করিল। রামরায় অশ্বারোহণে পলায়নোদ্যত, এমন সময়ে ধৃত হইয়া হুসেন সার সমক্ষে আনীত হইলেন। হুসেন সা তাঁহার 'দিওয়ানা' পদবীর উপযুক্তরূপ কার্য্যকরতঃ মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম দিলেন—তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। স্থলতানের অনুচরেরা রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রাজার এই দশা দেখিয়া হতাশ্বাসে পলায়ন

পুণ্ডলীক মন্দির ও চন্দ্রভাগা নদী

পৃষ্ঠা
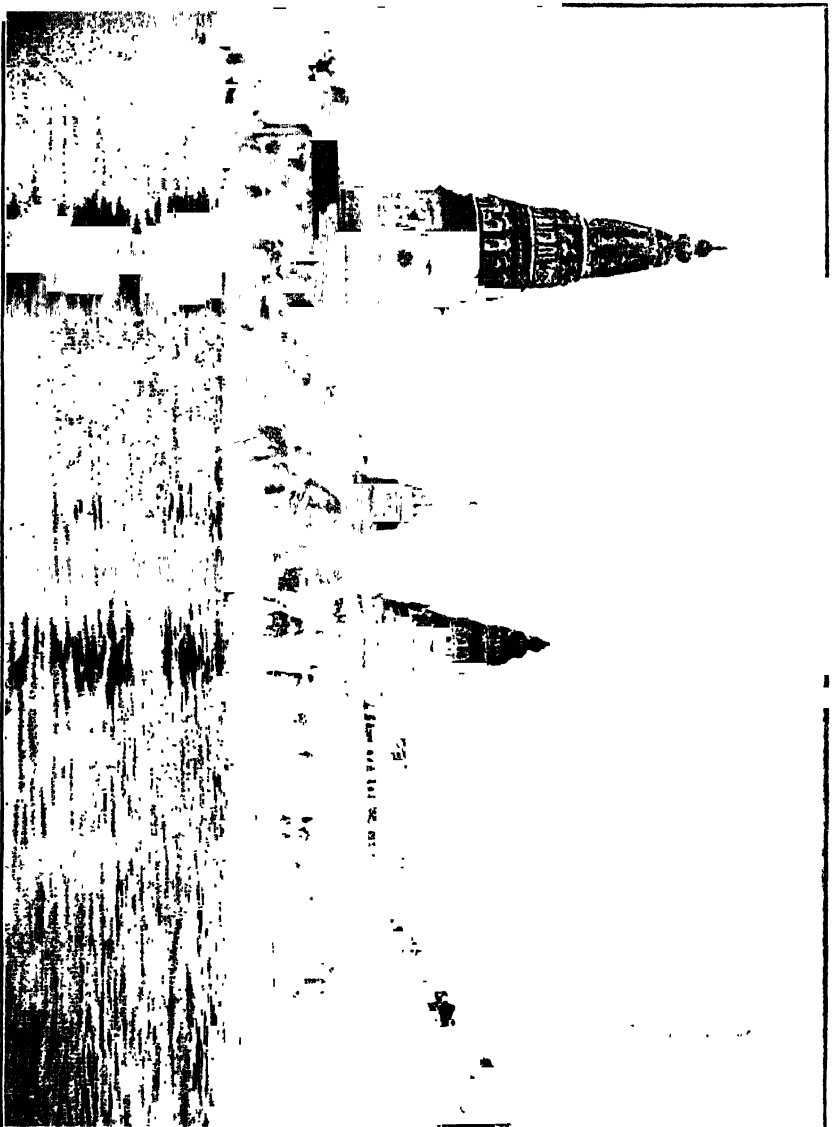
পরায়ণ হিন্দুসৈন্যগণের পশ্চাতে মুসলমানেরা ধাবমান হইয়া তাঁহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুপক্ষের লোক মিলিয়া সমরক্ষেত্রে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ সেনার সম্মিলন হয়। হিন্দুসৈন্য বিস্তর মারা পড়ে এবং বিজয়ীদের লুণ্ঠন-জাত প্রচুর ধনরত্ন লাভ হয়। অতঃপব বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগবে প্রবেশপূর্ব্বক নগরমধ্যে জয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেখানকাব লুটপাটেব ব্যাপাব বর্ণনাতীত। নগরের বাড়ী ঘর দুয়ার লণ্ডভণ্ড—হিন্দু কীর্ত্তির চিহ্ন সকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড জয়স্তম্ভস্বরূপ আহমদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা বিজাপুরে স্থাপিত হয়। এই প্রস্তর মুণ্ড আর্ক কেল্লায় সেদিন পর্য্যন্ত অনেকে দেখিয়াছেন। তালিকোটের যুদ্ধেই বিজয়নগবের ধ্বংস। এই যে তাহার পতন হইল আর তাহার উত্থানশক্তি রহিল না। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য চিরকালের মত প্রলয়সাগরে ডুবিয়া গেল।

১৫৮০ অব্দে আলির মৃত্যু হয়। ইমারত নির্ম্মাণে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। জুম্মা মসজিদ, তাজ, বাউড়ী, সহরের প্রাচীর, জলপ্রণালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাঁহার সময়কাব। ইহার রাজত্বেব শেষভাগে দিল্লীশ্বর আকবর প্রেরিত কয়েকজন দূত বিজাপুরে আগমন করেন, তাঁহাদের কি গূঢ় অভিপ্রায় ছিল প্রকাশ পায় নাই। মোগলের গুপ্তচরেরা বিজাপুরের উপর সেই যে শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল, অচিরাৎ তাহার গরল ফল ফলিত হইল।

আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতৃব্যের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। তাঁহার নাবালক অবস্থায় আলির মহিষী চাঁদবিবি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কমাল খাঁ সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিদ্রোহ চেষ্টা প্রকাশিত হওয়াতে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। তাঁহার পরে কিশোর খাঁ প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া চাঁদবিবির শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ও ছলে বলে কৌশলে রাজ্ঞীকে সাতারার দুর্গে নির্ব্বাসিত করিলেন। মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অত্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। চাঁদবিবি স্বপক্ষীয় সৈন্য সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হইলেন, কিশোর খাঁ প্রাণভয়ে পলায়নানন্তর গোলকুণ্ডার একজন হন্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অতঃপর মন্ত্রী দিলাবর খাঁ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইল। তিনি আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং গোলকুণ্ডা-সুলতানের ভগিনী চাঁদ সুলতানার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিয়া দিলেন। দিলাবর খাঁ ইব্রাহিম বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। মন্ত্রীর অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহাকে

পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যবিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৫৯৪ সালে তাঁহার ভ্রাতা ইস্মায়েল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোগে আহমদ-নগর সুলতান বহ্রান নিজাম সা বিজাপুব আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হইল না; প্রত্যুত এই যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যনাশের মূল। যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরে বহ্রানের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রও রণক্ষেত্রে বিজাপুব সৈন্য হস্তে নিহত হন; আহমদনগরে ঘোর বিপ্লব বাধে।

বহ্রান নিজাম খাঁর মৃত্যুর পর আহমদনগব দুই দলে বিভক্ত হয়, চাঁদবিবি তন্মধ্যে এক দলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেককাল অন্বেষণ করিতে-ছিল, তাহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সম্রাটের আবেদনে ক্রমে মোরাদ আহমদনগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন। মোগল আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী চাঁদবিবি। তিনি কবচ ধারণপূর্ব্বক তরবার হস্তে স্বয়ং দুর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহদান ও দুর্গরক্ষণের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; ইব্রাহিম আসিলেন বটে কিন্তু সময় মত আসিতে পারেন নাই। যখন আসিলেন তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। চাঁদবিবির যত্ন ও চেষ্টায় মোগলেরা প্রথমবার অল্পে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়। যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বহ্রাড় প্রান্ত (Berar) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদবিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। এবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিলেন তখন আর শত্রু-হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু, তাহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ; উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলদের সহিত সন্ধি সাধনের উদ্যোগ দেখিতেছেন এমন সময় সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন বিদ্রোহী সৈনিকের খড়্গাঘাতে রাণী প্রাণ হারাইলেন;—তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রুর হস্তে নিপতিত হইল। চাঁদবিবি ভারত-বীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন; দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নাম ও যশ চিরস্মরণীয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম শিল্পবিদ্যাবিশারদ সুশিক্ষিত সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। মহারাষ্ট্রী ও পারস্য ভাষামিশ্রিত ব্রজভাষা সদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্মের
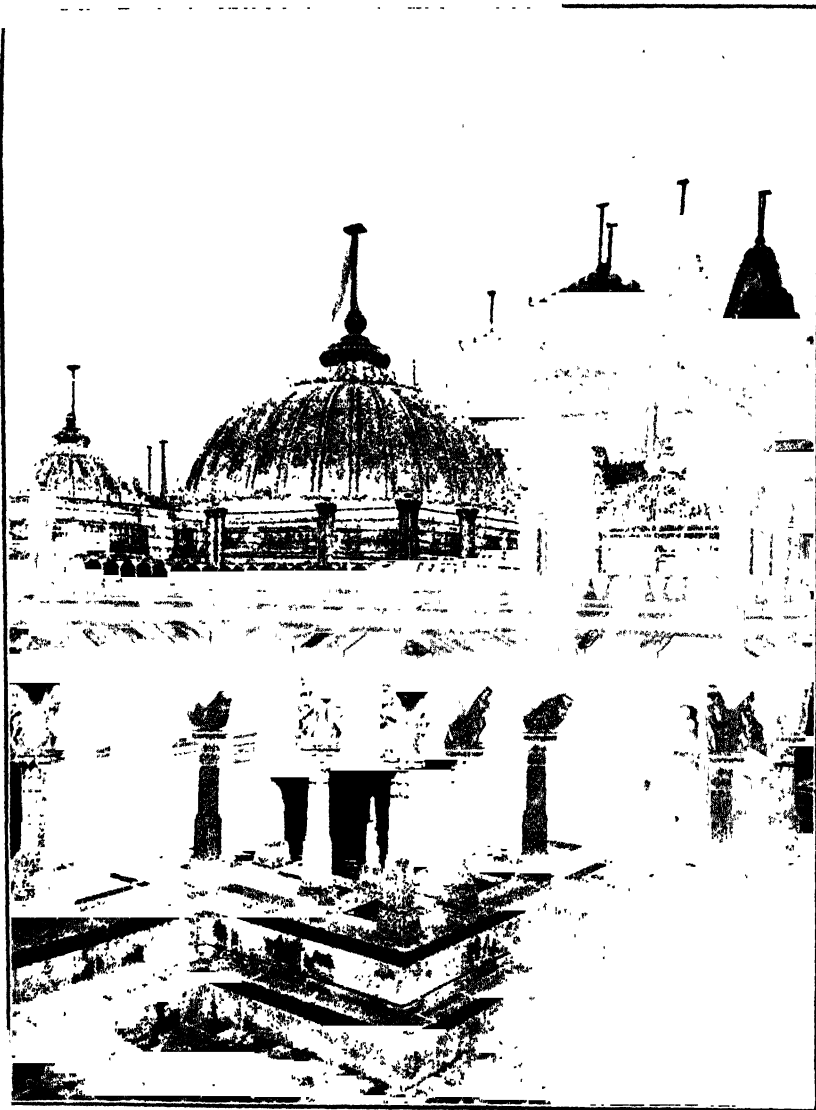
জুম্মা মসজিদ—আহমদাবাদ (১৬৭ পৃষ্ঠা)

প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্‌গুরু তাঁহার আখ্যা—লোকে তাঁহাকে ইব্রাহিম জগদ্‌গুরু বলিয়া মানে। বিজাপুর মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সময়কার কোন কোন দলিলের উপর "শ্রীসরস্বতী প্রসন্ন" শিরোনামা দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজাপুরের পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থা—রাজভাণ্ডার পূর্ণ—প্রজাগণ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন—দুই লক্ষ পদাতিক ৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যবল।

ইব্রাহিমের পর মাহমুদ আদিল সা। মাহমুদের রাজত্বকাল চল্লিশ বৎসর। ইনি যুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন না, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাপী, সরোবর, জলপ্রণালী সমস্ত রচিত হইয়া সহরের জলসৌকর্য্য সম্পাদিত হয়। জুম্মা মসজিদের সুবর্ণরঞ্জিত ভজনালয় তাঁহার রচিত। বিপুল কাষ্ঠস্তম্ভাবলম্বিত উচ্চ ছাদ, চিত্রিত প্রকোষ্ঠসমন্বিত আসার মহল তাঁহারই কীর্ত্তিস্তম্ভ। আর বিজাপুরের বিশেষ ভূষণাস্পদ যে গোলগুম্বজ তাহা তাঁহারি সুযোগ্য সমাধি মন্দির।

শিবাজী

মাহমুদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পিতার সর্ব্ববাদিসম্মত রাজভক্তির আড়ালে এবং মাতার উৎসাহবাক্যতলে তিনি এক একটি করিয়া পাহাড় দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন বিজাপুর রাজার হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত প্রদেশ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ১৬৪৬ সালে পুনার নিকটবর্ত্তী তোরণা দুর্গের অধিকার ও তন্নিহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোকনস্থ কল্যাণ হইতে বিজাপুরে রাজস্ব লইয়া এক দল লোক আসিতেছিল, শিবাজী সে ধন লুণ্ঠন করিলেন এবং ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিয়া রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সকল কাণ্ড দেখিযা রাজা তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। সাহাজী তখন কর্ণাটকে—তাঁহাকে বিজাপুরে আনাইয়া জেলখানায় বন্ধ করিয়া বলা হইল যে, তাঁহার পুত্র যতদিন ধরা না দেন ততদিন তাঁহার মুক্তিলাভ নাই। শিবাজী মোগল সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া অনেক কষ্টে পিতার মুক্তিসাধনে কৃতকার্য্য হয়েন ও আবার পূর্ব্ববৎ লুটপাটে রাজ্যবৃদ্ধি করিবার সন্ধি লাভ করেন। মাহমুদের রাজত্বকালে শিবাজীর এই কাণ্ড।—দ্বিতীয় আলি আদিল সার সময়ে তাঁর দৌরাত্ম্য ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মোগল ও

মহারাষ্ট্রীদের উপদ্রবে বিজাপুরের মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। ১৬৫৪ অব্দের পূর্ব্বে শিবাজী বিজাপুরের অধীনস্থ অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ এবং কায়েম করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দমন করিবার ভার বিজাপুর সেনাপতি আফজুল খাঁর হস্তে সংন্যস্ত হয়।

আফজুল খাঁ

আফজুল খাঁর যুদ্ধযাত্রার পরিণাম জানাই আছে। ঘটনাটি গ্রাণ্ট ডফের মারাঠী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত :—

আফজুল শিবাজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পদাতিক ৫০০০ ঘোড়সওয়ার ও কামান অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া মহা আড়ম্বরে কুচকরতঃ প্রতাপগড় পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। শিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত, প্রতাপ-গড়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ধার্য্য হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাঁহাদের সম্মিলনে অন্য লোকজন উপস্থিত না থাকে। নবাব সাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া সৈন্যসামন্ত পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটি মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পা ফেলিতে দেখিয়া নবাব সাহেব তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে বাঘনখ প্রচ্ছন্ন ছিল, কোলাকুলির সময় সেই গুপ্তাস্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করেন ও ভবানী খড়্গাঘাতে কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সৈন্যগণ ঝোপ ঝাপ অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবাব-সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদের ছারখার করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূল পত্তন করিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার পরেও বিজাপুরের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু যুদ্ধে হারাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক স্থানে যদি পরাজিত হন, অমনি অপর স্থানে ফুঁড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে বিজাপুর রাজা হার মানিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। শিবাজী যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় কোঙ্কনতীর ও ভীমা হইতে বর্ণানদী পর্য্যন্ত ১৩০ মাইল দীর্ঘ ও ১০০ মাইল প্রস্থ সহ্যাদ্রির উত্তরস্থ ভূমিখণ্ড। সুদ্ধ তাহা নহে, শেষে এমন হইল যে শিবাজীর বর্গী নিষ্পীড়িত চৌথাই-কর হইতে অব্যাহতি লাভের
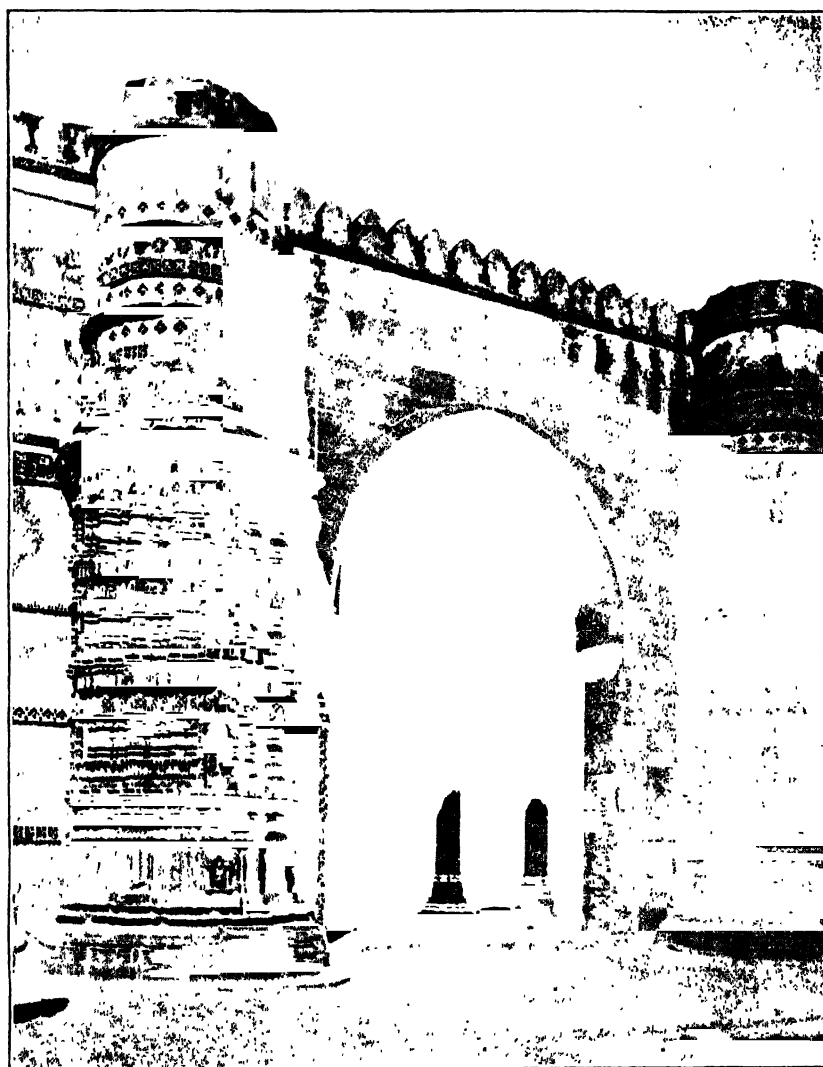
জুম্মা মসজিদের এক অংশ—আহমদাবাদ (১৬৭ পৃষ্ঠা)

জন্য বিজাপুর তাঁহাকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ঘুস দিতে প্রতিশ্রুত হইল। মারাঠীগণের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও বিজাপুরের শান্তি নাই। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। আলি যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু দেখিলেন যে দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ মোগলদের হস্ত হইতে তাঁর রাজ্যরক্ষা করা সুকঠিন। দুই বৎসর পরে মোগল সম্রাটের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ভীমা নদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত হইল। ১৬৭২ অব্দে ১৬ বৎসর বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ রাজত্বের পর দ্বিতীয় আলি আদিল সা ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

আলির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সেকন্দরের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর। সেকন্দর আদিল সা বিজাপুরের শেষ সুলতান, ইহার রাজত্বকালে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করেন।

অনেক দিন হইতে বিজাপুর বিজয়ে তাঁহার সাধ। যদিও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই, তাঁহার সেনাপতিগণ বারম্বার বিফল-প্রযত্নে বিজাপুরের দ্বার হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি সে চিরপোষিত রাজ্যলোভ নিরস্ত হইবার নহে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ বিজয় উদ্দেশে অসীম সৈন্যসামন্ত সমভি-ব্যাহারে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—সেই যে দিল্লী ছাড়িলেন আর ফিরিবার অবকাশ পাইলেন না। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৩ বৎসর—তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পথে পথে তাম্বুতে তাম্বুতে অতিবাহিত হইল। অনেক যুদ্ধে তিনি দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল জয় করিলেন বটে কিন্তু মারাঠীদের দমন চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত বলহানি, সমস্ত আয়ুক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ৬৯ বৎসর রাজত্বের পর অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থা! অতীতের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর, ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী, উৎপীড়িত হিন্দুরাজগণ প্রতিপীড়নে সমুদ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ সুলতানদের সহিত মিলিয়া মহারাষ্ট্রীদের দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিন্তু দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল গ্রাস করিয়া সে পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে প্রলয়ের বীজ বপন করিয়া গেলেন—অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্নচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কারেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ঔরঙ্গজেবের ক্যাম্প দেখিতে যান, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটের চালচলন ও যুদ্ধপ্রবাসের কতক আভাস

প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারেরি রাজদরবারে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঔরঙ্গজেব কৃশাঙ্গ, খর্ব্বকায়, বৃহন্নাসা, বয়োভারে অবনত, শুভ্রবেশ পরিহিত ও মুক্তাজড়িত জরির কিরীট বিভূষিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্রাট। তাঁহার শ্যামমুখে শুভ্র দাড়ী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরবার-তাম্বুর মধ্যে সুরঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন—চারি কোণে চারিটি রজত স্তম্ভ—উঠিবার একটি রূপার পাদপীঠ। সম্রাট এই সিংহাসনে উপবিষ্ট, আমীর সভাসদেরা তাঁহার আশে পাশে বিনম্রভাবে উপবিষ্ট—দুইজন ভৃত্য চামর ব্যজন করিতেছে, আর একজন ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। সম্রাট সহাস্যবদনে নিজহস্তে প্রজাদের আর্জী সকল গ্রহণ করিতেছেন—বিনা চসমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে হুকুম লিখিতেছেন। কারেরি বলেন সম্রাটের সঙ্গে সৈন্যবল দশ লক্ষ পদাতিক—অশ্ব ৬০,০০০, মালবহনের জন্য ৫০,০০০ উষ্ট্র আর হাস্তী ৩০০০; সেনানিবাস ত্রিশ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন ব্যাপারী দোকানদার কারিগর কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়া জনসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে; নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সকল প্রকার সামগ্রীসমাকীর্ণ সম্রাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জঙ্গম পুরী বলিলেই হয়। হাট বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচরবর্গের জন্য প্রত্যেক আমীরের আলাদা আলাদা হাট বাজার। সম্রাট ও রাজাদের তাম্বু প্রায় তিন মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে সুরক্ষিত; তীর ধনুক বর্ষা তরবার পিস্তল বন্দুক—গুরু ও লঘু কামান এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোর্ত্তগীস ওলন্দাজ জর্ম্মন ফরাসিস্ প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত। বিদেশীগণ একবার মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাড়িবার পথ পায় না—পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই এক দৃশ্য আর মারাঠী সেনাদের ধরণ দেখ। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনা—তাহাদের কোন নিয়ম নাই, বন্দেজ নাই—পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়ত কোন বিজন প্রদেশে সম্মিলিত। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খোরাক; ঘোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল পুরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত—দিবসে গাছতলায় কিম্বা কম্বলের আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম—রৌদ্রের উত্তাপে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বাঁধা এবং অশ্বের সামনে ভূমিখনক এক একটি বল্লম। এই সব সামান্য সরঞ্জাম লইয়া মারাঠী বীরেরা যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইতেন, মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। অনেক বৎসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট আপনার ক্যাম্পেই বন্দী হইয়া পড়িলেন, মহারাষ্ট্রী সেনাগণ মুমূর্ষু সম্রাটের চতুর্দ্দিকে বীরদর্পে নৃত্য করিতে করিতে মোগলদের নাজেহাল পিশেহাল করিয়া তুলিল।
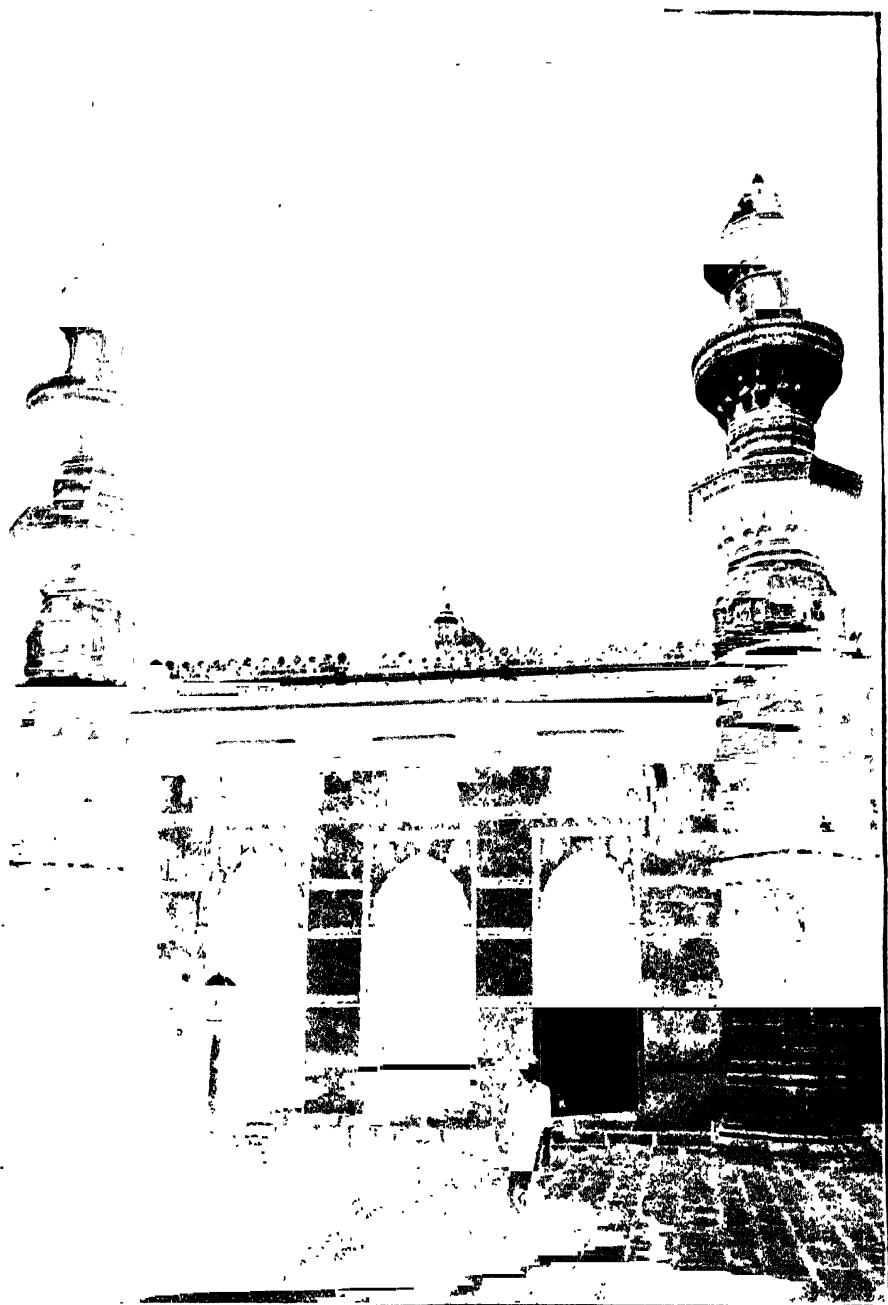
মোহাফেজ খাঁ মসজিদ—আহমদাবাদ (১৬৭ পৃষ্ঠা)

১৬৮৯ সালে রাজকুমার আজম সোলাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুরবিজয় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সোলাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিজাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্তু সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাধা পড়িল। মোগলদের আগমনে বিজাপুরের লোকেরা কলহ বিবাদ দলাদলি সব ভুলিয়া ঐক্যবন্ধনে মিলিত হইল। বিজাপুর সৈন্যের প্রতিঘাতে মোগলেরা বিপদগ্রস্ত হইয়া ভীমা নদীর উত্তরে হটিয়া গেল। বর্ষ শেষে আজম পুনর্ব্বার সৈন্যসহ প্রত্যাগত হইলেন। এবার বিজাপুর সেনাগণ আর এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সীমান্তে মোগলদের প্রতিরোধ না করিয়া রাজধানী মধ্যেই বল সঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এইরূপ আচরণের সুফল আপনা হইতেই ফলিল। বিজাপুরের উত্তরাঞ্চলে ধান্য শস্য জলের অভাব—অত-বড় মোগল সৈন্যের আহার যোগানো বিষম দায়। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত—এদিকে বিজাপুরের অশ্বারোহীদল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে—মহা উৎপাত! অবশেষে আহমদনগর হইতে অনেক কষ্টে এক বোঝাই ধান্য আমদানী হওয়ায় মোগল সৈন্য রক্ষা পায়। ইত্যবসরে সম্রাট স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন—তাহা কোনমতে তালিতুলি দিয়া শেষ করিয়া সসৈন্য যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইলেন। আসিয়া দেখেন যে তাঁহার পুত্র আজমের সৈন্য বিজাপুর একপ্রকার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে সৈন্যের যে সমস্ত অভাব ছিল তাঁহার আগমনে তাহা দূর হইল। সহরের দক্ষিণে প্রাচীর-ভেদ-যোগ্য কামানসজ্জা প্রস্তুত হইল ও তাহার বলপ্রয়োগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই—ভিতরে অন্নকষ্টেই কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই বাক্য স্মরণকরতঃ পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। অন্নাভাব যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবরে নগরপালেরা হার মানিয়া সম্রাটের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার আমীর ওমরাও এবং প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজাপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গের বিলাপধ্বনির মধ্যে আর্ক কেল্লার গগন-মহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সর্দ্দারদের নজরানা গ্রহণ করিলেন। অভাগা সেকন্দর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, বন্দীকৃত বিদ্রোহীর ন্যায় রজতশৃঙ্খলে সম্রাট সমক্ষে সমানীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে বসিবার আসন ও অভয় বচনে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার এক লক্ষ টাকা বার্ষিকী বাঁধিয়া দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেকন্দর লোকান্তরে গমন করেন। তাঁহার

ইচ্ছামতে সহরের উত্তর পূর্ব্বে আপন গুরুর গোরের সন্নিকটে এক সামান্য গোরস্থানে তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জীবদ্দশার অনুরূপই তাঁহার চরমগতি। তাঁহার প্রবল-প্রতাপ পূর্ব্বপুরুষদের সমুন্নত সমাধি মন্দির সকল সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, আর আদিলসাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকন্দরের মৃতদেহোপরি অন্ত্যেষ্টির চিহ্নস্বরূপ একটি প্রস্তর খণ্ডও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিজাপুরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অপনোদিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল আর ফিরিল না। ঔরঙ্গজেব তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিজাপুর সৈনিকদের আশ্রয় দান, আমীর ওমরাওদের মানমর্য্যাদা রক্ষণ, ভূমি সম্পত্তি ও বিবিধ ইনাম দানে প্রজাদের মনোরঞ্জন, বসতি বিস্তারের উত্তেজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভাঙ্গা যেমন সহজ, গড়া তেমন সহজ নয়। স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া অবধি সহরের জীবন বিনষ্ট হইল, তাহার শ্রীসম্পদ চলিয়া গেল। মানুষের অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতির উপদ্রব। ঔরঙ্গজেব থাকিতে থাকিতেই এমন এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইল যে তাহাতে লক্ষাধিক লোক মারা পড়ে ও অনেকে সহর ছাড়িয়া পালায়। ঔরঙ্গজেবের মহিষীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গোরের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। মড়ক থামিয়া গেলে সম্রাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল যে লোকসংখ্যা সর্ব্বসুদ্ধ দশ লাখের কিছু কম; মাহমুদ আদিল সার রাজত্বকালে বিজাপুর ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী সাহাপুর মিলিয়া যে লোকসংখ্যা নির্ণীত হয় তদপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ১৬ হাজার লোক কমিয়া গিয়াছে। মোগল হইতে মারাঠীদের হস্তে পড়িয়া বিজাপুর দিন দিন আরো অবসাদ-হিমে ম্লান হইতে লাগিল। মোগলদের সময় তাহার শ্রীসৌভাগ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বর্গীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল। পেশোয়ার অধিকার গিয়া সাতারা রাজাদের আমল আরম্ভ। সাতারার শেষ রাজা সাহাজী। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাহাজী অপুত্রক মরণানন্তর ইংরাজেরা সাতারা আত্মসাৎ করেন, সেই সঙ্গে বিজাপুরও ইংরাজরাজ্যে মিলিত হইল।

এই বিখ্যাত প্রাচীন সহর এইক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত হইয়াছে। জিলার রাজধানী হইয়া বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া লৌহপথ মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসার উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার ভগ্ন জীর্ণ গৃহাবলী, কতক বাসোপযোগী কতক বা সরকারী কার্য্যালয়রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, মুসলমান রাজভবনগুলি জজ কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট পুলিসাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ, জেলখানা, পোষ্ট আফিস
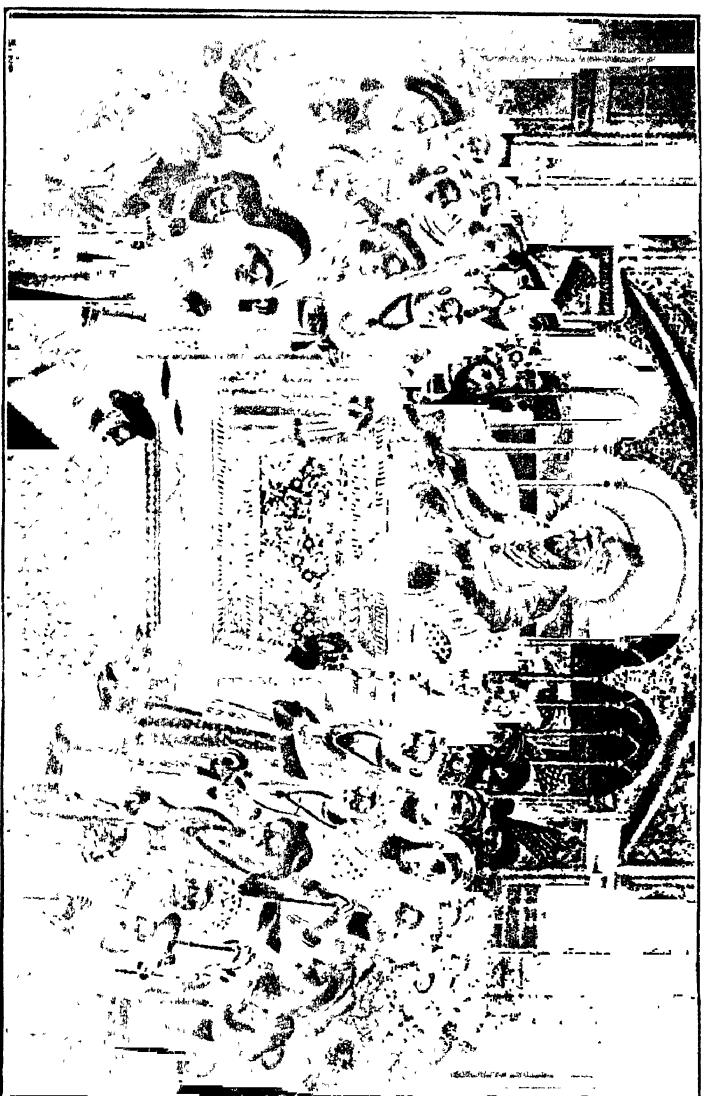
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজ-দরবার

(১৬৬ পৃষ্ঠা)

এই সকলের জন্য পুরাতন গৃহ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, ভজনালয় গোরমন্দির পর্য্যন্ত অবৈধ ব্যবহারে কলঙ্কিত। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট Lord Curzon এইরূপ অত্যাচার নিবারণে বিশেষ মনোযোগ দান করেন, তাঁহার শাসনে ইমারতগুলির অপব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে বন্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই সকল উপায়ে এই শবপুরীতে কি প্রাণসঞ্চার হইবে? এ আশা দুরাশা মাত্র। লোকদের সে জীবন্ত ভাব, সে স্বাধীন স্ফূর্ত্তি কোথায়? এই পুরীর ভগ্নগৃহের উপর কারিগিরি মৃতদেহে পুষ্পসজ্জার মত বিসঙ্গত বোধ হয়। আর আধুনিক কারিগরেরা স্বীয় কারুকার্য্যের বাহার যতই বাহির করুক না কেন, কল্পনা এ সকল ছাড়িয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপের উপরেই অতীতের সহিত ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়। *

গুজরাট ও গুরজাটী

গুজরাটের আবহাওয়া আমার তেমন পছন্দ হয় নাই কিন্তু গুজরাটীদের মধ্যে অনেকের সহিত আমার হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। কি ভাষা, কি লোকদের রীতি বিচিত্র, গুজরাটী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, যেন বাঙ্গলার একখণ্ড পশ্চিম ভারতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিষ গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ আমার প্রথম কর্ম্মস্থান। এই সহর সাবরমতী নদীতীরে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ্রগণ্য। সহরের প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিম প্রায় এক মাইল বিস্তৃত, ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ, ইহার চৌদ্দটি প্রবেশদ্বার আর অনেকগুলি বুরুজ ও স্তম্ভে এই প্রাচীর সুসজ্জিত। আহমদাবাদের উপর দিয়া বহুতর রাজবংশের উপদ্রব গিয়াছে—মুসলমান, মোগল, মারাঠী—অবশেষে পেশওয়া রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা ইংরাজরাজের হস্তগত হয় (১৮১৮)।

আহমদাবাদ জরির কাজ, রেশমের কাজ আর যন্ত্র ও হাতচরখায় তৈয়ারি সুতার কাপড়, এই তিনের জন্য প্রসিদ্ধ। কথায় বলে ইহার ভাগ্যগ্রন্থি তিন সূত্রে বাঁধা—সোনা, রেশম ও তুলা। অনেকগুলি কাপড়ের মিলে সহস্র সহস্র শ্রমজীবি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন সকল সহরের স্থানে স্থানে ছড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে কারুকার্য্যময় মসজিদ, সমাধি মন্দির, তিন দরজা, কূপবাপী প্রভৃতি অনেকগুলি দর্শনীয় জিনিস আছে।

---

* Bombay Gazeteer Vol. 23. Bijapur ;—Wheeler's History of India, Vol. 4 Part I

আমি প্রথমে যখন আহমদাবাদে যাই সে সময়ে আমার যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দুইজন আমার বিশেষ স্মরণীয়, ভোলানাথ সারাভাই ও রণছোড়লাল ছোটালাল। ভোলানাথের নামে আহমদাবাদের প্রার্থনা সমাজ মনে পড়ে, যাহার সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন সংগ্রথিত। তিনি এই প্রার্থনা সমাজের অধ্যক্ষ, সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইহার উন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল ছিলেন। এখানে আমি যে সকল বক্তৃতা দিতাম তিনি তাহা শুদ্ধ গুজরাটীতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিতেন, এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। একবার তিনি তাঁহার কন্যা জিতোবাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসেন, আমরা আমাদের এক বহির্ব্বাটীতে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমার পিতৃদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল সাধুভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কন্যাও আমাদের অন্তঃপুরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাটী ধরণের রুটী ও তরকারী করিয়া খাওয়াইতেন, আমাদের খুব ভাল লাগিত, এমন পরিপাটী মোলায়েম রুটী কি কৌশলে তৈয়ার হয় সবাই জানিতে উৎসুক; মেয়েরা অবশ্য সে গুপ্তমন্ত্র শিখিয়া লইতে বিলম্ব করেন নাই, তা বলা বাহুল্য।

উপরে ভোলানাথের সহযোগী রণছোড়লালের নামোল্লেখ করিয়াছি—ধর্ম্মপ্রাণ ভোলানাথ আর বণিকবৃত্তি রণছোড়লাল এঁরা দুজন স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক! রণছোড় লাল বিষয়বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য বণিক, সহরের শ্রীসমৃদ্ধি-বর্দ্ধনে কায়মনে তৎপর ছিলেন। ভোলানাথ ভাইয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ নরসিংহ রাও প্রাদেশিক সিবিল সর্ব্বিসে ছিলেন; অনেক সময় আমরা এক ষ্টেসনে, তিনি রেবেন্যু আমি জুডিস্যাল বিভাগে কর্ম্ম করিতাম, এক্ষণে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণরাও (মনুভাই) ব্যারিষ্টর হইয়া আসিয়া আহমদাবাদে কর্ম্ম করিতেছেন। রণছোড়লালের পৌত্র চিনুভাই তাঁহার পিতার বিয়োগে পিতামহের আসন অধিকার করিয়াছেন। চিনুভাই সম্প্রতি স্বজাতির মধ্যে প্রথম ব্যারণেট পদবী লাভ করিয়াছেন, প্রথম হিন্দু ব্যারণেট বলিয়া তিনি অভিনন্দনীয় তিনি যে নাইটের পদ হইতে ব্যারণেট পদে অধিরূঢ় হইলেন সে তাঁহার নিজগুণে। দেশহিতৈষিতা, কর্ম্মক্ষমতা, দানশীলতা, এই সকল গুণে তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছেন।

এদেশে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে ব্যারণেট উপাধি পান তিনি বোম্বায়ের খ্যাতনামা পারসী, স্যার জমসদজী জিজিভাই। তাঁহার নামে সাম্রাজ্ঞীর যে আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হয় তাহার তারিখ ১৮৫৮ সাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যারণেট—তাঁহারাও বোম্বাই-

চিমুভাই মাধবলাল (১৬৮ পৃষ্ঠা)
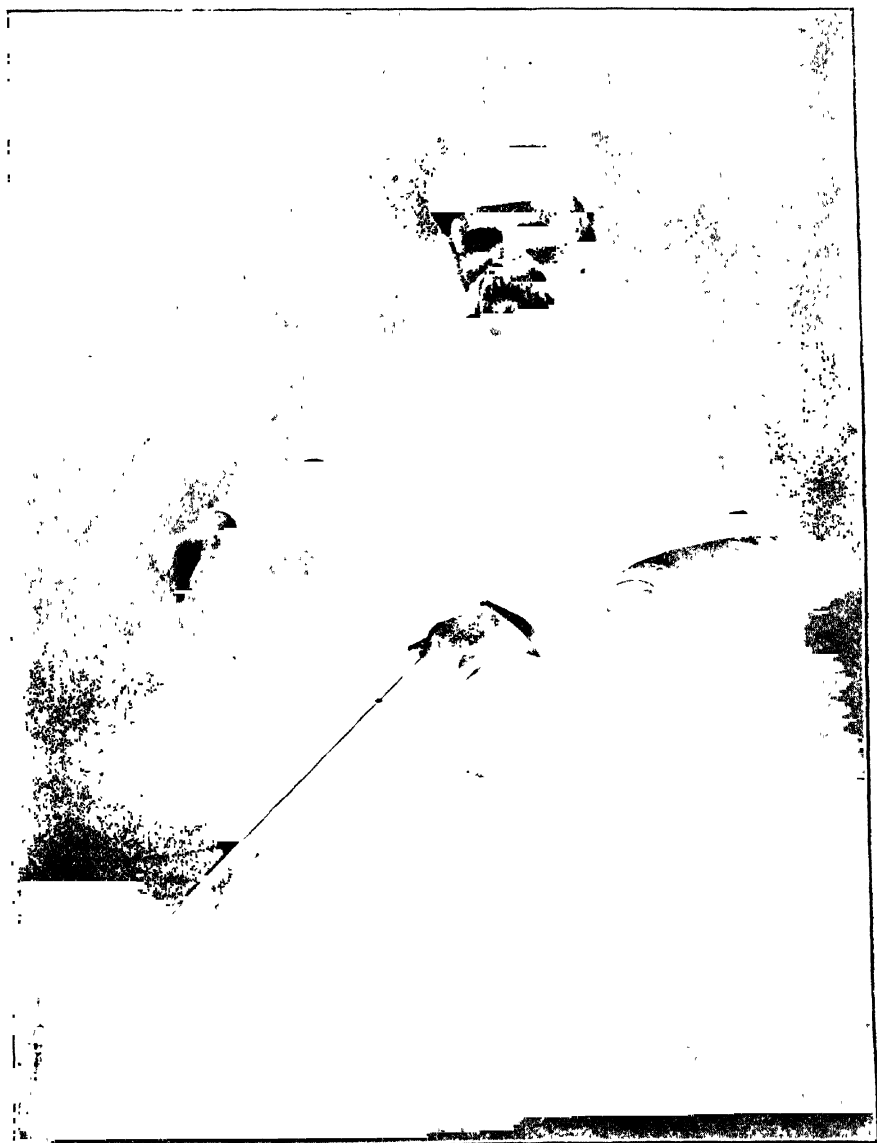
বাসী পারসী। চতুর্থ ব্যারণেট করিমভাই ইব্রাহিম বোম্বাইবাসী মুসলমান, ১৯১০ সালে তাঁহার এই পদোন্নতি হয়। উল্লিখিত চিনুভাই মাধবলাল পঞ্চম ব্যারণেট। ইঁহারা পাঁচজনেই ব্যবসাদার ধনপতি -দানে মুক্তহস্ত। পাঁচজনেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোক। আশ্চর্য্য এই যে বোম্বায়ের কপালে এই স্পৃহনীয় রাজটীকা পড়িয়াছে, এ পর্য্যন্ত ঐ প্রেসিডেন্সির বাহিরে যায় নাই।

মেরি কার্পেণ্টার

আমি আহমদাবাদ যাইবার কিছু পরে স্বনামখ্যাত Miss Mary Carpenter আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। ব্রিষ্টল নগ.র তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার শেষ জীবনে কার্পেণ্টার পরিবার মধ্যে বাস করেন এবং যখন তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় কায়মনে তৎপর ছিলেন। সে সময়কার কথা কুমারী কার্পেণ্টার তাঁহার "Last days of Raja Rammohan Ray" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইয়া অবধি দেশের লোকের প্রতি তাঁহার একটা টান জন্মে। আমি ও আমার বন্ধু মনোমোহন ব্রিষ্টলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম ও আমাদের দেশের তখনকার সামাজিক অবস্থা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। এই সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইত। তিনি এদেশে আসিবার প্রবল ইচ্ছা জানাইলেন। তখন তিনি তাঁহার মধ্যবয়স পার হইয়াছেন; ঐ পরিণত বয়সে এদেশে আসা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে, এই বলিয়া অনেকে তাঁহার মতি ফিরাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি বোম্বায়ে আসিয়া আমাদের আহমদাবাদ ভবনে কিছুকাল অতিথি হইয়া রহিলেন। নাগরিকেরা সাধ্যমত তাঁহার আদরসৎকারে তৎপর হইল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে সকলেই ব্যগ্র, সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে উৎসুক। একজন আহেলাবিলাতি রমণী, এদেশ সম্বন্ধে যাঁর কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, তাঁহার নবীন চক্ষে আমাদের দেশীয় ভাব কেমন লাগে স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন পাইতাম। তাঁহাকে সেখানকার দেবালয় সকল দেখিতে লইয়া যাইতাম, তিনি ঠাকুর দর্শন করিয়া বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিতেন—"বুৎপরস্ত" ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইত। কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে গিয়া বাড়ীর

মেয়েদের দেখিতে চাহিলে গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া আপনার স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিতেন। অবশ্য স্বভাষায় আলাপ করিবার সুবিধা হইত না, দোভাষী রাখিয়া যতদূর সম্ভব তাহাই হইত। মনে পড়ে একদিন তিনি সহরের একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গৃহস্বামী তাঁহাকে আপন স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছেন—

ইনি আমার স্ত্রী—Mrs. B. (No. 1)

মিস কার্পেণ্টার সহাস্য বদনে তাঁহার সহিত shakehand করিলেন।

ইনি Mrs. B. (No. 2)

মিস কর্পেণ্টার চমকিয়া উঠিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, হাত বাড়াইতে আর রাজী হইলেন না।

এই Mrs. B.—(No. 3)

মিস কার্পেণ্টার মূর্চ্ছিত প্রায়—কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাহিরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। মনে মনে ভাবিলেন—How shocking! কি বীভৎস্য কাণ্ড। তিনি যদি বাঙ্গলা দেশে বহুপত্নীক কোন জলজ্যান্ত কুলীন দেখিতেন—না জানি কি করিতেন—! তাহাকে বায়ুগ্রস্ত উন্মাদ ভাবিয়া তাহা হইতে শত হাত দূরে যাইতেন সন্দেহ নাই।

Miss Carpenter যখন কলিকাতায় আসেন তখন অনেকে তাঁহাকে ষ্টেশনে গিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তখন কলিকাতায় পালকী করিয়া যাওয়া-আসার রীতি ছিল। এক জায়গায় তাঁহাকে একটা সুঁড়ী রাস্তায় যাইতে হইয়াছিল, সেখানে পালকী করিয়া না গেলে যাওয়া যায় না; কিন্তু Miss Carpenter কোন মতে পালকীতে উঠিতে চান না, মানুষের কাঁধে চাপিয়া যাওয়া কিছুতেই তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলেন, পালকী চড়িতে রাজী হইলেন না।

কলিকাতায় আসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বন্ধুটিকে অনেক সাধ্যসাধনা করা গেল কিন্তু তিনি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"Miss Carpenter, I am sure you will be disappointed—"

Miss C.—কি, তুমি বল কি? আমাদের দেশের লোকেরা আপনার স্ত্রীর কথা কত গর্ব্ব করিয়া বলে—তাদের চোখে আপনার স্ত্রী রমণীকুলের সেরা, অন্য কোন নারী রূপে গুণে তার সমান নয়।

B.—কিন্তু দেখুন আমাদের দশা অন্যরূপ।

Miss C.—কেন?
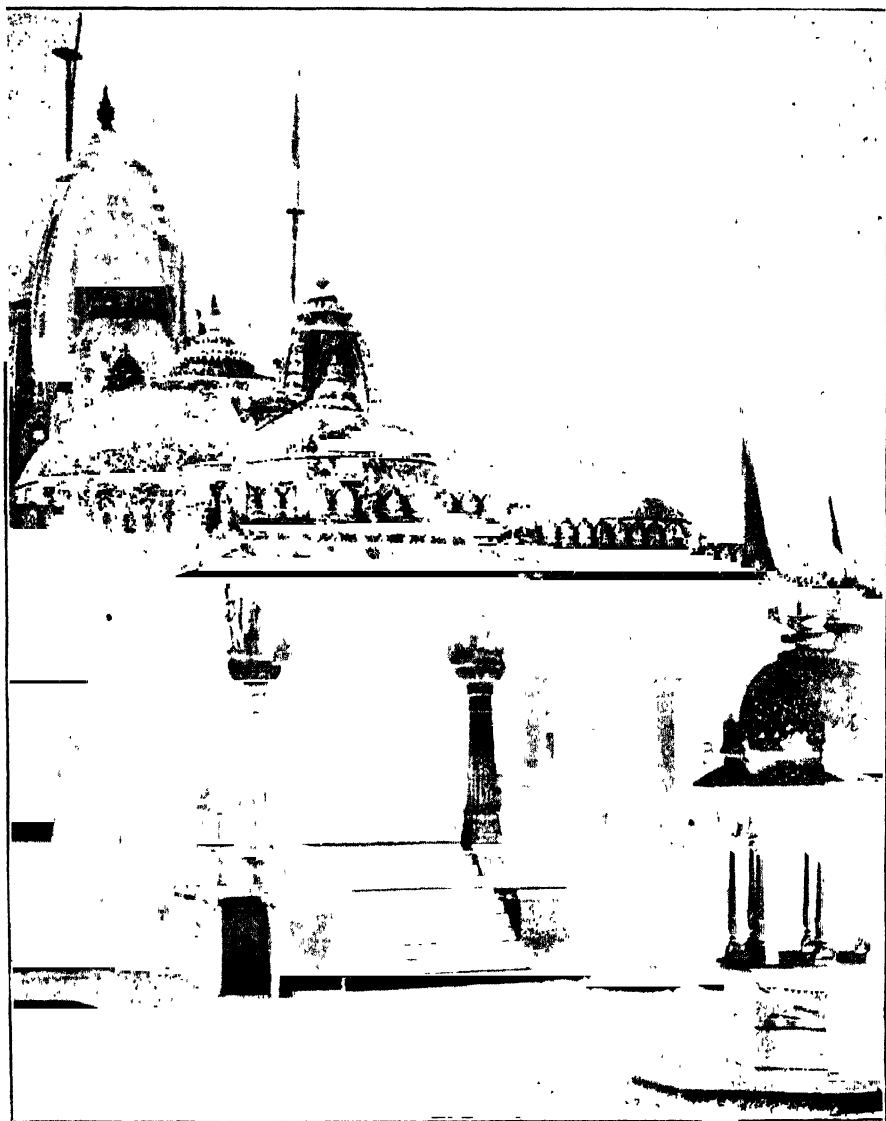
জৈনমন্দির—আহমদাবাদ

(১৭১ পৃষ্ঠা)

B.—আমরা ত আর পছন্দ করে বিয়ে করি না, আমাদের বাপ মা মেয়ে পছন্দ করে এনে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেন।

Miss C.—আচ্ছা বল দেখি, কোন্ নিয়ম ভাল? বিয়ের জন্য পরের চোখে মেয়ে পছন্দ করতে কি কোন পুরুষের মন যায়? তার চেয়ে নিজে দেখে শুনে মনের মত মেয়ে বিয়ে করাতে কত সুখ!

B.—কি করি নাচার! দেশাচারে আমাদের হাত পা বাঁধা।

Miss Carpenter-কে কাজেই নিরুত্তর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

সে যাহাই হোক্ Miss Carpenter-এর মত ভারত-হিতৈষিণী বিদুষী নারীরত্ন দুর্লভ। সেই দূর দেশ হইতে এই বয়সে কেবল আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে এদেশে আসাই তাঁর ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল, আমাদের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, আমাদের মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতি হয়, সেজন্য তিনি প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু তিনি যে বদ্ধ সংস্কার লইয়া এই প্রৌঢ় বয়সে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহার সহিত দেশবাসীগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রত্যাশা করা বৃথা। রামমোহন রায়কে বাঙ্গালীদের নমুনা ভাবিয়া তাঁহার মনে যে উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছিল, এদেশে তাহার অনুরূপ দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন এক—দেখিলেন আর, তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

জৈন সম্প্রদায়

আহমদাবাদে অনেক জৈন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও অন্যান্য স্থানে জৈনপন্থীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—গুজরাট তাহাদের এক প্রধান আড্ডা। সব মিলিয়া জৈন সংখ্যা প্রায় পনর লক্ষ হইবে। তাহাদের অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যাঙ্কিং কাজে নিযুক্ত। জৈন চাষা প্রায় দেখা যায় না, জীবহত্যার ভয়ে তাহারা লাঙ্গল ধরিতে নারাজ। আহমদাবাদে দেখিলাম জৈন ও বৈষ্ণবেরা মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে বাস করিতেছে; তাহাদের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধও বিরল নহে, কেবল ওরূপ মিশ্র বিবাহে বরকন্যা উভয় পক্ষের একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে হয়, যেমন রোমান ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট বিবাহে হইয়া থাকে কতকটা সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে কন্যাকে বরের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুঘরের কন্যা বিবাহের পর হইতে জৈন মন্দিরে ও জৈনকন্যা বৈষ্ণব মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে।

আহমদাবাদের নগরশেঠ প্রেমাভাই হেমাভাই নামে একটি সম্ভ্রান্ত জৈনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল—তাঁহার সহিত জৈনধর্ম্ম লইয়া অনেক আলোচনা হইত। তিনি

নিরীশ্বরবাদের পক্ষ হইয়া অনেক সময় তর্ক করিতেন—তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইত যে জৈনেরা হীনযান বৌদ্ধদের মত নিরীশ্বরবাদী—জগৎ অনাদিকাল হইতে আপনাপনি চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সৃষ্টিকর্ত্তা তাহারা স্বীকার করে না। কিন্তু জৈনদের দার্শনিক মতের ঠিক নাই। তাহারা বলে, কোন বিষয়, হাঁ, না, দুইই হইতে পারে; যেমন জগৎ নিত্য ও অনিত্য, প্রসঙ্গ ও সময় অনুসারে দুইই বলা যাইতে পারে। এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে কোন তথ্যের মীমাংসা হয় না। তাহাদের এই দ্বৈধ ভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার তাহাদিগকে 'স্যাদ্-বাদী' অর্থাৎ বিকল্পবাদী বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। জৈনদের দার্শনিক তত্ত্ব যাহাই হউক, মানুষের স্বাভাবিক আরাধনা প্রবৃত্তি কোথায় যাইবে? দেখা যায় যে ঈশ্বরারাধনার পরিবর্ত্তে তাহাদের ধর্ম্মে বীরপূজা স্থান পাইয়াছে। তাহাদের আদিগুরু যে মহাবীর, তিনিই তাহাদের দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জৈনধর্ম্মে বোধ হয় যেন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্রিত, বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ভাগ উহার মতে অনুস্যূত। জৈন মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গিয়া পূজার্চ্চনা করে, এমনও দেখা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মই কর্ম্মফলের নৈতিক প্রাধান্য মানিয়া লয়। আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে জীবের যোনি-ভ্রমণে উভয়েরই বিশ্বাস। যে সকল সাধু পুরুষ স্বীয় কর্ম্মগুণে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জিন, জিনের অনুচর জৈন। জিনের অপর নাম তীর্থঙ্কর। যুগে যুগে এইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর উদয় হইয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ যুগে আরো ২৪ জন উদয় হইবেন। জৈন মন্দিরে এই সকল তীর্থঙ্করের পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ জিনদ্বয়, পরেশনাথ ও মহাবীর, জৈনদের বিশেষ পূজার্হ দেবতা। এই সকল তীর্থঙ্কর-উদ্দেশে পরেশনাথের পাহাড়, গিরনার, শত্রুঞ্জয়, আবুর পাহাড় প্রভৃতি নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ইহা বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই উপদিষ্ট ধর্ম্ম কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অনাত্মবাদী, তাহার বিপরীত আত্মবাদ জৈনধর্ম্মের সারতত্ত্ব। জৈনদের বিশ্বাস যে, জীবজন্তু, এমন কি বৃক্ষলতা উদ্ভিদ্ কোন কোন জড় পদার্থও আত্মসত্তায় পূর্ণ, এই হেতু অহিংসা ধর্ম্ম তাহাদের বিশিষ্টরূপ পালনীয়। পশু পক্ষীদের আহার যোগানো জৈন গৃহস্থের নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। জৈনদের উদ্যোগে বোম্বাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে পশুর হাঁসপাতাল (পিঞ্জরা পোল) স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের জৈন সাধক আপনার শরীরের রক্ত দিয়া মশা ছারপোকা পোষণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। পাছে দীপালোকে কীটপতঙ্গের প্রাণহানি হয়, এই আশঙ্কায়
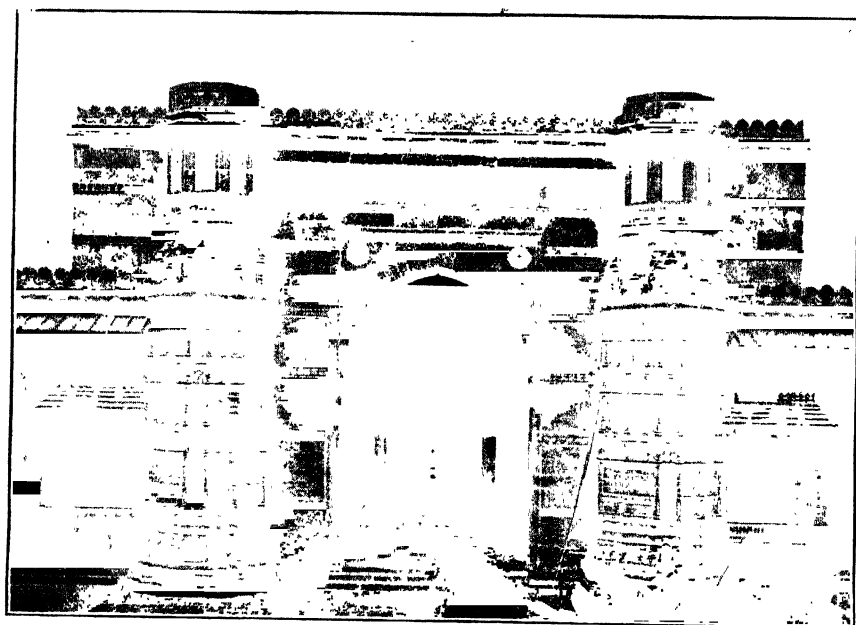
বাণী রূপাবতীর মসজিদ—আহমদাবাদ (১৬৭ পৃষ্ঠা)
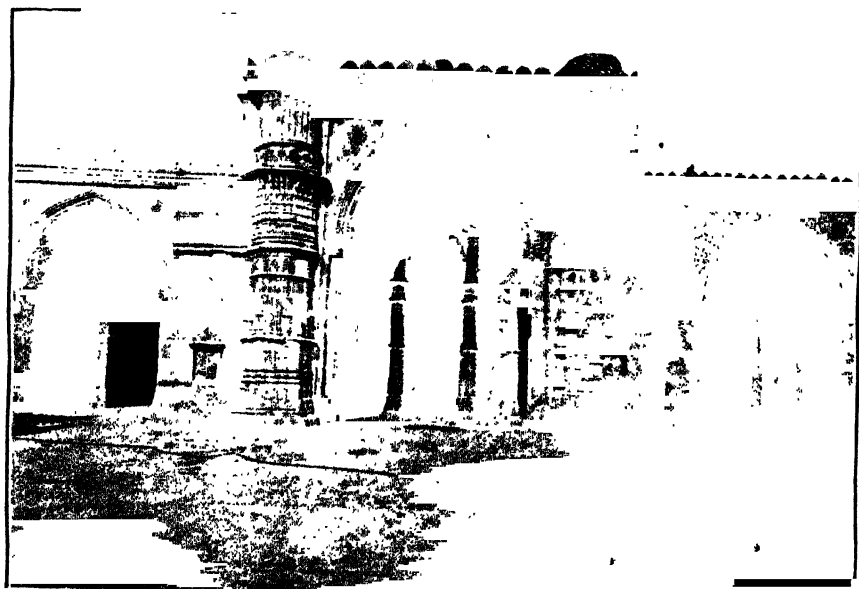
তাহাদের রাত্রিভোজন নিষেধ, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহারের নিয়ম। জৈনযতিরা মুখে কাপড় জড়াইয়া রাস্তা ঝাঁট দিয়া চলে, পাছে তাহাদের নাসারন্ধ্র দিয়া কোন জীবাণু প্রবেশ করে, পাছে পদদলিত হইয়া কোন কীট মারা পড়ে। কথিত আছে যে এই অতিমাত্র অহিংসা নিয়মপালনই জৈন রাজ্য নাশের মূল। অনহলবাড়ার শেষ রাজা কুমারপাল গোঁড়া জৈন ছিলেন, বর্ষাকালে জীবহিংসার ভয়ে তিনি নিজ সৈন্যসামন্তের চলাচল বন্ধ করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন।

ধর্ম্মনীতিতে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে উক্ত দুই ধর্ম্মে বিস্তর প্রভেদ। উভয় ধর্ম্মই সংযম ও অন্তঃশুদ্ধি উপদেশ করেন কিন্তু সাধনা এক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের যোগপ্রণালী মিতাহার, মিতাচার, জৈনপন্থা অন্যতর। বুদ্ধদেব তপশ্চর্য্যার চূড়ান্ত সীমায় গিয়া মধ্যপথে ফিরিয়া আসেন—ইন্দ্রিয়সেবা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী পথ। জৈনগুরু মহাবীর ১২ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তপঃসাধনে নিযুক্ত ছিলেন—জৈনদের আচার অনুষ্ঠান সেই আদর্শে নিয়মিত; দীর্ঘ উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণের নিয়ম যতিদের জীবনব্রত। তাঁহারা আর সকল জীবের জীবন রক্ষণে তৎপর, কেবল নিজের শরীরের প্রতি দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না।

জৈনপন্থীর দুই শাখা—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর জৈন শ্বেতবস্ত্রধারী, দিগম্বর নগ্ন সন্ন্যাসী, আকাশ যাঁহার বস্ত্র, গ্রীকেরা Gymnosophist বলিয়া যাঁদের বর্ণনা করিয়াছেন। একালে উভয় পন্থীই বস্ত্র ধারণ করেন, কেবল দিগম্বর জৈনেরা বিবস্ত্র হইয়া আহার করিবার নিয়ম এখনো পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রে দিগম্বর সন্ন্যাসী নিগণ্ঠ (নিগ্রন্থ) অর্থাৎ বন্ধনশূন্য বলিয়া বর্ণিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধের সময় এই সন্ন্যাসী দলের দলপতি ছিলেন নিগণ্ঠ জ্ঞাতিপুত্ত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃবংশীয় মহাবীর, জৈন শাস্ত্রে যাঁহার নাম বর্দ্ধমান মহাবীর—ইহা হইতে দিগম্বরদের প্রাচীনত্ব এবং মহাবীরকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করা যায়। সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহাদের শাখাভেদের সূত্রপাত।

জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা মাত্র, কিন্তু একথা অপর পণ্ডিতেরা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে জৈনধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। জৈনেরা নিজে তাঁহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরকে শাক্যসিংহের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমত ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের অগ্রাহ্য। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কিন্তু আগে পরে যিনিই আসুন, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ না থাকুক উভয়কে পরস্পরের জ্ঞাতভাই বলিয়া মানিতেই হইবে। উভয়েই এক মাতার সন্তান—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িয়া বিশ্বজগতে ব্যপ্ত হইয়া গিয়াছে; জৈনধর্ম্ম মায়ের কোল ছাড়িয়া দূরে যান নাই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ব্যগ্র।

বল্লভাচার্য্য

গুজরাটী হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা বিস্তর। বহুতর বণিক ও ব্যবসায়ী লোক বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। বল্লভাচার্য্যের উত্তরাধিকারী আচার্য্যগণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের- পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বল্লভাচার্য্য চম্পারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার মেধা এমনি তীক্ষ্ণ ছিল যে প্রবাদ এই যে, সাত বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া চতুর্মাসের মধ্যে চতুর্ব্বেদ, ষড়দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন সংস্করণ করিয়া শীঘ্রই ধর্ম্মপ্রচারে দেশবিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি একবার বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের রাজসভায় গিয়া স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবদের প্রধান আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে নয় বৎসরকাল ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে কাশীবাসী হইয়া জীবন যাপন করিতে থাকেন। সেখানে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ্যে ভাগবত পুরাণের ভাষ্য বল্লভপন্থীদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। দর্শনক্ষেত্রে তাঁহার মত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে। কাশীবাসেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

বল্লভের ধর্ম্ম বিলাসের ধর্ম্ম—ভোগৈশ্বর্য্যপরায়ণ গৃহস্থের ধর্ম্ম। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"

বল্লভনির্দ্দিষ্ট মার্গ অন্যতর—তাহা ত্যাগের মার্গ নহে, পুষ্টিমার্গ। উচ্চাঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকচ্ছলে গৃহীত—তাহা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেমের প্রতিরূপ; বল্লভধর্ম্মে এই স্বর্গীয় প্রেম পার্থিব ধূলি দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে।

মেরি কার্পেণ্টার (১৬৯ পৃষ্ঠা)

করসনদাস মূলজী

বল্লভধর্ম্মের এই অনীতিদুর্গ ভেদ করিতে গুজরাট হইতে এক ধর্ম্মবীর অভ্যুদিত হইলেন—তাঁহার নাম করসনদাস মূলজী। এই মহাত্মার জীবন-কাহিনী এইস্থলে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ইনি ১৮৩২ অব্দে বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়—পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার পরিবারে বালকটিকে সঁপিয়া দেন। করসনদাস বোম্বায়ে এলফিনিষ্টন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ-সংস্কার-সমস্যার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ঘটনাক্রমে এই সমাজ-সমস্যা তাঁহার জীবন-সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

যখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর, বিধবা বিবাহের উপর একটা পারিতোষিক প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার লেখার কিয়দংশ কে একজন দুষ্ট লোক চুরি করিয়া তাঁহার কাকিমার হাতে আনিয়া দেয়—তাঁহার এই লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। অভিভাবকের কোপানলে পড়িয়া তাঁহার সমূহ বিপদ উপস্থিত। তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইল, তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলেন। অন্য কেহ হইলে এই প্রচণ্ড আঘাতে এখানে থামিয়া যাইত, নিজস্ব মতামত একদিকে রাখিয়া তাহার অন্নদাতার মন যোগাইয়া চলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না, কিন্তু করসনদাস তেমন পাত্র ছিলেন না—ঘা খাইয়া তাঁহার মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া লইয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তাঁহার অন্নচিন্তা দূর হইল এবং সমাজ-সংস্কার-সমস্যা পূরণেরও অবকাশ পাইলেন।

তখনকার কালে • বোম্বায়ে দেশীয় সংবাদপত্রের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল যেমন সারহীন, ভাষাও তেমনি অশোভন ও দোষাশ্রিত। পারসীদের মধ্যে গুজরাটী ইংরাজী মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ী ভাষা প্রচলিত ছিল। এই অভাব মোচন করিবার জন্য কয়েকজন কৃতবিদ্য পারসী "রাস্তগোপ্তার" নামক এক সাপ্তাহিক গুজরাটী পত্র বাহির করেন। করসনদাস তাহার লেখকের মধ্যে একজন ছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মর্ম্মকথা সকল প্রচার করিবার যথেষ্ট প্রসার না পাওয়াতে "সত্য-প্রকাশ" নামে তিনি নিজে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন—তখন হইতে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী চালনা করিবার সুযোগ পাইলেন। হিন্দু সমাজের ক্ষতস্থান সকল উদ্‌ঘাটন করা; মহারাজদের অনীতিগর্ভ অমানুষী কাণ্ড সকল লোকমাঝে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া, এই তাঁহার ব্রত; এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া "সত্য-প্রকাশ"

গুজরাট গগনে ধূমকেতুর ন্যায় উদয় হইল। তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধ সকল হিন্দু সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল, বিশেষতঃ তাঁহার ভাটিয়া জাতভাইদের তীব্র বিষদৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল।

ভাটিয়াদের অধিকাংশ লোক বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। তাহাদের ব্যবসাবুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ধর্ম্ম বিষয়ে গোঁড়ামীও তেমনি প্রবল। তাহারা মহারাজের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য। গোসাঁইজী মহারাজ তাহাদের চক্ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, ভক্তগণ তনুমনধনে তাঁহার সেবায় রত। মহারাজ তাঁহার অনুচরবর্গের রাজভক্তি গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট নহেন, তাহাদের নিকট হইতে দেবপূজার দাবী করেন। তাই তাঁহার আরতি বন্দনা, তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ, বসন ভূষণে তাঁহার দেহমণ্ডন, তাঁহার আসন পাদুকা অর্চ্চনা, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণামৃত পান,—এক কথায় বিষ্ণু-মন্দিরে মহারাজ দেবতার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এ সকল তবুও ত পদে আছে, ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে নিন্দনীয় জঘন্য পাপাচার যাহা উল্লেখ করিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, তাহা এই যে, বৈষ্ণব কুলবধূগণ এই পার্থিব কৃষ্ণসেবায় আপনাদের সতীত্ব উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

করসনদাস এই সমস্ত বীভৎস কাণ্ড অবারিত করিয়া ভাটিয়ামণ্ডলীর মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দিলেন। তাঁহার তীব্র কশাঘাতে তাহারা নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া থামাইবার চেষ্টা হইল—হিন্দু সমাজের অমোঘ বাণ যে জাতি বহিষ্কার,—সেই বাণ সন্ধানের উদ্যোগ হইতে লাগিল কিন্তু মহারাজের অনুচর বর্গের মন্ত্রতন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল।

১৮৬০ সালে গোসাঁইজী মহারাজ সুরাট হইতে বোম্বায়ে পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমনে "সত্য-প্রকাশের" মতামত লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহারাজ যুক্তি তর্কে না পারিয়া অশাস্ত্রীয় পাষণ্ড মতের পরিপোষক বলিয়া সম্পাদকের উপর কটুকাটব্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। করসনদাস তাহাতে পিছপাও হইবার পাত্র নহেন, তিনি তাহাদের আপনাদের অস্ত্রেই তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ উপনিষদ পুরাণাদি শাস্ত্রের বচন হইতে বল্লভী মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের অশাস্ত্রীয় ঘৃণিত আচার ব্যবহার সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। অক্টোবর ১৮৬০ সালের এক প্রকাশিত প্রবন্ধ এই নিন্দাবাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌছে। তাহাতে বিপক্ষদল কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল, কয়েক মাসান্তে কোথাও কিছু নাই হঠাৎ "সত্য-প্রকাশের" সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে সুপ্রিম কোর্টে এক লাইবেল মকর্দ্দমা আনিয়া উপস্থিত। তাহার উত্তরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে লাইবেল

কিছুই নাই, তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা অক্ষরশঃ সত্য ও সমাজের হিতার্থে সেই সকল অভিযোগ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব কুলবালাদের প্রতি ব্যভিচার বল্লভী ধর্ম্মনীতির অঙ্গ, একথা তিনি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত।

এদিকে ভাটিয়ারা জোট বাঁধিয়া স্থির করিল যে, তাহারা কেহই মহারাজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইবে না—তাহাদের সভায় এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞাপত্র একবাক্যে স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কোন ফল হইল না, প্রত্যুত তাঁহারা আপনাদের জালে আপনারাই ধরা পড়িলেন। করসনদাস এই সকল লোকের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণার ফৌজদারী চার্জ আনিয়া তাহাদের বাণ কাটিয়া দিলেন। বিচারে তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া কাহারও এক হাজার কাহারও পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ডে তাহাদের পাপের বিলক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টে এই লাইবেল মকদ্দমার বিচার চলিতে লাগিল। চল্লিশ দিন ধরিয়া এই মকদ্দমা চলে। চীফ জষ্টিস্ Sir Joseph Arnold বিচারপতি, সুবিখ্যাত বিতণ্ডা-কুশল Anstey প্রতিবাদীর কৌন্সলী। বিচারে প্রতিবাদীই জয়ী হইলেন, বাদীর পক্ষ লজ্জায় অধোবদন। Sir Joseph তাঁহার ন্যায়াসন হইতে মহারাজদের বীভৎস কাণ্ড-গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাযোগ্য তিরস্কার এবং প্রতিবাদীর অসম সাহস ও বীরত্বের যথাযোগ্য সাধুবাদ দিয়া ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের বিনাশ ঘোষণা করিয়া দিলেন। আমাদের শাস্ত্রবাক্য সফল হইল :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মে সমৃদ্ধি লভে, পূরে অভিলাষ,
পরে রিপুজয়, শেষে সমূলে বিনাশ।

"পাপের পথ চিরদিনই ধ্বংসমুখী"
(Book of Psalms)

এখনো করসনদাসের সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয় নাই ; এবারকার পালা—বিলাত যাত্রা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাহাদের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি করিয়া জ্বালাতন আরম্ভ করে,—এই স্থানে এ সকল কথা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, করসনদাস মূলজী জীবনের শেষপর্য্যন্ত অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন—কর্ত্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। অবশেষে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া ১৮৭৪ সালে এই বিপ্লবময় সংসার হইতে অপসৃত হইয়া শান্তিধামে চলিয়া যান।

স্বামী নারায়ণ

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সমস্ত অনীতিগর্ভ আচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বামী নারায়ণ ধর্ম্ম সমুত্থিত হয়। সহজানন্দ স্বামী এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। গুজরাটে তাঁহার অন্যূন দুই লক্ষ অনুচর। সহজানন্দ রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন।* যে সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গলা দেশে মূর্ত্তিপূজার স্থানে একেশ্বরবাদের বীজ বপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, সহজানন্দ স্বামীও তখন গুজরাটে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনীতি-কলঙ্ক অপনোদন করিয়া বিশুদ্ধ নীতিমার্গ প্রদর্শন করিতে তৎপর ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, সংযমী উদারচরিত সাধুপুরুষ ছিলেন। সহজানন্দ অযোধ্যার অন্তর্গত চপাই গ্রামে ১৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুজরাটে জুনাগড় নবাবের অধীনস্থ একটি গ্রামে আসিয়া রামানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮০৪ অব্দে স্বামীর সহিত আহমদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

'তাঁহার কি এক সরল মাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি ছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অনুরক্ত শিষ্যদলে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে আহমদাবাদের ব্রাহ্মণগণের ও কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি অত্যাচার ভয়ে আহমদাবাদ ছাড়িয়া তাহার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ জয়তলপুর গ্রামে চলিয়া যান এবং তথায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই সকল উদ্যোগে গোলযোগ আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপুরুষেরা স্বামীকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করেন কিন্তু তাহার ফল উল্‌টা হইল। লোকের হৃদয় তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট এবং তাঁহার আধিপত্য শতগুণ বৃদ্ধি হইল। শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত হইলেন ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ আসিয়া জুটিল। সহজানন্দ তখন 'স্বামী নারায়ণ' নাম গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে বিশপ হীবর গুজরাটে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার Journal নামক গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এইরূপ :—

"এই সাধুপুরুষ মধ্যমাকৃতি, কৃশাঙ্গ, প্রায় আমার সমবয়সী, সাদাসিদে সহজ মানুষের মতই বিনীত নম্রস্বভাব—তাঁহার আকার প্রকারে কোনরূপ অসাধারণ প্রতিভার চিহ্ন দেখিলাম না। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন,—আমি ভাবিয়াছিলাম এক, দেখিলাম অন্য দৃশ্য—তিনি প্রায় দুই শত ঘোড়-সোয়ার সঙ্গে মহা ঘটা করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুইজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ এইরূপ সৈন্যসামন্ত লইয়া

---

* রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩

সহর তোলপাড় করিয়া তুলিলেন, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম আমার সৈন্যদল যদিও অল্পসংখ্যক তথাপি শিক্ষা ও শস্ত্রবলে বলবত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে অন্য হিসাবে কত তফাৎ! আমার সেনাগণ আমাকে জানে না চেনে না, যন্ত্রের ন্যায় আমার কাজ করিয়া যাইতেছে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই। স্বামীর রক্ষকগণ তাঁহার শিষ্য, অনুরক্ত ভক্ত, তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য দূর দূর হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছে, তাঁহার কোন বিপদ হইলে শরীরের রক্ত দিয়া তাঁহার সংরক্ষণে প্রস্তুত—হায়, খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রতি ভারতবর্ষীয়দের প্রীতি ও অনুরাগ এইরূপ কবে হইবে!"

Bishop Heber's Journal—Ch. XXV.

সহজানন্দ শীঘ্রই বুঝিলেন যে তাঁহার বিচ্ছিন্ন শিষ্যদের লইয়া একটি দলবন্ধনের প্রয়োজন, এই উদ্দেশে তিনি শিষ্যগণসহ বর্ত্তাল নামক এক বিজন পল্লীতে গিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথা হইতে ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন। এইক্ষণে বর্ত্তাল গ্রামে স্বামী নারায়ণ-পন্থীদের দুইটি মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বামে স্বামী নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি। কেমন সহজে তিনি কলিকালের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন—আশ্চর্য্য! আমাদের দেশে সাধু পুরুষের দেবাসন অধিকারের জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

এই ধর্ম্মপ্রাণ স্বামী তাঁহার জীবনের শেষপর্য্যন্ত প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামী নারায়ণ-ধর্ম্ম ক্রমে গুজরাটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামিজী স্বীয় কার্য্য পরিদর্শনার্থে ভ্রমণে বাহির হইতেন—ভ্রমণপথে অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাঠেওয়াড়ে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

স্বামী নারায়ণ-পন্থীর দুই শ্রেণী—সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত, গেরুয়া বসন-ধারী সন্ন্যাসী। তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ইহারা সমুদায় সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি—চাষা কুলী প্রভৃতি হীনজাতীয় লোকের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া সমাজে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। স্বামী নারায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী। ইহা স্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় দুই শত দ্বাদশ শ্লোকে বিরচিত—কতকগুলি তাঁহার নিজের রচনা, অন্যগুলি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানি স্বামী নারায়ণী 'বাইবেল'। ইহার আদ্যোপান্ত ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের কণ্ঠস্থ ইহার সার কথাগুলি নিম্নে লিখিত হইল;—

জীবহিংসা করিবেক না।

মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ; মদ্য অপেয়, অগ্রাহ্য, ঔষধার্থেও সেবন করিবেক না।

চৌর্য্য, ব্যভিচার, আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা, অশ্লীলবাক্য পরিহার করিবেক।

স্বধর্ম্ম পালন করিবে—পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। শ্রুতি স্মৃতির বিধানই ধর্ম্ম।

অর্থলোভে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেক না।

প্রত্যুষে উঠিয়া কৃষ্ণনাম জপিবে—'শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম', এই মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করিবেক।

সেই অন্তর্যামী পুরুষ যিনি জগতের আদিকারণ, তাঁহাকে কৃষ্ণ ভগবান পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম যে নামেই হোক্ স্মরণ ও ভজনা করিবেক। মন্দিরে গিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিবেক। তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি ভক্তিতেই আমাদের মুক্তি।

দেবভক্তি ও কর্ত্তব্য পালন—ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সধন গৃহস্থ অর্জনের দশমাংশ এবং নির্ধন বিংশভাগ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে।

আমার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিবেন, চতুর্ব্বর্গফল তাঁহাদের অব্যর্থ পুরস্কার।*

কড়ুয়া কণবী

গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লেওয়া কণবী ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়া কণবী একত্রে পানভোজন করিতে পারে কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান প্রদান নাই।

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, একদিন হর-পার্ব্বতী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। মহাদেব উমাকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপস্যা করিতে চলিলাম, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিব। এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহ-বিধুরা উমা কথঞ্চিৎ কালহরণ করিবার জন্য মৃত্তিকার পুত্তলী গড়িয়া পূজা করিতেন। বার বৎসর পরে মহাদেব ফিরিয়া আসিলেন এবং উমার অনুরোধে ঐ সকল পুত্তলীকে জীবনদানকরতঃ সচেতন করিলেন, তাহা হইতেই কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই হেতু কণবী জাতি উমার বিশেষ ভক্ত। যে স্থানে মহাদেব বার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা গাইকুয়াড় পরগণার উমা নামক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সেখানে একটি দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠিত, এই দেবীর আদেশক্রমে কড়ুয়া কণবীদের বিবাহ লগ্ন

* Religious life and thought in India. Monier Williams.

স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করিলে পূজারীগণ বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকে।

এই বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া সেই একই দিবসে সম্পন্ন হয়। মাসেকের দুগ্ধপোষ্য হইতে যোগ্যবয়স্কা কন্যা পর্য্যন্ত সকলেই এক-একটি বরের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। এই অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং পারত পক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদি কারণবশতঃ কোন কন্যার পাত্র না পাওয়া যায় ত পুষ্পরাশির সহিত তাহার নামমাত্র বিবাহ দেওয়া হয়, পর দিবস সেই সকল ফুল কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু সমান পরিগণিত হয় এবং তৎপরে সেই কন্যার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ হইবার কোন বাধা হয় না। ঈদৃশ আর একটি প্রথার নাম 'বাহুবর' বিবাহ। অর্থাৎ যদি স্বজাতীয় কোন পুরুষ পূর্ব্ব হইতে অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে এই কন্যার বিবাহের পর আমার কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে বিবাহিত কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্যাদানের অব্যবহিত পরেই বিবাহবন্ধন হইতে বর কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যে স্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় তাহার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দ্দিষ্ট কাল ভিন্ন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু একবার নামমাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্ব্বিবাহ সম্ভবে এবং এইরূপ বিবাহের কোন নিরূপিত সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। 'বাহুবর' বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর-ক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়া হাতের চুড়ি ফেলিয়া দিয়া স্নান করে, যেন তার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মুসলমানদের যেমন নিকা, নীচবর্ণ হিন্দুগণের সেইরূপ নাত্রা। নাত্রাতে বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয়বাহুল্যও নাই। অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্ব্বেই যে রমণীর বৈধব্য হয় অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে নামস্থ বিবাহের পর যে স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার সাড়ীর অঞ্চলে গাঁঠ দেওয়া হয়, এবং এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী অশ্বারূঢ় হইয়া জনতার মধ্য দিয়া গীত-

বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহাদিগকে গণপতি পূজা করাইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা।

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন কখন স্থির হইয়া থাকে। দুই প্রতিবেশীর নিজ নিজ পত্নী গর্ভবতী হইলে তাহারা এইরূপ যুক্তি করে যে, তোমার পুত্র আমার কন্যা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক স্ত্রীর কন্যা ও অপরের পুত্র জন্মে ত অঙ্গীকার মত উপযুক্ত সময়ে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়।

সকলের কূল সমান নহে। পূর্ব্বপুরুষের কৃতি ও সুখ্যাতিবশতঃ কোন কোন বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে অনেকটা জন্মভূমির উপর বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। আহমদাবাদের আদিমবাসী কণবীগণ কুলশীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত। কুলীনের সহিত কন্যার কিসে বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য। নীচকুলে কন্যাদান মহা অপমানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগত-যৌবন হয় তথাপি সে প্রার্থনীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে তাঁহারা দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চ কুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন এবং বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যয়। এই হেতু কুলাভিমানী নির্ধন কণবী এবং রাজপুতদের মধ্যে কন্যাহত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতামাতা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, এই প্রথার নাম 'দুগ্ধপীতি'। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথার ন্যায় রাজশাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর নীচবর্ণ হইলে তাহাকে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে আপন পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্যা পাওয়া যায়। মনে কর রণছোড়ের এক ভগিনী ও দাজীর একটি কন্যা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ দিয়া দাজীর কন্যাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার তিন ভাগিনী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভগিনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপ বিবাহকে সট্টা বিবাহ বলে।

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থলালসায় বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপন অভিলষিত নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত

করে; কিন্তু আইন অনুসারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহার নায়ককেই দণ্ডভোগ করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে এই সকল মকদ্দমা কোর্টে যাইবার পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জাতীয় শাসন বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। জাতীয় পাঁচজন মিলিয়া যে বিধান করেন তাহা উভয় পক্ষেরই শিরোধার্য্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর একজনের সংসর্গে বাস করে—স্বামী স্বজাতীয় লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত করেন। জাতির মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, ইহা হইতে গুরুতর দণ্ড আছে কি না সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হইল যে, পর-স্ত্রী গ্রহণের দণ্ডস্বরূপ ৩০০ টাকা দণ্ড দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রয় করিতে হইবে ত অগত্যা তাহাই কবিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়।

যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের বিবাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্যারত্ন পাইবার জন্য তাহাদের প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়, এবং অর্থাভাবে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাজে কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল বিবাহার্থী পুরুষদিগকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক এক এক কন্যা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্যা হয় ত অন্য জাতীয়, অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্যার জন্য বুভুক্ষিত মৎস্যের ন্যায় তাকাইয়া আছেন, টপ্ করিয়া টোপ পাড়ল কি অমনি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আট্‌কাইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্য গ্রামের দুই একজন ভদ্রলোক হয় ত জামীন হইল, তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া ছল-বল-কৌশলে তাহাদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্যাকর্ত্তার হাতে টাকা গণিয়া দিয়া মহা উল্লাসে উদ্বাহ-শৃঙ্খল গলে পরিলেন—পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন যে কন্যা নাই, কন্যাকর্ত্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্—পরে সন্ধান পাইলে হয় ত আদালতে এক প্রকাণ্ড মকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মুদিয়া পর-স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন—এদিকে সেই স্ত্রীর যে স্বামী তাহার বাটীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী কোথায় পলায়ণ করিল, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে গিয়া কন্যাকর্ত্তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। সত্য নিরূপণ করিতে বিচারপতির মাথা ঘুরিয়া যায়। স্বামী চান তাহার স্ত্রী, উপস্বামী,

প্রতারকদল সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন, আমার স্বামী আমায় ম বোন্ বলিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন—এই স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতাম? প্রতারকদল বলিতেছে, আমরা কিছুই জানি না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করিয়াছে, বর কন্যা আমরা কাহাকেও চিনি না—আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে পুলিশের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষী আনিয়া হাজির। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপার?

গরবা

গুজরাটী রমণীগণ সুরূপা, মিশুক ও আমোদপ্রিয়। গুজরাটে গরবা বলিয়া একরকম গান নারীমহলে প্রচলিত। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির উৎসবের আরম্ভ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই গরবা গানের ধূম লাগিয়া যায়। আহমদাবাদ বরদা সুরাট প্রভৃতি গুজরাটের প্রধান প্রধান নগরে কুলস্ত্রীগণ মিলিত হইয়া গরবা গানে মাতিয়া যায়। গীতের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বিবাহাদি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে গরবা গান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। নাগর ব্রাহ্মণ রমণীরাই এই গানের ওস্তাদ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁরা সুগায়ক—বন্ধুবাটীতে গান গাহিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়। গরবা একজনেও গাহিতে পারে কিন্তু সচরাচর নারীমণ্ডলী মিলিয়া গায়। গরবা গাহিবার রীতি এই।—একদল গায়িকা চক্র বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে গীত আরম্ভ করে। আরম্ভের সময় প্রধান গায়িকা যিনি তিনি দুই এক তান ধরেন, পরে তাহাতে আর সকলে যোগ দেয়। প্রত্যেক চরণ দুইবার করিয়া গীত হয়। এমনও হইতে পারে যে গীতের প্রধান অংশগুলি প্রধানা কর্ত্তৃক গীত হয়, কেবল ধূয়াতে আর সকলে সমস্বরে যোগদান করে। এইরূপ চক্রাকারে তালে তালে করতালি ধ্বনিতে নাগরিকাদের মধুর সঙ্গীত গুজরাট ভিন্ন আর কোথাও শুনি নাই। না শুনিলে ইহার প্রকৃত মাধুর্য্য বোঝা যায় না।

পেশাদারী শোক-প্রকাশ

গুজরাটে একটা অদ্ভুত রীতি আছে—শোকের ভান করিয়া বুক চাপড়াইয়া পেশাদারী শোক-প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতে হইলে একদল স্ত্রীলোক ভাড়া করিয়া আনা হয়, তাহারা বক্ষাঘাত করিয়া মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে। পথে
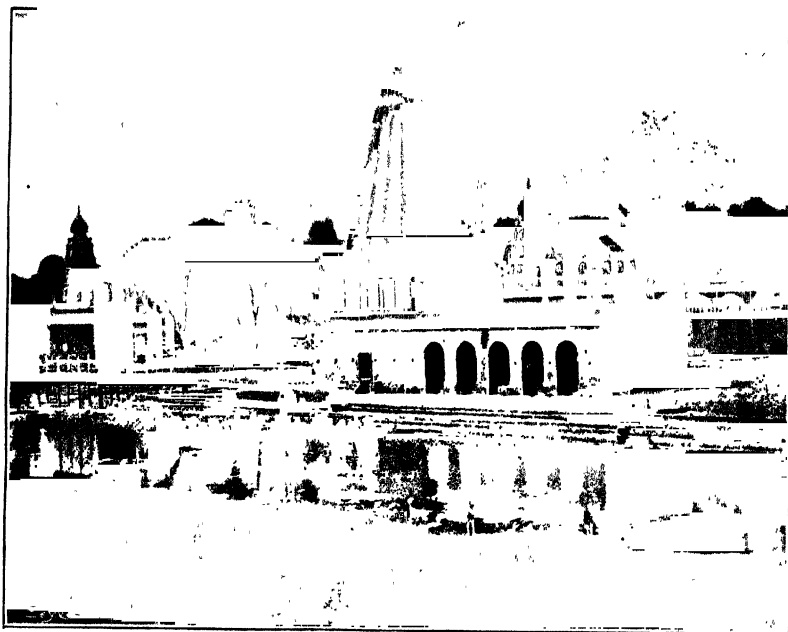
পার্ব্বতী মন্দির—পুণা (১৮৬ পৃষ্ঠা)
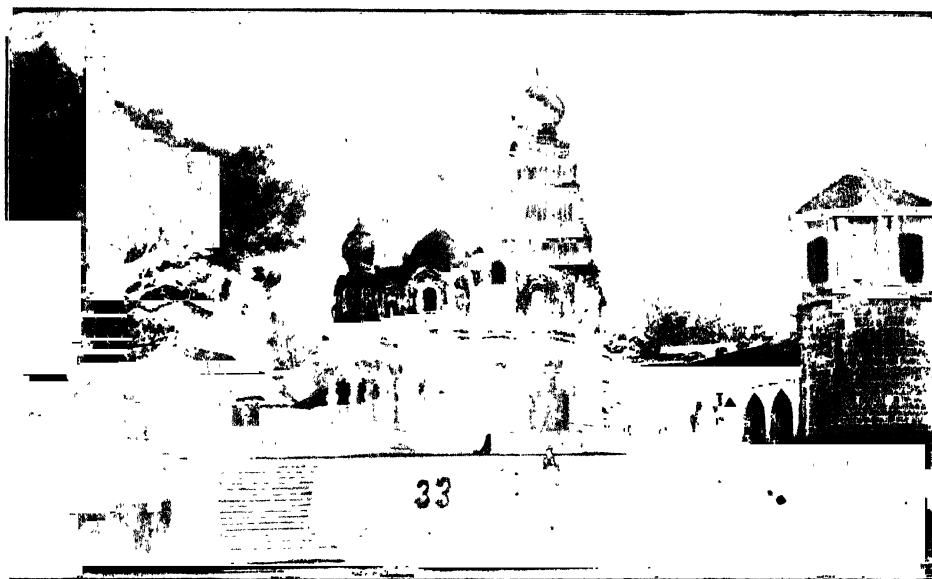
সঙ্গম্ ঘাট—পুণা (১৮৬ পৃষ্ঠা)

ঘাটে এইরূপ শোকাভিনয় দেখিতে পাইবে। দেখিলে মনে হয় যেন কাহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই শোককারী নারীদিগের তালে তালে বক্ষাঘাত, অশ্রুহীন বিলাপধ্বনি এবং কৃত্রিম ভাবভঙ্গী দেখিয়া শীঘ্রই সে ভ্রম দূর হয়।

ভাঁড়ের যাত্রা

শোকের কাহিনী হইতে একটু আমোদের কথা বলিয়া এই ভাগ শেষ করি। আমি যখন প্রথম আহমদাবাদে যাই তখন সেখানে একটা পার্টি দিয়াছিলাম—তাহাতে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে আমোদের যে সব সরঞ্জাম ছিল তার মধ্যে ভাবইয়া নামে ভাঁড়ের যাত্রার দল আনানো হইয়াছিল। ভাবইয়ারা উপস্থিত ঘটনা বর্ণনায় ও লোকজনের চরিত্র নকলে পরম পটু। তাহারা যে সময়কার চিত্র প্রদর্শন করিতেছিল তখন বোম্বায়ে "সেয়ার মেনিয়া" রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেয়ার কিনিবার জন্য পাগল। নিঃস্ব কাঙ্গাল—যাহার ঘরে অন্ন জোটে না সেও একরাত্রির মধ্যে সম্পদবান্ হইয়া উঠিবে—লোকের এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। ইংরাজ মারাঠী গুজরাটী এই সংক্রামক রোগ সকলকেই ধরিয়াছে। সেই ঝোঁকে ইংরাজ ও দেশীয়দের বিলক্ষণ মেলামেশা হইত। নেটিব তখন ইংরাজের অবজ্ঞার পাত্র ছিল না। তখন তাহাদের গলাগলি ভাব দেখে কে? সেয়ার বাজারের রাজা ছিলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, তাঁর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে সেয়ার বাজারের উত্থান পতন হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার দরবারে গিয়া খোসামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পর্য্যন্ত কখন কখন সেয়ার ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাটি ভাঁড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে লইয়া সেয়ার আবদারের জন্য বাহির হইয়াছেন দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে কি গোলযোগ উপস্থিত! চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ! একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বজাতির ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তম মধ্যম প্রহার আরম্ভ করিলেন, সেই গোলমালে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঁড়ের খেলা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল। আমরা হাসি কি কাঁদি—কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

গুজরাট আমার সর্ব্বিসের প্রথমকালের বিহারক্ষেত্র। সে দেশের লোকের সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয়বন্ধন। সেই নবানুরাগের আভা আমার স্মৃতিমন্দিরে নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিবে।

মারাঠা দেশ (দক্ষিণ) ও মারাঠী

গুজরাটের চেয়ে মারাঠা দেশের সঙ্গে আমার সমধিক পরিচয়। আমার সর্ব্বিসের প্রথম ভাগ গুজরাটে কাটানো যায়, অবশিষ্ট ভাগ সিন্ধুদেশ, কানাড়া, কোঙ্কণ ও দক্ষিণে অতিবাহিত হয়। পুণা, আহমদনগর, নাসিক, ধূলিয়া, সোলাপুর, সাতারা এই সকল প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত, কোর্টের ভাষা মারাঠী।

পুণা

পুণানগরী মূলা ও মূঠা এই দুই নদীর সঙ্গমে সংস্থাপিত, এই পুণ্যসঙ্গমে পুণার বিশেষ মাহাত্ম্য। একটি বাঁধ বেঁধে স্রোতের জল আট্‌কে রাখা হয়েছে, তাই নদী দুটি এ অঞ্চলের আর আর নদীর মত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় না, বার মাস পূর্ণ থাকে। বর্ষায় বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জল উথলে পড়ে, দেখতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুন্দর দেখায়। বাঁধের ধারে ছোটখাট একটি সুন্দর বাগান পুরবাসীদের সান্ধ্য সম্মিলনের স্থান। পুণা পেশওয়াদের রাজধানী ছিল, সেই প্রাচীন পেশওয়াই ভাগ সহরের অভ্যন্তরে। সেকালের কতকগুলি ইমারতের মধ্যে আসল যে রাজবাটী (বুধবার বাড়া) তা কোন দুরাত্মার কুচক্রে পড়ে পুড়ে গিয়েছে—ঐ ভাগের আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাতে পুরাণো পেশওয়াই গৌরবের কোন চিহ্ন নেই। প্রশস্ত পথ ঘাট, কলেজ জেল হাঁসপাতাল সার্ব্বজনিক সৌধসমন্বিত যে অঞ্চল তাই নব্য পুণা সহর। ইহার প্রান্তবর্ত্তী ঐতিহাসিক ক্ষেত্র খিড়কী ও পার্ব্বতী-মন্দির উল্লেখযোগ্য। খিড়কী এইক্ষণে ইংরাজ-সেনানিবাস। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের মূলে যে সকল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, খিড়কীর যুদ্ধ তার মধ্যে গণনীয়। এই যুদ্ধে পেশওয়ার পতন ও পুণা ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। যে স্থান হতে পেশওয়া বাজিরাও এই শেষ যুদ্ধের বাজী সোৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করছিলেন সে এই পার্ব্বতী-মন্দির। বাজী হেরে পেশওয়ার চির-বনবাস!

পুণার বিদ্যামন্দির—ফরগুসন কলেজ

পুণার ভূষণাস্পদ অনেক জিনিস আছে, আর সব ছেড়ে দিলেও এই বিদ্যালয়গুলি তার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ বলা যেতে পারে। পুণায় কলেজ চারিটি—দক্ষিণ, ফরগুসন, কৃষি ও এঞ্জিনিয়ারিং।

দক্ষিণ কলেজ ভারতের অপরাপর ইংরাজি কলেজের ছাঁচে গঠিত, ফরগুসন কলেজই এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ অনেকটা আমাদের বোলপুর বিদ্যালয়ের

পুণা-সহরের পথ (১৮৩ পৃষ্ঠা)

মারুতি-মন্দির (১৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রতিচ্ছবি বলে আমার মনে হয়; গুরুকুলে অধ্যয়নের যে উপকারিতা এর ভিতরে তা কতক অংশে লাভ করা যায়। এই কলেজের বিশেষত্ব এই যে, এর যে কুড়ি জন অধ্যাপক আছেন তাঁরা সবাই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত, অথচ প্রত্যেকে আপনার যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য বেতনেই সন্তুষ্ট। এঁরা সকলেই কুড়ি বৎসর কাল স্বল্প বেতনে অধ্যাপন-কার্য্যে প্রতিশ্রুত। কলেজটি প্রেসিডেন্সির অন্যান্য কলেজের তুলনায় কোন অংশেই হেয় নয়—এর ছাত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৯৫০। অনেকানেক ছাত্র কলেজ সংলগ্ন হোষ্টেলে বাস করে—অধ্যাপক কানিটকর তাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। আশপাশে ভূমির অভাব নাই। তাতে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার জন্যে ক্রীড়াক্ষেত্র রয়েছে--তা ছাড়া বাকী জায়গায় ছয়জন অধ্যাপকের বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শেখবার জন্যে একটি ছোটখাট বাগান আছে। এই সকল পবিত্র চরিত্র সদ্‌গুরুর সহবাসলাভ বিদ্যার্থীদের সামান্য লাভ নহে। অধ্যাপকদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ কার্য্যকর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ছাত্রগণ যাতে সংযম অভ্যাস করতে পারে, আত্মনির্ভর শিক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে অধ্যাপকদের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। ছাত্রজীবনের যা কিছু প্রয়োজন তা যোগাবার ভার তাদের নিজেদের হাতেই অর্পিত—তাদের আপন আপন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা আপনাদেরই করে নিতে হয়। একটি ব্যায়াম-সভা তাদের হাতে ভালরূপই চলছে। তাদের পুস্তকালয় পাঠগৃহ তারা নিজেদের ভিতরেই দেখে শুনে পরিচালন করছে। বোলপুর বিদ্যালয়ের কার্য্যব্যবস্থাও কতকটা এইরূপ। Times of India পত্রের পুণার সংবাদদাতা এই কলেজ সম্বন্ধে লিখছেন—

"ইউরোপে শিক্ষাশাস্ত্রের যেমন উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির আদর্শে ফরগুসন কলেজে শিক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ক্ষুদ্র স্কুল নহে কিন্তু বাস্তবিক একটা বড় কলেজ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করাই ইহার লক্ষ্য নহে; কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতি অধ্যাপকদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয়। এই কলেজ পরিদর্শন করিলে মনে হয় যেন পাশ্চাত্য বড় বড় ইউনিবর্সিটির উচ্চশিক্ষার বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এই কলেজে এইক্ষণে পনর জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র হোষ্টেলের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।"

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার যে সকল স্থান আছে তার মধ্যে পুণা-এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একটি প্রসিদ্ধ। এই কলেজের অধীনে ছুতার, কামার ও আর আর বড় বড়

কলকারখানার দোকান আছে, তাহাতে ছাত্রগণ নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করে এবং তাদের হাতের কাজ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। দেখতাম অনেক বাঙ্গালী ছাত্র এখানে এসে অধ্যয়ন করছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমাদের একটি আত্মীয়কে সেই কলেজে দেবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে তাকে ভর্ত্তি করে দেওয়া গেল, পুণায় থাকবার এমন সুবিধা করে দিলাম যা অন্য কোন বিদেশী ছাত্রের সহজে হয় না—স্বয়ং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছেলেটিকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হলেন। সবই হল কিন্তু দৈব প্রতিকূল। তাকে কি একটা রোগে ধরলে, বৈদ্যশাস্ত্রে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শেষে জানা গেল সে রোগের নাম Home Sickness, কিছুতেই ওদেশে তার মন টিঁকলো না। মার কোলে ফিরে এসে ছেলে তবে নিস্তার পায়। পৃথিবীতে দু রকম লোক আছে, কেউ কেউ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে উজান বয়ে যেতে অক্ষম। কেহ বা অবস্থা যেমনই হোক্ তাকে আপনার মনের মতন করে গড়ে নিতে পারেন, যিনি আত্মবলে আপনি আপনার ভাগ্যবিধাতা। প্রকৃতি ও আত্মশক্তি, দৈব ও পুরুষকার, মানুষের এই দুই ভাগ্য-সূত্রধার। এদের মধ্যে আত্মবান্ পুরুষই ধন্য।

"দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"

এই উপদেশ মত কার্য্য কর, কৃতী হবে—মানুষ হবে।

গোবিন্দ বিঠ্ঠল কড়কড়ে

গোবিন্দ কড়কড়ে পুণা (দক্ষিণ) কলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের অনেককালের বন্ধু। যখন প্রথম বিলাতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে বাস করি তখন তাঁর সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হত—সে ত পঞ্চাশ বৎসরেরও আগেকার কথা। আমার বোম্বাই প্রবাসকালে আমরা বরাবর বন্ধুত্বসূত্রে বাঁধা ছিলাম—আজ পর্য্যন্ত তা অটুট রয়েছে।

মারাঠী জাতির অনেক পদবীই বাঙ্গালীর পক্ষে কৌতুকাবহ কিন্তু নাম ছাড়াও গোবিন্দ কড়কড়ের অনেকগুলি ভাবসাব হাস্যরসাত্মক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খৃষ্টান, ব্যবসায়ে অধ্যাপক, এবং স্বভাবে কিঞ্চিৎ পাগল। এমন কি, চাকর এবং ছেলেদের মহলে তিনি "পাগলা সাহেব" বলেই খ্যাত ছিলেন। "ছিলেন" শুনে যেন কেউ না মনে করেন যে বেচারা গোবিন্দ ইহলোকে নাই। আশা করি আমাদের

মুলা মুঠা সঙ্গম—পুণা

(১৮৬ পৃষ্ঠা)

বাঁধ উদ্যান—পুণা
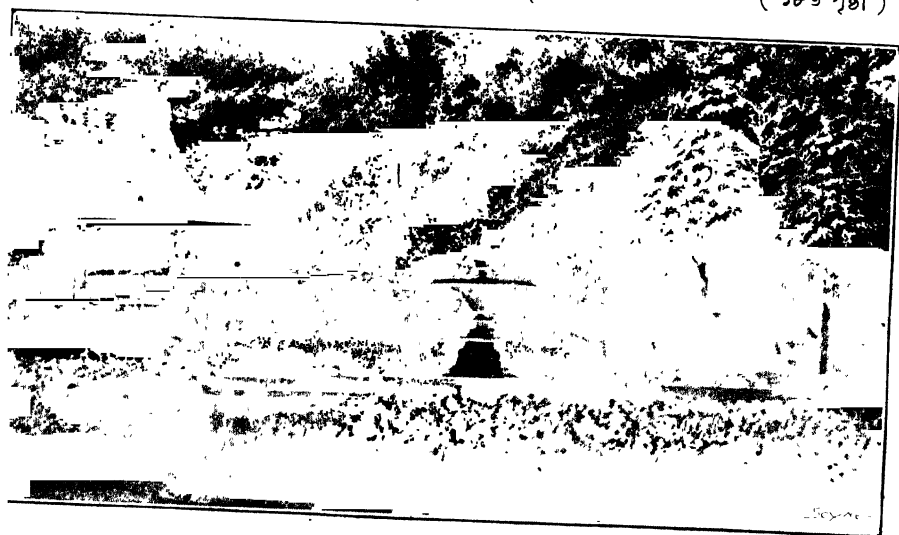
(১৮৬ পৃষ্ঠা)

এই পুরাণো বন্ধুটি সুস্থ শরীরে ও শান্তচিত্তে তাঁর নির্জ্জন অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করছেন। তবে বহুদিন হল তাঁর কোন খবর পাইনি। এক একবার তাঁর সহাস্য গৌরবদন দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে পরিবারের নবাগতগুলিকে পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বয়সে তাঁর খিড়কিস্থিত কোটর থেকে তাঁকে কলকাতায় টেনে আনা শক্ত ব্যাপার।

গোবিন্দের জীবনী একটু নতুন রকমের। তাঁর পিতা বোম্বাই প্রদেশের কোন আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন কিন্তু এক সময়ে তহবিলের কিছু গোলযোগ হওয়ায় তিনি ফেরাব হন। সেই সময়ে বালক গোবিন্দ সহরের কলেক্টর সাহেবের নিকট যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। এই সুদর্শন বালকটিকে দেখে কলেক্টর Tucker সাহেবের মমতা হয় এবং তিনি ওঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দেন এবং অর্থের সাহায্য করেন। পরে ছুটিতে বিলাত যাবার সময় বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে যান—বিলাত গিয়ে গোবিন্দ কেম্বিজ ইউনিবর্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। সেখানে সম্মানের সহিত অঙ্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে এসে অনেক চেষ্টার পর তিনি পুণার দক্ষিণ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং সেই পদেই জীবনের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি বিপত্নীক হন এবং পুনরায় কখনো দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করলে ছেলেদের বলতেন—"সে খবর পেয়ে আমি মূর্চ্ছা যাই!" আর তাঁর গুটিকয়েক দাঁতের অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বলতেন, স্ত্রী ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর সেই বাল্য-সঙ্গিনীকে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় মনে আছে মাত্র, তা অন্য সময় স্বীকার করতেন। পরে এক সময়ে কোন স্বদেশিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন। সেই সূত্রে বলেন, "I had a narrow escape—The girl was so volatile and changeable!"

বিলাতে সাহেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই হোক্ কিম্বা যে কারণেই হোক, তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস কি জানি না কিন্তু পোষাক ও আচার অভ্যাসে সাহেব হলেও তিনি মনে মনে অনেক বিষয়ে স্বদেশী, এবং পুণার হিন্দু সমাজের অনেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু—বিশেষতঃ স্বদেশী সঙ্গীতের তিনি যথার্থ অনুরাগী ভক্ত। তাঁর উদ্যোগে আমরা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক ভাল গাইয়ের গান শুনেছি। গান শুনতে শুনতে তিনি যেরূপ উৎসাহে মত্ত হয়ে বাহবা দিতেন, এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করতেন, তা দেখে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ত। তাঁর নিজের বেশ সুর-জ্ঞান আছে, গলাও ভাল। কিন্তু হলে কি হবে, কোন গানের দু লাইন, কোন গানের আস্থায়ী মাত্র গেয়ে হুঙ্কার দিয়ে শেষ

করে দেন, অর্থাৎ তাঁর বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত। এক একটা তান কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁর মুখে লেগে থাকত, তার পরে থেমে যেত। আমাদের একেলে বাঙ্গলা গান বা গলা তাঁর পছন্দ হত না এবং আমাদের মধ্যে যাদের ভাল গাইয়ে মনে করি তাদেরও গান শুনে তিনি ব্যঙ্গসহকারে নকল করতেন ও বলতেন, "সপ্ত স্বরের" তোমরা কিছুই জান না। আমাদের পরিবারকে তিনি আরো নানা প্রকার ঠাট্টা করতেন; যথা,—"Just like the Tagore family they make ten different engagements at the same time". ইত্যাদি।

তাঁর নিকট-আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে, তাদের কাউকে আমি দেখিনি, তবে শুনেছি বটে যে বিপদ আপদে তাদের সাহায্য করেন। নিজেই বলতেন যে তাদের আমি নিয়মিত টাকা পাঠাই এবং বলে দিয়েছি যে আমার কাছে এসে কেউ জ্বালাতন করো না। মুখে যাই বলুন পরদুঃখে তিনি কাতর আর দানে মুক্তহস্ত। আমাদের কোন জামাতাকে নতুন বিবাহের পর দেখে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন এই করলেন যে "তোমার গরীব আত্মীয়দের সাহায্য করতে হয় কি না?" বোধ হয় নিজে সে বিষয়ে ভুক্তভোগী। বহুকাল একক জীবন যাপন করায় ইংরাজসমাজ-খ্যাত চিরকুমারীর ন্যায় তাঁর কতকগুলি পারিপাট্যের অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। ঘরের আসবাবগুলি একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে যার বিয়ে আগে হবে তাকে অমুক আসবাবটি দেবেন বলে লোভ দেখাতেন। তাদের সঙ্গে কতরকম মুখভঙ্গী করে ঠাট্টাতামাসা করতেন তা বলে শেষ করা যায় না। পঞ্চাশোর্দ্ধেও কতকগুলি বিষয়ে তিনি যেন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন। কতবার আমরা তাঁর আতিথ্যস্বীকার করে তাঁর সঙ্গ উপভোগে আমোদে দিন কাটিয়েছি। তাঁর ঘর দুয়ার, খাবার বন্দোবস্ত সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। "আজনা" (অর্জ্জুনা) একটি পুরাতন ভৃত্য—কথায় কথায় তার ডাক পড়ে। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সাজটিও দেখবার জিনিস! গায়ে কোট নেই, মাথায় একটি লম্বা রাজটুপী, পায়ে চটিজুতা, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য নাটেকর নামক তাঁর সুগায়ক বন্ধু গৃহে উপস্থিত; গায়কের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহও সপ্তমে চড়ে উঠেছে। আমরা এক একবার মনে করতেম, এ পাগল কলেজে গম্ভীরভাবে অধ্যাপনা করেন কিরূপে! কিন্তু মস্তিষ্কের গোলে তাঁর কাজের কোন প্রকার গোল হয়েছে বলে ত কখন শুনিনি। ছাত্রেরা তাঁকে খুবই ভালবাসত দেখতুম। তাঁর সংসারে ভালবাসার জিনিসের মধ্যে ছিল কতকগুলি গরু বাছুর। বারান্দায় দরমার ব্যাড়ার জানলার মধ্য দিয়ে তারা কখনো কখনো মুখ বাড়িয়ে দিত আর তিনি তাদের কত আদর করতেন—আর ছেলেদের বলতেন, "এই দেখ, একেই ত বলে
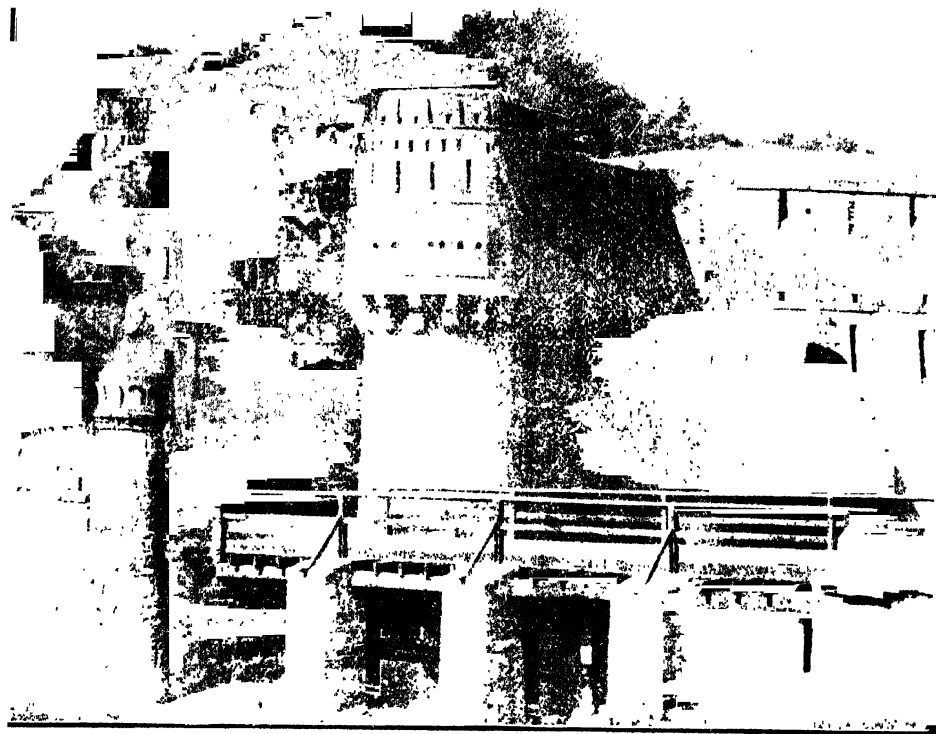
সোলাপুর দুর্গ (১৪০ পৃষ্ঠা)

সংসার!” বাস্তবিক, এ ভিন্ন তিনি অপর কোন সংসার কখনো করেন নি। কোন একটি বন্ধুর ছোট ছেলের মৃত্যু হওয়ায় বড় ছেলেটিকে তার বাপ মা সিবিল সর্ব্বিস ছাড়িয়ে কাছে রাখবার জন্য ব্যস্ত শুনে গোবিন্দ বলেছিলেন, “এ আবার কি পাগলামি। ছেলে ত মানুষের গিয়েই থাকে।” তার পর যখন তাঁকে বুঝানো হল যে তাঁর গরু বাছুরের মধ্যে সবে-ধন-নীলমণি একটি বাছুর যদি মারা যায় তাঁর কি রকম কষ্ট হয়, তখন তিনি পুত্রশোকের মর্ম্ম কতকটা উপলব্ধি করতে পারলেন।

আমাদের কাছে তিনি মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন, বিশেষতঃ কোন স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে হাওয়া বদল করতে যাবার সময় সানন্দে সঙ্গ ধরতেন। এইরূপে একবার সিমলা পাহাড়ে অবস্থানকালে তাঁর গাল রক্তবর্ণ হয়েছিল। তাঁর গাল লাল হয়েছে বলে তাঁর মহা ভাবনা উপস্থিত এবং আয়নায় মুখ দেখে আমাদের গাল দেখিয়ে ক্রমাগত বলতেন “I say why are my cheeks so red”— যেন ভারি একটা অসুখের চিহ্ন! আমরা তাঁর সঙ্গে ইংরাজিতেই বাক্যালাপ করতেম, আর আমাদের বাঙ্গলা কথা শুনে তিনি “হচ্ছ কচ্ছ” বলে ঠাট্টা করতেন। আপনার মনে বকা তাঁর এক পাগলের অভ্যাস। বেঁটেখাটো সুন্দর মানুষটি, হ্যাট কোট পরে, লাঠিটি দুই হাত দিয়ে আড়াভাবে কোমরের পিছনে এঁটে ধরে যখন আমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরতেন, তখন পাহাড়ে রাস্তায় বাঁদরগুলি দেখে তাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হতেন—“আরে, ক্যায়সা হ্যায়, তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায়” ইত্যাদি। না হয় একলাই অগ্রসর হয়ে মাথা নীচু করে অন্যমনস্কভাবে ব'কে যেতেন—কখনো সেকালের কোন নামজাদা সাহেবের গালভরা নাম, যথা—Sir Alexander Coburn কিম্বা নিজের জীবনের ঘটনা স্মরণে “I owe every thing I have in this world to Mr. Tucker.” সেই যে টকার সাহেব তাঁর সাহায্য করেছিলেন, সে কথা তিনি জীবনে ভোলেন নি, এবং চিরকাল তাঁর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা পোষণ করেছেন। এ বড় সাধারণ সদ্‌গুণ নয়। তাঁর টাকা শোধ করে দিয়েছেন, শুধু তা নয় তাছাড়া টকারের ছেলেমেয়ে যার যখন কোন টাকার দরকার, জানবামাত্র অকাতরে তাহাদের সাহায্য করেছেন। এরূপ যাবজ্জীবন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে বিরল। পাওনাদার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে উল্টো তার উপরেই ঋণীর তম্বী, উপকারের প্রত্যুপকার অনেকস্থলে এইরূপই দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কেউ কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করলে তিনি বলতেন, “কৈ, আমি ত ওর কখনো কোন উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না, তবে আমার পরে চটেছে কেন?”

গোবিন্দ কড়কড়ের জীবন, মন, ধরণ ধারণ সবই একটু অসাধারণ। তাঁর মজার

রকম সকম দেখে আমরা মুখে তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা করি বটে, কিন্তু সে পাগল বেহারী চক্রবর্ত্তীর গানের 'পাগল মানুষ' স্মরণ করিয়ে দেয়—

পাগল মানুষ চেনা যায়—
ও তার হাসি হাসি মুখশশী,
খুসী ফোটে চেহারায়।

সাতারা

সোলাপুর হইতে সাতারায় আমার বদলি হয়। সাতারা শিবাজী ও তাঁহার বংশধর রাজগণের বাসস্থান। এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আমার সর্ব্বিসের শেষ তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। সেখানেই আমি কার্য্য শেষ করে ১৮৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করি। শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ঐ দেশে কাটাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভগবানের মর্জী অন্যরূপ। নানা কারণে কর্ম্মত্যাগ করে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেম। গৃহে আমার জীবনস্রোত অন্য দিকে ফিরে গেল, সেই স্রোতে আমার এখনকার এই বয়সে এসে পৌঁছেছি।

আহার প্রণালী

সাতারায় মারাঠীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা শুনা ও বন্ধুভাবে মেলামেশা হত। কখনো বা কোন মারাঠী বন্ধুর বাড়ী ভোজনের নিমন্ত্রণে যেতে হত। এদেশের ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিরামিষভোজী, মাছ মাংসের কোন পাঠই নেই। সামান্যতঃ বলতে গেলে বোম্বাইবাসীরা রুটিখোর, বাঙ্গালীদের মত ভাতজীবী নয়। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোঙ্কন, কানাড়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বর্ষার প্রাচুর্য্যবশতঃ প্রচুর ধান জন্মে—ভাতই সেখানকার লোকদের প্রধান আহার। তদ্ব্যতীত বাজরী, জোয়ারী, গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্য জন্মে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তবে এটা মানতে হবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ভদ্রলোকদের ভাত ও 'বরণ' (ডাল) ভিন্ন চলে না। রান্না অনেকটা আমাদের ধরণ, কেবল তরকারিগুলি ঝাল-প্রধান আর আমাদের মত ওদের কোন মিশ্র তরকারী রান্না হয় না। আহারের সময় কার পর কি খেতে হয় এমন বিশেষ কোন নিয়ম নেই। আমাদের যেমন তিক্ত হতে আরম্ভ করে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা নিয়ম আছে, ওদেশে মিষ্টি ঝাল লোন্তা যখন যাতে অভিরুচি তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই। মিষ্টে অরুচি হলে টক ঝাল, ঝালে অরুচি হলে আবার মিষ্টি, ঝালের মুখ মিষ্ট করে আবার লোন্তায় এসে পড়া
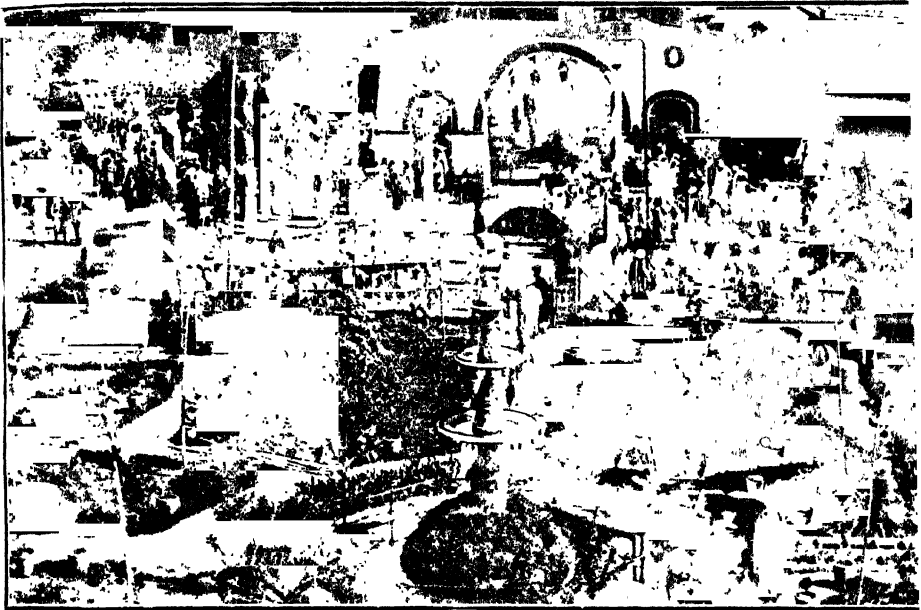
আর্থার উদ্যান—সাতারা (১৯২ পৃষ্ঠা
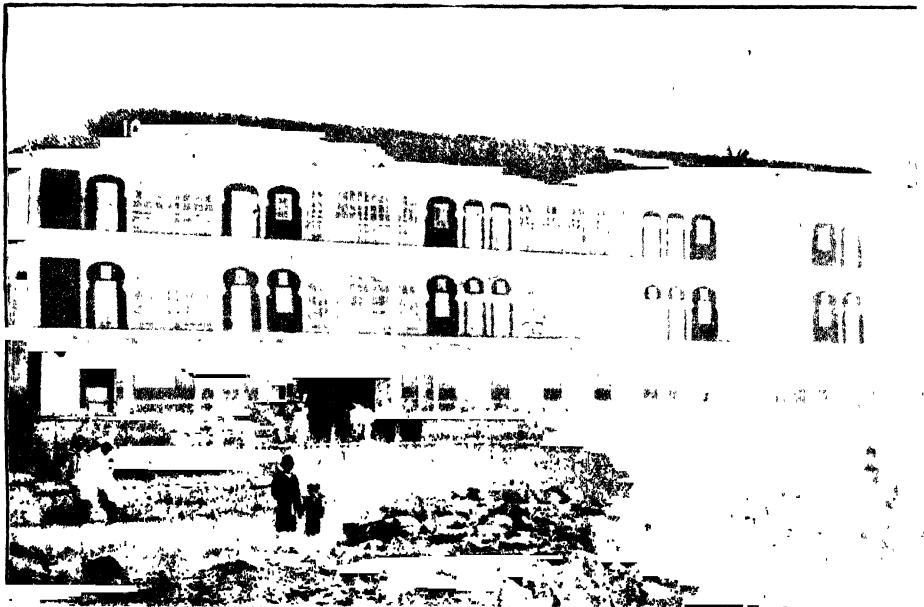
জজ্-আদালত—সাতারা (১৯৩ পৃষ্ঠা

ম্বায়। কোন মারাঠী কিম্বা গুজরাটী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে কথন্ কোন্ জিনিস খেতে হবে—কোথা হতে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমস্যা। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে তরকারী আর নানা রকম চাট্নী, অম্বলের জায়গায় 'পঞ্চামৃত', (এক রকম পাঁচ মেশালো অম্ল-মধুর ঝোল), আর 'কড়ি' এক রকম মসলামাখা টক দধির পাক। মিষ্টান্নের মধ্যে 'শ্রীখণ্ড' মারাঠীদের পরম উপাদেয় সামগ্রী, জাফরাণযুক্ত মিষ্ট দধি দিয়ে প্রস্তুত। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল ওদেশে ছানার চলন নেই, সুতরাং ওরা সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল ভাল মিষ্টান্ন হতে বঞ্চিত। কোন বাঙ্গালী ময়রা ও-অঞ্চলে মিষ্টান্নের দোকান খুল্লে বোধ করি বিলক্ষণ এক হাত লাভ করতে পারে। আহারের সময় মারাঠী গৃহস্থ রেশমের পট্টবস্ত্র (সোলা) পরিধান করেন। আহারান্তে ইংরাজী ভোজের After-dinner Speech-এর ধরণে কিছু বলা একটা মারাঠী রীতি আছে, সেটা আমার খুব ভাল লাগত। বক্তৃতা না হোক্ কোন সংস্কৃত বা মারাঠী শ্লোক কিম্বা গীতের একচরণ—এইরূপ যাঁর যা ইচ্ছা আবৃত্তি করেন, তাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতমণ্ডলীর বেশ আমোদ হয়। ডাক্তারেরা বলেন যে, আহারের সময় হাসিখুসি মিষ্টালাপে পরিপাকের সাহায্য হয়; অতএব উক্ত নিয়ম স্বাস্থ্যশাস্ত্রসম্মত বলতে হবে।

বিবাহ ও ভোজন-বিচার হিন্দুয়ানীর এই দুই দুর্গপাল। বাঙ্গলা দেশে ভোজন-বিচারের নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে মনে হয়—অন্ততঃ কলকাতায়। আমরা সহুরে মানুষ কলকাতার কথাই বলতে পারি। কিন্তু বোম্বায়ে দেখতে পাই এই আন্তর্জাতিক ভোজনের সবে মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। "আর্য্য-সঙ্ঘ" (Aryan Brotherhood) নামে ও-দেশে মাননীয় জষ্টিস চন্দবারকরের নেতৃত্বে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা জাতভাঙ্গা পণে কার্য্যারম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে সম্প্রতি ঐরূপ একটা মিশ্রভোজ দেওয়া হয়—"প্রীতি-ভোজন"। কিন্তু এই প্রীতি-ভোজন তাঁদের জাত-ভাইদের অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। তারা সভাসমিতি ডেকে তিলকে তাল করতে উদ্যত হয়েছে। মজা এই যে, দুজন মাহার জাতীয় ভদ্রলোক এই ভোজনে যোগ দিয়েছিল, শুনছি নাকি তাদের নিজের জাত থেকে বহিস্কৃত করবার হুকুম জারী হয়েছে, অথচ মাহার জাত অন্ত্যজ বলে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য। যা হোক্ মারাঠীদের মধ্যে এই জাতিভেদের বাধা অতিক্রম করবার এক সহজ উপায় আছে। আমি দেখেছি যে, বিভিন্ন জাতের মিশ্র-ভোজনে তাদের কোন আপত্তি নেই, কেবল স্বতন্ত্র পংক্তিতে আসন দেওয়া চাই। এই নিয়মে কোন মুসলমানও হিন্দুভোজে যোগ দিতে পারেন, খালি পংক্তিভেদের ব্যবস্থা করলেই হল। এই নিয়ম আমাদের orthodox হিন্দু সমাজে প্রচলিত হলে মন্দ হয় না। এই সামান্য রাস্তাটুকু খুলে গেলেও যথালাভ মনে করা যায়।

মিশ্রভোজন থেকে স্ত্রীপুরুষের একত্র ভোজন মনে পড়ল। আমরা ইংরাজদের ভোজনগৃহে নরনারীর মেলা দেখতে পাই। ইউরোপীয় সভ্যজগতের এই সাধারণ রীতি। পারসী বিদ্বন্মণ্ডলী এই রীতি অবলম্বন করেছেন। মারাঠী সমাজ এখনো অতদূর এগোতে পারেনি, তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিণীর আগমনেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। আমাদের মত নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্ত্রী পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাঁর হাতের বালাগাছটি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না।

সাতারায় এখনকার রাজা যিনি (শিবাজী রাজার বংশধর) শুনতেম তিনি দুর্ব্যসনরত নিতান্ত অপদার্থ জীব, নেশার ঘোরে কোথায় পড়ে আছেন তাঁর দেখা পাওয়া ভার। তাঁর বসবাটী দেখতে যেতেম, সেখানে এক জলপ্রাসাদ আছে আর একস্থানে শিবাজীর বাঘনখ ও পরিধেয় বর্ম্ম যত্নের সহিত রক্ষিত হয়েছে। অতীত গৌরবের সেই একটি মাত্র নিশান সাতারায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সাতারার পুরাতন রাজভবন এখন আদালত গৃহে পরিণত হয়েছে।

সাতারায় আমরা মাঝে মাঝে পার্টি দিতেম, তাতে প্রাচীন ও নব্যদলের আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হত। নিমন্ত্রিতের মধ্যে উকিল, সবজজ আর কোন কোন বাহিরের লোকও থাকতেন। উকিল প্রধান দুইজন ছিলেন—করন্দেকর ও সহস্র-বুদ্ধি। "সহস্র-বুদ্ধি" যেমন নাম কাজেও তেমনি পটু। মক্কেল জাহাজের এই দুই মাঝি। এমন মকদ্দমা নেই যাতে এই দুজনের সাহচর্য্য না থাকত। সবজজ বৃদ্ধ মারাঠী * ছিলেন তাঁকে বেশ মনে পড়ে। মতে তিনি ব্রাহ্ম, প্রার্থনা সমাজে বক্তৃতাদি দিতেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলে গণ্য নন। তিনি ও তাঁর তিন কন্যা আমাদের কাছে সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করতেন। ছোটটি এমন চুলবুলে যে ল্যাজ ধরে হাতীর পীঠের উপর চড়ে বসা তার এক মুহূর্ত্তের মামলা। আমাদের সাতারা-প্রবাস বেশ সুখে কাটানো গিয়েছিল। তখন সেখানে প্লেগও ছিল না আর "সিডিস্যান" মকদ্দমারও সূত্রপাত হয় নি—এ সব উৎপাত আমি চলে আসবার পরে হয়েছে। সাতারা একটি ঐতিহাসিক শোভনপুরী। দূরে পাহাড়ের দৃশ্য, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর, আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে মহাবলেশ্বর পাহাড় হাতের কাছে, যখন ইচ্ছা যাওয়া যেত। Union Club ও সঙ্গীত-সমাজ, এই দুইটি জায়গা দেশী লোকদের মিলনের স্থান ছিল। সঙ্গীত-সমাজে মাটঙ্গে বাওয়া নামক একটি অন্ধ গায়ক গান শেখাতে যেতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতেও শেখাতে আসতেন।

* ইনি মারাঠী ভাষায় বালকদের জন্যে Science Series রচনা করেছেন। বাঙ্গলায় স্কুলপাঠ্য এমন ভাল Series নাই, হওয়া আবশ্যক।

পুরাতন রাজবাটী—সাতারা (১৯৪ পৃষ্ঠা)
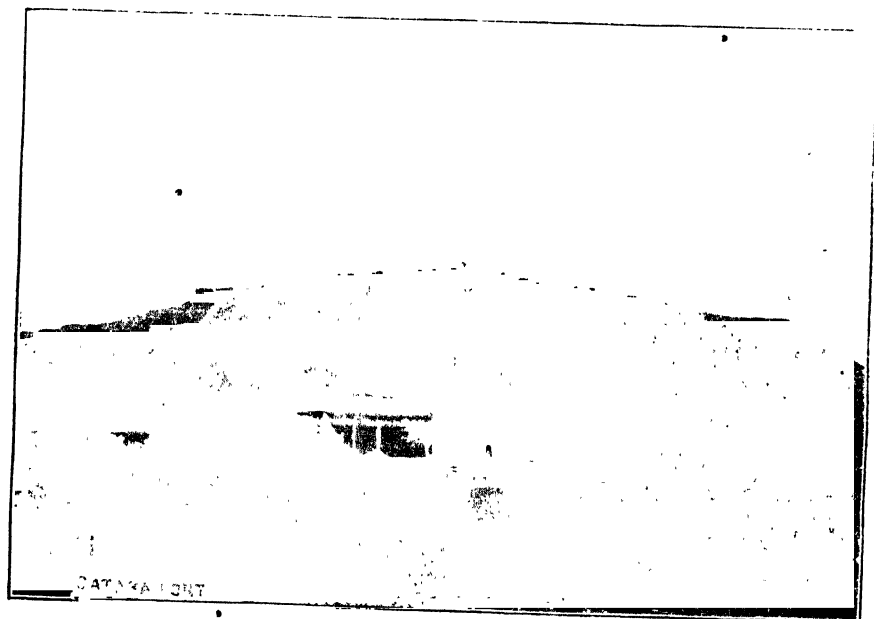
সাতারার দুর্গ

উৎসব

মহারাষ্ট্র দেশে পূজাপার্ব্বণ উৎসবাদি আমাদেরই মত, কেবল উৎসব বিশেষের মাহাত্ম্য গণনায় তারতম্য দেখা যায়। বাঙ্গলার দুর্গোৎসব এদেশে নাই। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষ্যে কোন কোন হিন্দু-গৃহে দুর্গাপূজা হয়, তথাপি বোম্বাইবাসীদের মধ্যে ইহার তেমন মাহাত্ম্য নাই। বিজয়া দশমীই (দশারা) শারদোৎসবের বিশেষ দিন। সে দিন হিন্দু-গৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমীপত্রের আদান প্রদান হয়। কথিত আছে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশকালে এই দিনে শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে শমীপূজা করেছিলেন। তা থেকে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমীপূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধু দেশেও এই প্রথা দেখেছি। মারাঠী দেশে দশারার বিশেষ মাহাত্ম্য, কেননা এই সময়ে বর্গীরা শস্ত্রার্চ্চনা করে মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রায় বেরতো। দশারায় অশ্ব সকল চিত্র বিচিত্র ফুলের মালায় সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেষ মহিষাদি বলিদানে মেতে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রকাশ্যে পশুবলি হয় না কিন্তু দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলতে পারে? তার নমুনা আমি যা কারওয়ারে পেয়েছি তা যদি সত্যি হয় তার থেকে অনুমান অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে। কারওয়ারে আমাব একটি পরিচিত ব্রাহ্মণের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়েছিল। উৎসবের পর সেই বাটীর এক ভৃত্য বালহত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ্দ হয়। বিচারস্থানে বালহত্যার কারণ এই বলা হয় যে, গৃহিণী পুত্রসন্তান কামনা করে দেবীর কাছে নরবলি মানৎ করেছিলেন, সেই মানৎ-রক্ষা-মানসে ভৃত্যকে দিয়ে এই কাণ্ড করান হয়। প্রমাণ হল যে আরতির সময় বালকটীকে দেবীর সম্মুখে ধরা হয়েছিল, পরদিন প্রভাতে গৃহপ্রাঙ্গণে বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। খুনের উদ্দেশ্য চুরি নয়, কেননা বালকটির অঙ্গের আভরণ যেমন তেমনি ছিল, তা হরণ করবার কোন চেষ্টা করা হয়নি; অপর কোন উদ্দেশ্যও প্রকাশ পায়নি—বলি অনুমান নিতান্ত অমূলক বলে বোধ হল না।

দশারার পর দেওয়ালী। ইহাই বোম্বাইবাসীদের প্রধান উৎসব। সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ দিয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহে রোসনাই দিয়ে উৎসবে মত্ত হয়। ধন-ত্রয়োদশী হতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অমাবস্যায় শেষ। বাঙ্গলা দেশে এ সময় কালীপূজা হয়, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা লক্ষ্মী। অমাবস্যার দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। সেই দিনই চারিদিকে রোস্‌নাইয়ের ঘটা। সেই দিন

বণিকদের বহিপূজনের দিন। তারা তাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটিয়ে দানধ্যান দেবার্চ্চনায় উৎসব সম্পাদন করে ও নবোৎসাহে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভক্ত-চূড়ামণি পবননন্দনের পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু মারাঠীদের মধ্যে খুবই চলিত; এমন কি, মারুতি-মন্দির মারাঠী পল্লীচিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। গণেশ ঠাকুরেরও মানমর্য্যাদা সামান্য নহে। আমাদের দেশে গণেশ ঠাকুরের জন্যে স্বতন্ত্র উৎসব নাই, ওদিকে গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পূজা ও বিসর্জ্জন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দোলযাত্রার সময় (হোলী) আবীর খেলা আমোদ প্রমোদ সর্ব্বত্রই সমান। মহ্লার রাও গাইকওয়াড় এই খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি একবার এক হাতীর উপর ক্ষুদ্র কামান বসিয়ে সেখান থেকে একদল নর্ত্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর স্রোতে এক বেচারী প্রাণসঙ্কটে পড়েছিল।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াকে বোম্বায়ে যম-দ্বিতীয়া কহে। ভাই বোনের মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ভাই ভগিনী-গৃহে ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়। ভগিনী ভায়ের কপালে তিলক দিয়ে তাকে বরণ করে, অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগিনীর স্নেহের প্রতিদান ও পরিতোষসাধন করতে হয়।

গান-বাজনা

বাঙ্গালীরা যেমন গান-বাজনাভক্ত আমি যতদূর দেখেছি মারাঠীরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় সৌখীন জাতি, মারাঠীদের প্রকৃতি অন্যতর। তারা ব্যবসায়ী practical লোক, কলাবিদ্যার প্রতি তাদের ততটা অনুরাগ নাই। আমার একজন মারাঠী বন্ধু বলেছিলেন—তিনি কলকাতায় গিয়ে দেখলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক ও সঙ্গীতপ্রিয়, যে বাড়ীতে যাও একটি হুক' ও তানপুরা। তাই বলে ও-দেশে যে গীতবাদ্যের চর্চ্চা বা আদর নেই তা নয়। তবে আমার মনে হয় যে, সঙ্গীতবিদ্যা প্রায়ই পেশাদার লোকেদের মধ্যে বদ্ধ, ভদ্রলোকের মধ্যে গীতবাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্প লোকই দেখা যায়।

সামান্যত বলা যেতে পারে এদেশের গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেয়াল ধ্রুপদ। এই সাধারণ নিয়ম, স্থানে স্থানে রূপান্তরও দৃষ্ট হয়। মারাঠীদের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি দিশী ছন্দে নূতন ধরণের গান ও তান শুনা যায়, আর 'লাউনী' নামক এক প্রকার টপ্পা আছে তাহাই খাঁটী প্রাদেশিক জিনিস। আমাদের দেশের খোল কর্ত্তাল সমেত সঙ্কীর্ত্তনের মত সমবেত ধর্ম্মসঙ্গীত ও-দেশে শুনি নাই।

ও-দেশের কথা কতকটা আমাদের কথকতার অনুরূপ। কিন্তু এ দুয়ে একটু প্রভেদও আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হতে হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস বিবৃত করে বলা বাঙ্গলা দেশের কথকতা; আর এদেশের কথা আদ্যোপান্ত একটি ভাবসূত্রে গাঁথা, সেইটি বিস্তার করে শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করা কথার উদ্দেশ্য। একটি নীতিসূত্র অবলম্বন করে গান ও উপন্যাসচ্ছলে তার ব্যাখ্যা করার নামই কথা। এই প্রসঙ্গে যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তা তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যখনি হইতে সংগৃহীত। আমি একবার এক জায়গায় কথা শুনেছিলাম, তাতে বিনয়ের মাহাত্ম্য, অবিনয়ের অনর্থ সুন্দররূপে দেখানো হয়েছিল; যে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছিল তা তুকারামের এই অভঙ্গ ঃ—

লহান পণ দে গা দেবা
মুঁগী সাখরেচা রবা।
ঐরাবতী রত্ন থোর
ত্যাশী অঙ্কুশাচা মার॥
জ্যাচে অঙ্গী মোঠেপণ
তয়া যাতনা কঠিন॥
তুকা হ্মণে জান্
হ্বাবেঁ লহানাহুনি লহান॥

দেহ দেব নম্রপনা,
মুগী * পায় মিষ্ট কণা।
ঐরাবত হস্তীরাজে
অঙ্কুশের মার বাজে।
যার দেহে অহঙ্কার
কঠিন যাতনা তার।
তুকা কহে জান সবে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হবে॥

এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে উপন্যাস ও গান থাকে, ধুয়ায় শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেয়। অতঃপর কথকঠাকুরের বন্দনাদির পর সভাভঙ্গ হয় মারাঠী দেশে কথা ও কীর্ত্তন ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গীণ অস্ত্র। কীর্ত্তন-সভায় আমোদ এবং

* পিঁপড়া।

শিক্ষা দুইই একত্রে সংসাধিত হয়। সাধু তুকারাম স্বয়ং কীর্ত্তনকলায় পরিপক্ক ছিলেন। তাঁর মাধুরীময় সঙ্কীর্ত্তন শুনতে লোকেরা দেশ দেশান্তর হতে আসত। শিবাজী রাজাও অবসরক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হতেন। মহীপতিকৃত ভক্তলীলামৃত গ্রন্থে আছে যে, তুকারামের উপদেশ ও সংসর্গগুণে মহারাজের বৈরাগ্যোদয় হয়েছিল; এমন কি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকতেন। তুকারাম আবার সদুপদেশ দিয়ে তাঁকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

এক্ষণকার কালে রুচির পরিবর্ত্তন যেমন বাঙ্গলা দেশে দেখা যায়, ওদিকেও তেমনি। এখন সর্ব্বত্র নাটকের পালা পড়েছে, যাত্রা কথা কীর্ত্তন এ সব কারো ভাল লাগে না। মারাঠীদের মধ্যেও ভাল ভাল নাটকমণ্ডলী আছে, তারা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটী, নারায়ণ রাও পেশওয়া বধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে। ও-দেশে সে সব নাট্যকারদের পশার ভারী। এই সকল নাট্যে গণপতি সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্যগীত হবার পর রীতিমত কথারম্ভ হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে ময়ূরবাহনা বীণাপাণি নৃত্য করতে করতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। ও-দেশে সরস্বতীর বাহন—ময়ূর।

ইংরাজেরা মারাঠা দেশে অল্পে অল্পে কিরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল সে এক কৌতূহলপূর্ণ অপূর্ব্ব কাহিনী; তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে মারাঠী রাজ্যের গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। অন্য সকল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে; কিন্তু হাজার সংক্ষেপ করিলেও তাহা দুই তিন অধ্যায়ের কমে সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। পাঠকদের যদি ভাল না লাগে, তবে এ ভাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন।

মহারাষ্ট্র রাজ্যস্থাপন—শিবাজী রাজা

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চশিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনও মোগল-যুপ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ-ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আল্লা-উদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। তাহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল-পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর, আহমদনগর, গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান-রাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মসলিম একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময়

করসনদাস মূলজী (১৭৫ পৃষ্ঠা)

গোবিন্দ কড়কড়ে (১৮৮ পৃষ্ঠা)

ভোলানাথ সারাভাই (১৬৮ পৃষ্ঠা)

শিবাজী মহারাজ (১৯৯ পৃষ্ঠা)

হইতেই তাহাদের বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাঁহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল-রাজ্যভুক্ত হয়।

বোম্বায়ে যখন ইংরাজ-অধিকার স্থাপন হয়, বিজাপুর ও গলকণ্ডা তখনও স্বাধীন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাদের বশীকরণ মন্ত্রণা করিয়া অনেক চেষ্টায় সেই রাজ্যদ্বয়কে দিল্লীসাৎ করেন। ১৫ই অক্টোবর ১৬১৫ সালে বিজাপুর, এবং বর্ষেক পরে গলকণ্ডা মোগল-রাজ্যভুক্ত হয়, এইরূপ রাজ্যবিস্তারই মোগলরাজের অধঃপতনের কারণ হইল। মুসলমানদেব যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্ট্রীরা মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধান পাইল। যদি দক্ষিণে মুসলমান-বাজ্য সকল অক্ষুণ্ণ থাকিত তাহা হইলে হিন্দুরাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ—ভারতের ইতিহাস হয়ত আর এক ধরণে সংগঠিত হইত। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-সাম্রাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মোগল-সূর্য্য অস্তোন্মুখ, ওদিকে কোথা হইতে কালমেঘ উঠিয়া অল্পকাল মধ্যে দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শিবাজী ভোঁসলে

ঐ কালমেঘ শিবাজী ভোঁসলে। শিবাজী একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত উপন্যাসের মত মনোহারী। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁহাকে দেখিতে মধ্যমাকৃতি কিন্তু সুগঠন ও গৌরবর্ণ—লক্ষ্যভেদী জ্বল জ্বল চক্ষু, কলম ধরিতে জানেন না কিন্তু সকল প্রকার শস্ত্রচালনায় বিলক্ষণ মজবুত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়পূর্ণ, উপায়ের খনি, ধূর্ত্তচূড়ামণি। তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল, জননীর চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া তিনি কোন মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুব সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। পুণায় তাঁহার জায়গীর, তথায় দাদাজী কোণ্ডু নামক আচার্য্যের হস্তে শিবাজীর শিক্ষার ভার সন্ন্যস্ত হইল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বালকের উপর দ্রোণাচার্য্যের শাসন কতদিন খাটে? মাওলী বংশীয় চাষার দল তাঁহার সঙ্গী—লুটপাট ডাকাতি শিকার এই সকল কাজেই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ। খর্ব্বকায় অথচ দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মাওলীদের হস্তে অস্ত্র দিয়া শিবাজী তাহাদের মধ্য হইতে রামের বানরসৈন্যবৎ সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। পাহাড়ে দেশে তাঁহার জন্ম—পশ্চিমঘাট অঞ্চলে যে সকল প্রকৃতিগঠিত দুর্গ আছে তাহা একে একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। পাহাড় দুর্গে তাঁহার বাস, লুটের মাল হইতে তাঁহার ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। যখন যেমন সুবিধা—কখন বিজাপুরের পক্ষ হইয়া মোগলের

বিরুদ্ধে, কখন মোগল-সম্রাটের অধীনে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজকার্য্য সাধিয়া ল'তেন। অবশেষে যখন নিজের বল বুঝিলেন—যখন দেখিলেন "পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে" (ডোঙ্গরাস্ লাবিলে দিবা) সকলি প্রস্তুত—তখন মুখোষ ফেলিয়া দিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

আফজুল খাঁ

ক্রমে শিবাজীর দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল, বিজাপুর-সুলতান আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। শিবাজীকে দমন না করিলে সে সর্ব্বদমন হইয়া উঠিবে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আফজুল খাঁ কোমর বাঁধিয়া শিবাজীকে ধরিয়া আনিতে বাহির হইলেন।

সে সময়ে শিবাজী মহাবলেশ্বর হইতে অনতিদূরে প্রতাপগড়ের পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া প্রকৃতির বলের উপর কৃত্রিম বল যোজিত হইয়াছে। শিবাজী এই দুর্গে ব্যাঘ্রের ন্যায় বসিয়া শিকার নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে তুলজাপুরের মন্দির আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। ম্লেচ্ছদের উপর হিন্দুদিগের জাতিবৈর দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শিবাজী চরমুখে সকল সংবাদ পাইতেছেন। আফজুল খাঁ অনেক সৈন্যসামন্তে পরিবৃত, তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, ছলে ও কৌশলে তাঁহাকে মারিতে হইবে। শিবাজী নবাব সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন এবং ভয়ের ভান করিয়া এইরূপ দেখাইতে লাগিলেন যে, তিনি নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতে এখনি প্রস্তুত, কেবল প্রাণভয়ে ধরা দিতে নারাজ। খাঁ সাহেব যদি প্রতাপগড়ে অধীনের সাক্ষাৎকারে সম্মত হন তাহা হইলে মুখে সকল কথা হইবে। অবশেষে তাহাই সাব্যস্ত হইল। নবাব কোন দুরভিসন্ধি মনে না আনিয়া শিবাজীর সহিত সহজভাবে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন—একজন মাত্র সঙ্গী, পরিচ্ছদের মধ্যে এক পাতলা মসলিনের কাপড়, আর একটি সোজা তলবার—সে শুধু অলঙ্কারের জন্য,—ব্যবহারের মানসে নয়। বেহারাগণ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে পাল্‌কী নামাইল কিন্তু শিবাজী সেখানে নাই। দূর হইতে দুজন মানুষ দেখা যাইতেছে—ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে তাহাদের পদক্ষেপ। বাহিরে দেখিতে শিবাজী নিরস্ত্র কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি 'ভবানী' তলবার ও 'বাঘনখ' গুপ্তাস্ত্রে সুসজ্জিত। বাহিরে সামান্য শুভ্রবেশ কিন্তু ভিতরে তিনি লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত। শিবাজী ক্রমে অগ্রসর হইলেন—খাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্গে দস্তুর মত কোলাকুলি করিতে গেলেন। কিন্তু শিবাজীর সে ভল্লুকের আলিঙ্গন—তাঁহার হস্তে

মহাবলেশ্বর ও শিবাজীর দুর্গ প্রতাপগড়

(২০০ পৃষ্ঠা)

প্রচ্ছন্ন 'বাঘনখ' ছিল, তাহার আঘাতে নবাবের উদর বিদীর্ণ হইল। বাঘনখে যাহা হইবার বাকী ছিল ভবানী খড়্গো তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন। *

এদিকে পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। কামানের শব্দে পাঁচবার দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত হইল। নীচে মুসলমান সেনা অপ্রস্তত ভাবে ছিল, শিবাজীর মাওলীরা চারিদিক হইতে তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। প্রত্যূষে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা সদর্পে কুচ করিয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই দুর্দ্দশার কাহিনী বলিবার জন্য যে ফিরিয়া যাইবে এমন অল্প লোকই অবশিষ্ট রহিল।

এই জয়লাভে শিবাজী সৌভাগ্য-সোপানে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। শিবাজী এই জয়লাভের পর নিদ্রিত রহিলেন না। গিরিদুর্গ সকল হস্তগত করা তাঁহার যে সাধ তাহা অবাধে মিটাইতে পারিলেন।

আফজুল খাঁর পতনের পর পন্হালার দক্ষিণ কৃষ্ণানদী তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ শিবাজী রাজ্যসাৎ করিয়া লন। বিজাপুর হইতে দ্বিতীয়বার যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল তাহাও পরাস্ত হইল। তৃতীয় যুদ্ধে শিবাজী বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া পন্হালা দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিজাপুরের প্রবল সৈন্য সেই দুর্গ আক্রমণ করিল—পলায়ন ভিন্ন রক্ষা নাই। শিবাজী কৌশলক্রমে শত্রুহস্ত এড়াইয়া রঙ্গাণায় সরিয়া পড়িলেন। বিজাপুব সৈন্য তাঁহাকে ধরিতে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। সেই সঙ্কটে সেনানী বাজি প্রভু এক সহস্র মাওলী লইয়া আগম নিগমের পার্ব্বত্য সুঁড়ী পথ আগলাইয়া রহিলেন। নয় ঘণ্টা কাল তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার তৃতীয়াংশ সেনা মারা পড়িল তবুও তিনি অটল। অবশেষে তোপধ্বনিতে রঙ্গাণায় শিবাজীর নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবার সংবাদ পাইয়া নিরস্ত হইলেন। কিছু পরে তিনি নিজেও আহত হইয়া সহাস্য বদনে প্রাণত্যাগ করেন। বাজি প্রভুর এই বীরত্বকাহিনী প্রাচীন গ্রীসের Thermopylæ রক্ষণের সহিত তুলনা করা যাইতে পাবে। রঙ্গাণা পথের এই দুর্গম স্থান মারাঠা সমরের (Thermopylæ) থর্ম্মাপিলি।

* সুবিখ্যাত মারাঠী ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফের এইরূপ বর্ণনা। অন্য লেখকেরা বলেন যে উভয় পক্ষেরই মনে মনে দুরভিসন্ধি ছিল—কে কাহাকে ধরিতে পারে উভয়েরই এই মনোভাব। কেহ কেহ বলেন শিবাজীর উপর নবাবেরই প্রথম আক্রমণ—শিবাজীর আত্মরক্ষার্থে নবাবকে মারিতে হইল। কিন্তু গুপ্তাস্ত্রের ব্যবহার ও পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে সৈন্যের আক্রমণ—এই সকল দেখিয়া প্রচলিত প্রবাদই সমূলক বলিয়া অনুমান হয়।

ইহার পরেও কতবার বিজাপুর রাজা শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়, পরিশেষে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে পরিত্রাণ পাইলেন। ফলে কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় কোঙ্কণ প্রদেশ এবং ভীমা হইতে বারণা নদী পর্য্যন্ত ঘাটশ্রেণীর প্রদেশসমূহ, দক্ষিণে ১৬০ মাইল এবং পূর্ব্বে ১০০ মাইল ব্যাপিয়া শিবাজীর অধিকারভুক্ত হইল।

এখনো কিন্তু সকল সঙ্কট দূর হয় নাই—বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার মোগলের কোপচক্রে পতিত হইলেন। এক ফাঁড়া গিয়া আর এক ঘোরতর ফাঁড়া উপস্থিত। এই বিষম সঙ্কট হইতে শিবাজী কি কৌশলে উদ্ধার পাইলেন তাহা বর্ণনাযোগ্য।

১৬৬২ সালে মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হয়। অতঃপর দক্ষিণের মোগল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে শাসন করিতে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন। শিবাজীর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নবাব পুণায় আসিয়া আড্ডা করিলে শিবাজী তাঁহার সিংহগড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নবাব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান—"তুমি মর্কট বানরের মত পাহাড়ের উপর বসে থাক—যুদ্ধের বেলায় কেল্লায় বন্ধ থেকে এগোতে সাহস কর না, এবার আমি তোমাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।" শিবাজী উত্তর করিলেন—"আমি বানর সত্য কিন্তু সেই রামসৈন্য বানরের জাত যারা রাবণ বধ করে লঙ্কা জয় করেছিল। আমি তোমাকে এমন জব্দ করব যে পালাবার পথ পাবে না।" বাস্তবিক তাঁহার কথাই ঠিক হইল। নবাব যে বাড়ীতে ছিলেন তাহা এক সময়ে শিবাজীর বাসগৃহ ছিল, নাম লাল মহল, তিনি তাহার অন্তর বাহির অন্ধি সন্ধি সকলি ভাল করিয়া জানিতেন। সায়েস্তা খাঁ সেনা-পরিবৃত—বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য যাহা কিছু করা যাইতে পারে কিছুই ত্রুটি করেন নাই। শিবাজী একরাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ তাঁহার দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্যদল স্থাপন করিয়া ২৫ জন মাওলীর সঙ্গে এক বিবাহের বরযাত্রী দলে মিশিয়া নগরে প্রবেশলাভ করেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে পিছনের এক দ্বার দিয়া নবাবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ এইরূপ আকস্মিক বিপদ দেখিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। শেষে আপনার শয়ন-গৃহের গবাক্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়া খড়্গাঘাতে দুইটি মাত্র অঙ্গুলি হারাইয়া কোনমতে পার পাইলেন। এই উপপ্লবে নবাবের পুত্র ও অনুচরবর্গ মারা পড়ে। শিবাজীর চকিতের ন্যায় উদয়—চকিতের ন্যায় অন্তর্ধান। তাঁহার অনুচরগণের জয়ধ্বনি ও মসালের আলোকের মধ্যে তিনি মহাসমারোহে স্বীয় দুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত

সাহসিক কার্য্যের আশাতীত ফল লাভ হইল। মোগল সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া ছড়িভঙ্গী হইয়া পড়িল। ইহার পর সায়েস্তা খাঁ আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।

শিবাজীর সাহস এমনি বাড়িয়া উঠিল যে কিছুকাল পরেই তিনি চতুঃসহস্র অশ্বারোহীসহ হঠাৎ সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট তখন বিদেশীয়দের বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল। ছয় দিন ধরিয়া ইচ্ছামত নগর লুণ্ঠন করিয়া অগাধ ধনরত্নে তিনি তাঁহার রায়গড় কেল্লার ধনাগার পূর্ণ কবিলেন। এই আক্রমণকালে ইংরাজেরা অতুল বিক্রম ও সাহসের সহিত আপনাদের কুঠী রক্ষা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ব্রিটিষ-সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে!

আশ্চর্য্য পলায়ন

এই সকল ঘটনার কিছু পরেই দেখিতে পাই যে শিবাজী মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কুহকে পড়িয়া দিল্লীতে বন্দীকৃত হইয়াছেন। মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সহিত মিলিয়া তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন। এই ব্যাপারে মারাঠীরা এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে, দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে স্বহস্তে অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শিবাজী স্বীয় পুত্র শম্ভোজীকে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। গিয়া দেখেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কিছুই নয়, যেরূপ মানমর্য্যাদা পাইবার আশা ছিল তাহা পাইলেন না। রাজদরবারে তৃতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারদের সহিত একাসনে বসিতে হইল, বাদসা তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, এইরূপ ব্যবহারে শিবাজীর মনে এমনি মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল যে, তিনি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাসায় গিয়া দেখেন তাঁহার গৃহের চারিদিকে সিপাই সান্ত্রীর পাহারা, পলাইবার পথ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন দিল্লী আসিয়া ভাল কাজ করেন নাই, পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। তিনি পীড়ার ছল করিয়া শয্যাগত রহিলেন। কয়েকজন বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসিত, তাহাদের দিয়া বাহিরের মিত্রবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ হইল। তিনি আর একটা ফন্দী করিলেন। ফকীর কাঙ্গালীদের মিষ্টান্ন ও আর আর দ্রব্য বিতরণ করা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার এক কাজ হইল, ঐ সকল সামগ্রী বড় বড় চুবড়ী করিয়া পাঠান হইত। এইরূপে কিছুদিন যায়, একরাত্রে তিনি নিজে একটা চুবড়ীর মধ্যে লুকাইয়া পুত্রটিকে আর একটায় পুরিয়া দুই বাহকের স্কন্ধে বাহির হইলেন, দ্বারপালেরা অভ্যাসবশতঃ ওদিকে বড় লক্ষ্য করিল না। তাঁহার শয্যায় একজন ভৃত্যকে রাখিয়া দিলেন, অনেকক্ষণ

পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়ন কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। তাঁহার জন্য একস্থানে অশ্ব প্রস্তুত ছিল তাহাতে চড়িয়া পুত্রকে সঙ্গে বসাইয়া লইয়া সেই যে একটানা চলিলেন আর কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। মথুরায় আসিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ভস্মলেপন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। পুত্রকে সেখানেই রাখিয়া গেলেন, বেচারা এমন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তার আর নড়িবার শক্তি ছিল না। তথা হইতে আলাহাবাদ, আলাহাবাদ হইতে কাশী, কাশী হইতে গয়াতীর্থ, গয়া হইতে কটক, কটক হইতে হাইদ্রাবাদ, এইরূপে ৮ মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রাজগড়ের কেল্লায় তাঁহার মাতা জীজাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। একদিন হঠাৎ দুইজন বৈরাগী জীজাবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। জীজাবা তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলে একজন দস্তুর মত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অন্যজন পাগড়ী খুলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। মাথায় চিহ্ন দর্শনে আপনার পুত্রকে চিনিতে পারিয়া জীজাবা তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া জীজাবার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেদিন কাঙ্গালীদিগকে অন্নদান, তোপধ্বনি এবং বাদ্যোদ্যমের ধুম পড়িয়া গেল, নরনারী ছোট বড় সকলেই আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল।

এই প্রকারে অশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শিবাজী অল্পে অল্পে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইল। 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' এই দ্বিবিধ কর আদায় করিবার পরওয়ানা প্রথম দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, পরে রীতিমত বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করিলেন। ৬ই জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা পদবী গ্রহণ করিয়া রাজগড়ে মহা ধুমধাম করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে আপনাকে স্বর্ণস্তূপে ওজন করিয়া স্বীয় দেহভার পরিমাণ স্বর্ণরাশি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণকরতঃ অতুল খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ৫ই এপ্রেল ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যাধিকার সামান্য ছিল না। গুণ্ডাবী হইতে পাণ্ডা পর্য্যন্ত (ইংরাজ ও পোর্ত্তুগীস্‌দের কোন কোন স্থান বাদে) কোঙ্কণের সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ; ওদিকে আবার পুণা হইতে জুনের পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত মারাঠা প্রদেশ—কত গিরি দুর্গ সমেত তাঁহার অধিকারভুক্ত; কারওয়ার অঙ্কোলা প্রভৃতি কতকগুলি সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে তাঁহার থানা; তাহা ছাড়া দ্রাবিড়, তাঞ্জোর, কর্ণাটক, খানদেশ ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার বিজিত ভূখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত। দস্যুবৃত্তি হইতে শিবাজীর জীবনের আরম্ভ—অসীম রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তিনি জীবনযাত্রা শেষ করেন।

শিবাজীর শাসনপ্রণালী

শিবাজী রাজার অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের আয়তন কতটুকু ছিল অল্পকালের মধ্যে সেই রাজ্য যে কি বিপুল বিস্তার লাভ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শিবাজীর শেষাবস্থায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার প্রতাপ অতুলন, তাপ্তী নদী হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল রাজার রাজেশ্বররূপে তিনি একবাক্যে গৃহীত হইলেন।

শিবাজী রাজার রাজ্যলাভে যেমন চাতুর্য্য, রাজ্যসংগঠন এবং শাসনকার্য্যেও তেমনি তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অর্জ্জন ও রক্ষণ ক্ষমতা যাঁর একাধারে এইরূপ যোগক্ষেমসম্পন্ন মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শিবাজীকে সেই মহাপুরুষদের আসনে স্থান দিতে হয়। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী বিচারযোগ্য, অধুনাতন সভ্যজগতের মাপদণ্ড দিয়া মাপিয়া দেখিলেও তাহাকে হেয় জ্ঞান করা যায় না। সংক্ষেপে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :---

প্রথম। এক একটি গিরিদুর্গ এক এক প্রদেশের কেন্দ্রস্থল

মারাঠী ইতিহাস (বখর) লেখকেরা বলেন, শিবাজী রাজা ক্রমশঃ ২৮০ সংখ্যক গিরিদুর্গ হস্তগত করেন। এই সকল দুর্গ নির্ম্মাণ এবং সংস্কার কার্য্যে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তাহাতে যত পরিশ্রম যতই অর্থব্যয় হউক না কেন কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতেন না। শত্রু আক্রমণ বল, আত্মরক্ষাই বল, মারাঠী রাজ্য স্থাপনের সময় প্রথম প্রথম দুয়েতেই এই সকল দুর্গের বিশেষ উপযোগিতা ছিল। এই সকল বন্ধনী মারাঠী সাম্রাজ্যের বন্ধন, বিপদের সময় ইহারাই রক্ষা-কবচরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সকল দুর্গ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে শিবাজী তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দুর্গরক্ষণে একজন মারাঠা হাওয়ালদার এবং তাহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত ছিল। তাহার দেওয়ানী ও রেবেন্যু কার্য্যভার একজন ব্রাহ্মণ সুবেদারের হাতে— দুর্গের অধীনস্থ গ্রামসমূহের কার্য্য তাহার অন্তর্গত। আর একজন প্রভুজাতীয় কর্ম্মচারী ধান্য ও রসদ যোগাইবার এবং জীর্ণসংস্কারের কাজে নিযুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন তিনবর্ণের লোক এক কর্ম্মসূত্রে বাঁধা, পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য চলিত। নীচে রামোসী প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতীয় লোকেরা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। দুর্গের আয়তন ও উপকারিতা অনুসারে দুর্গপালের সংখ্যা। এক একজন নায়কের অধীনে নয় জন সিপাই ; বন্দুক, তলবার, বর্ষা পট্টা—এই সকল অস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত। ইহারা

সকলে আপন আপন পদ ও কর্ম্মানুসারে বেতনভোগ করিত। গিরিদুর্গ হইতে নীচে সমান জমিতে আসিলে তার অন্য প্রকার ব্যবস্থা।

শিবাজীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকদের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল উল্লিখিত নিয়মাবলী তাহার নকল মাত্র। পদাতিক সৈন্যদলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই :—

একজন নায়কের অধীনে দশ জন সিপাই—নায়কের উপর হাওয়ালদার তার উপর জুমালেদার—এক সহস্র সিপাইয়ের অধিনায়ক একজন 'হাজারী'—৭০০০ সেনানায়ক যিনি তাঁহার নাম সর্ণোবৎ। এই গেল মাওলী পদাতিক। ঘোড়সোওয়ার দলের নিম্নশ্রেণীর নায়ক সিলেদার, পঁচিশ সিলেদারের উপর একজন হাওয়ালদার, হাওয়ালদারের উপর জুমালেদার, দশ জুমালায় এক হাজারী, পাঁচ হাজারীর অধিনায়ক একজন সর্ণোবৎ। উচ্চশ্রেণীর মারাঠা সৈনিকের অধীনে এক একজন ব্রাহ্মণ সুবেদার এবং অন্য জাতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। সৈনিকের উচ্চ নীচ সকলেরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন জায়গীর বা জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি পুরস্কারস্বরূপ তাহাদের ভোগে আসিত না—ধান্য অথবা নগদ টাকাই তাহাদের বেতন। এই সকল কড়াক্কড় নিয়ম সত্ত্বেও শিবাজীর সৈন্যসংগ্রহে কোন বাধা ছিল না। আর আর সকল কাজের মধ্যে সৈনিকের কাজে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। দশারার দিনে মাওলী, হেতকরী, সিলেদার প্রভৃতি লোকেরা দলে দলে জাতীয় পতাকাতলে মিলিত হইয়া শিবাজীর সৈন্যদলভুক্ত হইত। দশারার উৎসব সৈন্যসংগ্রহের কাল,—শিবাজী রাজা ঐ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন।

দ্বিতীয়। অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা

সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা সংগঠন করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আটজন কর্ম্মচারী সেই সভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

১। পেশওয়া প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) রাজ্যের মুলকী, দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যভার তাঁহার হাতে, রাজার নীচেই তাঁর আসন।

২। সেনাপতি (সর্ণোবৎ) (Commander-in-Chief) সেনা বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন স্বতন্ত্র ছিল।

৩। অমাত্য (মজুমদার) (Finance Minister)। ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা। ইঁহাকে রাজ্যের সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইঁহার কার্য্যভার গুরুতর।

৪। সুর্ণীস (Minister of Public Records and Correspondence) ইনি রাজ্যের পত্রব্যবহার বিভাগের কর্ত্তা। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইঁহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত।

৫। ব্যক্কানিস (Private Secretary) ইঁহাকে শিবাজীর নিজস্ব দৈনন্দিন হিসাব ও কাগজপত্র রাখিতে হইত। রাজার গৃহরক্ষক সৈন্যদলের, তথা গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ভার ইঁহার উপর।

৬। সুমন্ত (ডবীর) (Foreign Minister) বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও অপরাপর বিদেশীয় রাজকার্য্য ইনি নির্ব্বাহ করিতেন।

৭। পণ্ডিতরাও (Minister of Education) স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ধর্ম্ম দণ্ড বিজ্ঞানবিভাগ ও রাজ্যসম্বন্ধীয় ফলাফল গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল।

৮। ন্যায়াধীশ (Chief Justice) অন্য হিসাবে (Law Member) পণ্ডিতরাও এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক সভাসদকেই সেনানায়কতা করিতে হইত। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে যথোচিত সময় দিতে পারিতেন না। এই হেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। আবার প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত; যথা—

১। দেওয়ান অথবা কারবারী

২। মজুমদার হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষক

৩। ফর্ণবীস সহকারী হিসাব পরীক্ষক

৪। সরনিস্ (দফতরদার)

৫। কর্কনিস (Commissary)

৬। চিটনিস্ (Secretary)

৭। জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ইঁহার হাতে থাকিত।

৮। পোটনিস্ (খাতাঞ্চি)

এই অষ্টপ্রধান সভা শিবাজীর উদ্ভাবনীশক্তির ফল, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। এই শাসনপ্রণালী পেশওয়ার আমলে রক্ষিত হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যভার পেশওয়ার হস্তেই গিয়া পড়িল। পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার পদ বংশানুগামী হইল। সেনাপতি সচিব সুমন্ত, পেশওয়া নিজেই সকলি একাধারে, সে সকল পদ নামমাত্র। পদগুলি বংশগত হইল সত্য, তার আনুসঙ্গিক মানমর্য্যাদা রহিল কিন্তু কাজের বেলায় শূন্য। অন্যান্য বীরেরাও পেশওয়ার দৃষ্টান্ত

অনুসরণ করিলেন। সিন্দে, হোলকার, গাইকওয়াড়, ভোঁসলে ইঁহারা সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদির রাজ্যভোগের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রণালীবদ্ধ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। ভাল মন্দ রাজার উপর প্রজার সুখ দুঃখ, রাজ্যের শ্রীসম্পদ সকলি নির্ভর। পেশওয়ার বংশধর রাজগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী যোগ্যপুরুষ তাঁহাদের হস্তে যতদিন রাজ্যভার ছিল ততদিন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌভাগ্য, পরে পেশওয়া বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেরও দুর্গতি হইল। কালক্রমে মারাঠী সাম্রাজ্যের একতা নষ্ট হইল, রাজ্যের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয়। যাহাতে বড় বড় পদ বংশানুগামী হইয়া বিকার প্রাপ্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য। বড় বড় পদ বংশগত করা শিবাজীর মনঃপূত ছিল না—স্বাভাবিক গুণ এবং কর্ম্মযোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা এই তাঁর রাজনীতি। উচ্চপদ বংশগামী হইবার দরুণ রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটিল, শিবাজীর পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যোগ্যতা অনুসারে কার্য্যভার অর্পণ ইহাই যথার্থ রাজধর্ম্ম।

চতুর্থ। বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা

রাজকীয় কর্ম্মচারীদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের হাতে জায়গীর জমিদারী সঁপিয়া দেওয়া, ইহা শিবাজীর মতবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষের পারিতোষিকস্বরূপ জায়গীর ইনাম দিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শিবাজীর বিধানে পেশওয়া সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাই কারকুন পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাজকোষ কিংবা ধান্যভাণ্ডার হইতে বেতন পাইত। নির্দ্দিষ্ট বেতন নিয়মিত সময়ে দেওয়া হইত। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী জায়গীরদার জমিদার সৃষ্টি করা রাজ্যের হিতকর নহে, শিবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আমাদের দেশে কেন্দ্রবর্জ্জনী শক্তি কেন্দ্রমুখী শক্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া উঠে—শিবাজী এই গতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কার্য্য করিতেন। এই কারণে জায়গীরদারী-প্রথার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি, জমিদারদের দুর্গ নির্ম্মাণেরও নিষেধ ছিল। অন্যান্য রায়তের ন্যায় অরক্ষিত গৃহে বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। শিবাজী যে জমিদারী-প্রথার বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার সময় যে সকল বড় বড় লোক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই উত্তরাধিকারীদের জন্য বৃহদায়তন ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভূসম্পত্তিশালী বৃহৎ পরিবার পত্তন শিবাজীর পরবর্ত্তীকালের প্রথা। শিবাজী যাহা

কিছু ভূমিদানের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মক্ষেত্রে—মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দান ধর্ম্মের কার্য্যে নিয়োজিত হইত।

বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজনার জন্য দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। শিবাজীর রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চা বড় একটা ছিল না কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত দক্ষিণাদি দানব্যবস্থার দরুণ ছাত্রগণ কাশী হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া আসিত, এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার হইল। পেশওয়ারাও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

পঞ্চম। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা

রাজা প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জমিদারের মধ্যবর্ত্তিতা নাই, শিবাজীর এই নিয়ম ছিল। তাঁহার বিশ্বাস এই যে খাজনা আদায়ের কাজে মধ্যবর্ত্তী জমিদার নিয়োগ করা যত অনর্থের মূল। তাহার ফল এই হয় যে, জমিদার বেশীর ভাগ খাজনা আত্মসাৎ করে, সরকারী তহবিলে অল্পই আসে, এই হেতু তিনি জমিদারী প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তিনি যোগ্য বেতন দিয়া কমাবিসদার মহলকারী সুবেদার প্রভৃতি রেবেন্যু কর্ম্মচারী রাখিতেন—রায়তদের যাহার যাহা দেয় তাহার জন্য কবুলায়ৎ লওয়া হইত। ফসলের দ্বিতীয় পঞ্চম অংশ সরকারী খাজনার হার, অবশিষ্ট রায়তের নিজস্ব থাকিত। তখন আদালতের কাজ বেশী ছিল না—সুবেদার দেওয়ানী ফৌজদারী দুই কাজই করিতেন। তেমন কিছু বড় মকদ্দমা উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তের হাতে সমর্পিত হইত।

ষষ্ঠ। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট বা ইজারা দেওয়া রহিত করা। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট দিয়া জমিদার বা ইজারাদার নিয়োগ শিবাজীর নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। পেশওয়াই আমলেও এই নিয়ম অনেককাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বাজিরাওয়ের রাজ্যে যখন অরাজকতার একশেষ তখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। ইজারদারী নিয়মে রায়তের উপর অত্যাচারের সীমা রহিল না। ইজারদারেরা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ন্যায্য দেনার উপর যতটা আদায় করিতে পারে সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিত না।

সপ্তম। সিবিল বিভাগের অধীনে সেনা বিভাগ রক্ষা করা। এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, নহিলে সৈন্যপ্রতাপ রাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়ে।

অষ্টম। জাতিনির্ব্বিশেষে কর্ম্মবিভাগ। ব্রাহ্মণ প্রভু মারাঠা উচ্চনীচ বর্ণের সম্মিশ্রণে রাজকার্য্য পরিচালন করা শিবাজীর নিয়ম ছিল; যাহাতে কোন এক বিশেষ জাতির প্রাধান্য নিবারিত হয়, স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধ হয়, পরস্পরের একটা শাসন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাই উদ্দেশ্য। শিবাজীর পরে এই নিয়মটী রক্ষিত হয় নাই। পেশওয়াই আমলে ব্রাহ্মণেরই আধিপত্য দেখা যায়।

শিবাজীর যে শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইল ব্রিটিষ রাজ্যশাসনপ্রণালী তাহার প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে। দেওয়ানী এবং সৈনিক ভাগের পার্থক্য সাধন, সৈনিকের উপর দেওয়ানীর প্রভুত্ব স্থাপন, নির্দ্দিষ্ট বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ, বড় বড় পদ বংশগত না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্য নিয়োগ, রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, মন্ত্রীসভার মন্ত্রণায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা, এই সমস্ত সুশাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে একছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিবাজীনির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালীর অন্যথাচরণ করিয়াই পেশওয়া রাজ্য স্বীয় অধঃপতনের সোপান প্রস্তুত করিল। *

তুকারাম ও রামদাস

তুকারাম ও রামদাস শিবাজী রাজার সমকালবর্ত্তী দুই মহাপুরুষ। তাঁহারা মহারাষ্ট্রের সাধু ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত। তাঁহারা সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মারাঠা জনপদ অনেককাল মুসলমান আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। যে দুই শত বৎসর মারাঠীগণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভকালের জাতীয় ধর্ম্মভাব এই দুই সাধুর জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়। রামদাস শিবাজীর গুরু ছিলেন, তাঁহার উপদেশ না লইয়া মহারাজ কোন মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তুকারামের সাধু জীবনীও শিবাজীর জীবনে সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

তুকারামের পবিত্র চরিত্র ও অলোকসামান্য গুণরাশি শিবাজীর শ্রুতিগোচর হওয়াতে মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তুকারামকে রাজবাটীতে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোকজন অশ্ব রথ রাজছত্র প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম প্রেরিত হইল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না। তিনি সেই সকল উপকরণ সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে যে উপদেশপূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম এই :--

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল,
ইথে কেন জড়াইছ আমাকে ভূপাল।
ধনমান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি,
এ বিপদ হ'তে মোরে রক্ষা কর হরি।

---

* Rise of the Maharatta Power by M. G. Ranade
Grant Duff's History of the Maharattas,

ভাল যা না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন বল ফেলিছ আমারে।
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর রহিব একাকী।
মান দম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এ সব তোমারই থাক্, হে পাণ্ডরিপতি।

* * *

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্য করিয়া প্রকাশ,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র প'ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়—
সুচতুর, বুদ্ধিমান, গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে,
"শিব" এই পুণ্যনাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান আরাধন, যাগ যজ্ঞ আর,
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন্,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তি-বিহীন,
বস্ত্রাভাবে ম্লানকায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ।
জীর্ণ হস্তপদ অতি, দেখিতে কুৎসিত,
আমাকে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।

* * *

আমি হে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিহ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র নহে দীন হীন।
পাণ্ডুরঙ্গ রক্ষাকর্ত্তা, সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর।
তোমার দর্শনে তবে কি হইবে ফল,
সংসার বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জ্জন করি দিয়া সব বাসনায়
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজনায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।

বিঠ ঠলই সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যে ত তাঁরে দেখিবারে পাই।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মনস্থির একমাত্র কর তাঁর প্রতি।
তুকা কহে "শুন ওগো বুদ্ধির আগার,
ভক্তি একমাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার!"

* * *

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।
খাবায অভাব হয় খাব ভিক্ষা করে,
বস্ত্র চাই, ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে প'ড়ে।
শয্যা মোর প'ড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস।
রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায়?
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা মান্য নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আড়ম্বর যত
দেখ সে আমার পক্ষে মরণের মত।
এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে রবেন সদয়।
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস
যত দিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে লোক মাঝে তোমাদের মান—
আমরা যে হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান।

* * *

এই একমাত্র যোগ করিও সাধন,
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা করো না কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন
এমন কাজেতে মন দিও না রাজন্।
দুর্জ্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তিদান,
তাহার কথায় কভু দিও নাক কান।

রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার।
পরীক্ষায় দোষ গুণ করিয়া বিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
দুই এক কাজ মাত্র মোর বলে জানি,
আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি।
এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্যগুরু রামদাসে দেখহ আপন!
তুকা বলে "ধন্য ধন্য তুমি হে ভূপতি,
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি ভাতি।"

*　　*

চতুর মান রক্ষ তুমি প্রতিনিধি,
সত্ত্বগুণনিধি তোমা করেছেন বিধি।
শুন হে মজুমদার লেখনী নিপুণ,
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।
পেশওয়া, সুর্নিস আর চিটনীস, ডবীর,
রাজজ্ঞ সুমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিত রায় ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়া অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতিরে।
সাত্ত্বিক প্রণয় ভরা, দৃষ্টান্তের কথা,
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'য়ো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে "নমস্কার অধিকারীগণ,
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।

তুকারামের পত্র পাঠে রাজা কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন—এমন কি তিনি স্বয়ং সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। কথিত আছে যে বীরবর সেকন্দর বাদসা প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক দায়োজিনিসের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দায়োজিনিস তাঁহার নিকট গমনে অস্বীকৃত হইলে সেকন্দর নিজেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুকারাম ও শিবাজী সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। ঐ সময়ে তুকাবাম দেহুর নিকটবর্ত্তী লোহগ্রামে বাস করিতেছিলেন--মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্য রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন "মহারাজ! সোনা রূপা আমার চক্ষে মাটির তুল্য, এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে, আমি হরির দাস, হরিই আমার আশা ভরসা। মহারাজ, তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজী তুকারামের নিস্পৃহতা ও অচলা দেবভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতাঠাকুরাণী জীজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার পুত্রটিকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সঙ্কীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম্ম তাহার তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। প্রজাপালন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অতএব মহারাজ তাহাই অনুষ্ঠান করুন। সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা মহারাজের পক্ষে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই উপদেশ গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুযায়ী 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে যেমন অর্জ্জুনের, ইহাতে সেইরূপ শিবাজীর চৈতন্য হইল। তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য দূর হইল, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

শিবাজীর প্রতিভাবলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন হয়, তাহা অনতিকাল মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার পুত্র শম্ভোজী ব্যসনাসক্ত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য

বাজিরাও ১ম

(২১৫ পৃষ্ঠা)

ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সর্দ্দার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে। শম্ভোজীর প্রাণ রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন, "তোর জীবন মরণ তোর আপনারই হাতে। যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিস তবেই তোর প্রাণ রক্ষা, নতুবা জল্লাদের হাতে তোর প্রাণদণ্ড হইবে।" শম্ভোজী উত্তর করিলেন, "বাদসা যদি আপনার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন, তাহ'লে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শম্ভোজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন।

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪

শম্ভোজীর পুত্র সাহু শৈশবকালে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পড়িয়া অনেক বৎসর কারাবাস ভোগ করেন। বাদসার মৃত্যুর পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্য ফিরিয়া পান কিন্তু মোগলদের মধ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাঁহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। নিজে রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম, সুতরাং ক্রমে সমস্ত রাজ্যভার সচিব প্রধান পেশওয়ার হস্তে সন্ন্যস্ত হইল। প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪ সালে বালাজী প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নৃপতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। পেশওয়া পদ তাঁহার বংশানুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্রপতি, পেশওয়াই আসল রাজা। শেষে এমন হইল সাতারার রাজা সাতারায় বন্দী, পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা। নূতন পেশওয়ার অভিষেককালে অভিষেক বসন মহারাজের নিকট হইতে আনান হইত এই যা রাজমর্য্যাদার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮ সালে বালাজী পেশওয়া সইয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পোষকতায় সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তার বৎসর দুই পরে দাক্ষিণাত্য রাজস্বের চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করেন, তাঁহার প্রযত্নে পুণা ও সাতারার অধীনস্থ প্রদেশসমূহে মহারাষ্ট্র রাজপতাকা বিধিমত বদ্ধমূল হইল।

বাজিরাও ১৭২১

বালাজীর পুত্র বাজিরাও দ্বিতীয় পেশওয়া। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতর সন্তান। হাইদ্রাবাদে নিজাম রাজ্য সংস্থাপক নিজাম আলি ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—ইহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত বাজিরাওয়ের দ্বন্দযুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু পেশওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল উত্তর হিন্দুস্থান। মোগল রাজ্যের ভগ্নস্তূপের মধ্যে মহারাষ্ট্র জয়স্তম্ভ নিখাত করাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। একদা তিনি মন্ত্রীসভায় সাহু রাজাকে বলেন, "এই আমাদের সময়। ভারতভূমি হইতে

বিদেশীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জনের এই অবসর। শুষ্ক তরুমূলে কুঠারাঘাত কর, শাখা সকল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।” তাঁহার উৎসাহ বাক্যে সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জ্বলন্ত উৎসাহে ক্ষণকালের নিমিত্ত উত্তেজিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন, “পিতার তুমি যোগ্য পুত্র, তুমিই স্বহস্তে মহারাষ্ট্র জয়ধ্বজা হিমালয় বক্ষে নিখাত করিবে। বাজিরাওয়ের বলবীর্য্যে মারাঠা রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল। পনর বৎসরের মধ্যে তিনি বাদসাহী মুলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন এবং বিন্ধ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্ম্মদা হইতে চম্বল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯ সালে পোর্ত্তুগীসদের নিকট হইতে বাসীন অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানন্তর ইংরাজেরা সাহু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রতি উপদেশ এই “রাজসভায় বাজিরাওয়ের শত্রু আছে কি না সন্ধান লইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুদলের ঈর্ষা জ্বালাইয়া দিবার সুযোগ পাইলে অমন সুবিধা যেন ছাড়া না হয়, কিন্তু সাবধান, দেখিবে তিনি যেন আমাদের শত্রু হইয়া না দাঁড়ান।” সে যাহা হউক, দৌত্য সফল হইল। ১৭৩৯ সালে পেশওয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রমুক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর পরে বাজিরাওয়ের মৃত্যু হয়।

বাজিরাও রূপবান্, বীর্য্যবান্, অমায়িক, সরলান্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি বীরোচিত কঠোর ব্রত পালনপূর্ব্বক আড়ম্বরশূন্য সহজ ভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। তাঁহার সহিত নিজাম-উল্-মূলকের প্রথম যুদ্ধারম্ভে নিজাম একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন, “বাজিরাওকে গিয়াই যেভাবে দেখিবে সেই ভাবে তাঁহার ছবি তুলিয়া আনিবে।” চিত্রকর দেখিলেন, বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে দুই হাতে জুয়ারীর দানা ভাঙ্গিয়া চিবাইতে চিবাইতে অশ্বপৃষ্ঠে সামান্য সেনার মত চলিয়াছেন, এই ভাবে তাঁহার ছবি তোলা হইল।

বাজিরাওয়ের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাঁহার উত্তরাধিকারী। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) মহারাষ্ট্রে যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহাই রাজ্যনাশের মূল। রাঘোবার পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও পিতার কার্য্য শেষ করিয়া রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন।

নানা সাহেব

বালাজীর অপর নাম নানা সাহেব। নানার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবল মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃৎকম্প উৎপাদন করে। ১৭৪১—৪২ সালে নাগপুর শাখার

সেনাপতি ভোঁসলা বাঙ্গলায় মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমাদের শিশু-ঘুমপাড়ানী গান আর "মারাঠা ডিচ" নামক নগর-সংরক্ষণী বর্গীদের উৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দ্দির নিকট হইতে তাঁহারা বাঙ্গলার চৌথ ও উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন।

জলদস্যু আঙ্গ্রে

নানার শাসনকালে ইংরাজেরা জলদস্যু আঙ্গ্রে দমনে পেশওয়ার সহযোগিতা করেন। পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিরা নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর মারাঠী সর্দ্দার আঙ্গে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কানোজী হইতে রাঘোজী পর্য্যন্ত, আঙ্গ্রে বংশের আধিপত্য কাল। রাঘোজীর মরণানন্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া ডালহৌসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্গে রাজ্য ইংরাজ হস্তগত হয়। আঙ্গ্রের হস্তে ইংরাজদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৫৪ মধ্যে দুই ইংরাজ রণতরী আঙ্গ্রে কর্ত্তৃক ধৃত হয়। কলিকাতাবাসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে সহরের চারিদিকে গর্ত্ত খনন করিয়া সুরক্ষিত হন, বোম্বের বণিকগণও আঙ্গ্রের আক্রমণ শঙ্কায় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ সালে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে দমন করিবার জন্য ইংরাজেরা পেশওয়ার সহিত যোগ দেন; পর বৎসরে সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ তাঁহার প্রধান দুই দুর্গ বিজিত হয়। সুবর্ণদুর্গ হারাইয়া তুলাজী সাগরপরিরক্ষিত বিজয়দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আডমিরল ওয়াটসন ও কর্ণল ক্লাইব, মিলিয়া, ওয়াটসন জলে ক্লাইব স্থলে, আক্রমণকরতঃ দুর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্ণর বিজয়দুর্গ লাভ লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাঙ্কোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপার্জ্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলেন। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে, ওলন্দাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি পাইবে না; তাহাদের বাণিজ্য পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন। পোর্ত্তুগীসের পতন ও মারাঠীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধি স্থাপনবশতঃ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয়জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভুত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

নানা সাহেবের শেষদশা শোচনীয়। তিনি পাণিপতের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন—ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য

পুনঃস্থাপনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। ইহার পর নানা সাহেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই পার্ব্বতী-মন্দিরে দেহত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পেশওয়া বড় মাধবরাও ১৭৬১—৭২

নানার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাণিপতের যুদ্ধে মারা পড়েন; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধবরাও পেশওয়ার পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সতর বৎসর। তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা পেশওয়াকে হাতে রাখিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার প্রয়াসী ছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাধবরাও স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক অসামান্য চাতুর্য্যের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মারাঠীদের দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি দর্শনে ইংরাজেরা সশঙ্কিত কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে সমুৎসুক। হাইদর দমনে মারাঠীদের সহিত সদ্ভাববন্ধন প্রয়োজন সুতরাং তাঁহাদের মনোভাব যাহাই হউক সদ্ভাবব্যঞ্জক দৌত্য পাঠাইয়া পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়া রাখিলেন। যাহাতে হাইদরের বলপুষ্টি নিবারিত হয় সেই তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা। ইংরাজ দৌত্যের পাঁচ বৎসর পরে মাধবরাও লোকান্তর গমন করেন। তিনি সন্তান সন্ততি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার স্ত্রী রমাবাই অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মৃতপতির অনুমৃতা হইয়া চিতানলে দেহত্যাগ করেন। মাধবরাও পেশওয়া ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত; বলবানের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সহায় ছিলেন। এই ন্যায়ী সাহসী প্রজাবল্লভ দৃঢ়মতি নৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পাণিপতের যুদ্ধেও তেমন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

নারায়ণরাও হত্যা

পঞ্চম পেশওয়া নারায়ণরাও, মাধবরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাঘোবা কাকা তাঁহার অভিভাবক। মাধবরাও মৃত্যুকালে অনেক বলিয়া কহিয়া ভাইটিকে রাঘোবার হস্তে সঁপিয়া যান। কতককাল খুড়া ভাই-পোর মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব বজায় ছিল কিন্তু নারায়ণরাওয়ের মাতা গোপিকাবাই ও রাঘোবার পত্নী আনন্দীবাই এই দুজনে বনিবনাও ছিল না। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঘোবার মনান্তর; এই সকল কারণে তিনি প্রাসাদে বন্দীকৃত হইয়া রহিলেন। তদবধি তিনি

ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। সেনাদের ঘুস দিয়ে বশ করা তাঁহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল যে পেশওয়ার সৈন্যদল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। নারায়ণরাও তখন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন। বিদ্রোহী দলের নেতা সমরসিংহ, তুলাজী পেশওয়ার নামক রাঘোবার অনুচর সমরসিংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সম্মুখের দ্বার ছাড়িয়া অন্য দ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ পেশওয়ার শয়ন-গৃহের দিকে ধাবিত হইল। নারায়ণরাও তাহাদের গোলমাল শ্রবণে ভীত হইয়া কাকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন—সমরসিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যুবক কাকার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। রাঘোবা সমরসিংহকে ক্ষান্ত হও বলিয়া অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে? ভূতকে বোতল হইতে ছাড়িয়া দিয়া এখন কি তাহাকে শান্ত রাখা যায়? সমরসিং উত্তর করিল—"এতদূর আসিয়া কি আমি নিজেই মরিতে যাইব? ছাড়িয়া দেও নতুবা তুমিও মারা পড়িবে।" রাঘোবা ছাড়াইয়া ছাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। নারায়ণরাও পলায়নোদ্যত কিন্তু পাষণ্ড তুলাজী তাঁহার পা টানিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। এমন সময় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী রাজ-ভৃত্যের প্রবেশ। তাহার হাতে যদিও কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই—সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার প্রভু ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান হইল। তাহাকে দেখিয়া নারায়ণরাও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন—চাকর মুনিব দুজনেই নরাধম নিষ্ঠুর হন্তারকদ্বয় কর্তৃক নিহত হইল।

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত কিনা—তাহার কোন প্রমাণ ছিল না—রামশাস্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। রামশাস্ত্রী ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ সুবিজ্ঞ বিচারপতি—পুণা দরবারে বশিষ্ঠস্বরূপ ছিলেন। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন যে রাঘোবা নারায়ণরাওয়ের বধের আদেশ দেন নাই—তাঁহাকে ধরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপত্রে "ধরিবে" এই কথা বদলাইয়া "মারিবে" কথা কে একজন বসাইয়া দিয়াছে। রাঘোবাপত্নী (Lady Macbeth) আনন্দীবাই এই কাণ্ডের মূল কারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই ঘটনার কতকদিন পরে রাঘোবা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?" শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন, "তোমার নিজের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর সুখ নাই—তোমার এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্তা থাকিবে ততদিন আমি এ সরকারে চাকুরী করিব না—আর এমুখো হইব না।" শাস্ত্রী তাঁহার বচন রক্ষা করিলেন। সেই অবধি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

"ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটীরে, চলি গেলা ধীরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।" *

ষষ্ঠ পেশওয়া রঘুনাথরাও (রাঘোবা)

রঘুনাথরাও পেশওয়াপদে আরূঢ় হইলেন কিন্তু বিস্তর দিন টিঁকিতে পারেন নাই। তিনিও যেমন যুদ্ধ-যাত্রায় পুণার বাহির হইলেন, তাঁহার বিপক্ষদলও মাথা তুলিল। মন্ত্রীপ্রধান খ্যাতনামা নানা ফর্ণবীস সে দলের নেতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ একে একে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোবা বেগতিক দেখিয়া সিন্দে, হোলকার ও ইংরাজদের শরণভিক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পেশওয়া বংশের অবনতি

এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যখন বাজিরাও রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখন সেনাপতি রাঘোজী ভোঁসলা বহ্রাড় প্রান্তের জায়গীরদার ছিলেন। তিনিও পেশওয়ার দৃষ্টান্তে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশওয়ার অধীনস্থ অপরাপর কর্ম্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে মহারাষ্ট্র রাজ্যে পঞ্চ শাখা বিস্তৃত হইল।

পঞ্চ শাখা

পেশওয়া তাহার মধ্যস্থিত, তাঁহার রাজধানী পুণা। ভোঁসলার রাজধানী নাগপুর। সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধিপত্য পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গাইকওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশওয়া চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ, অন্যান্য সর্দ্দারগণ শূদ্রজাতীয় মারাঠা। মহ্লাররাও হোলকর হীনবর্ণ সৈনিক ছিলেন; রাণোজী সিন্দে পেশওয়ার পাদুকাধারী; পিলোজী গাইকওয়াড় গোরক্ষক রাখালরাজ। ইঁহারা সকলেই দীনহীন সামান্য শ্রমজীবির জীবিকা হইতে স্বভুজবলে রাজসিংহাসন উপার্জ্জন করেন, নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবংশ পত্তন করিয়া যান। পেশওয়া প্রথমত এই সকল বীরদিগকে দেশবিজয়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর সৈন্য যোগাইবার ভার। তাঁহারা দূরে দূরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন, পেশওয়া তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব খাটাইবার

* কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুবিধা পাইলেন না। পেশওয়ার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছানুসারে তাঁহারা সন্ধি বিগ্রহ করিতে লাগিলেন ও রাজ্যরক্ষার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া স্বার্থ সিদ্ধিতেই নিযুক্ত করিতেন। কালক্রমে তাঁহারা নিজে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন,—পেশওয়ার অধিকার নাম মাত্র। সাতারার রাজা সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়ার সম্বন্ধে তদ্রূপ তাঁহার ভৃত্যবর্গ।

পুণায় দলাদলি

পুণা দরবার দুই দলে বিভক্ত। একদল রাঘোবার পক্ষ -অপর দল মৃত নারায়ণ-রাওয়ের পত্নী গঙ্গাবাইয়ের পক্ষ। গঙ্গাবাই তখন গর্ভবতী, সুরক্ষিতভাবে পুরন্দর দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোবা সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বপক্ষ সমর্থনে যত্নশীল হইলেন; প্রথম প্রথম কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিপক্ষ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিলেন কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল। পুণার সিংহাসন স্পর্শ করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় বজ্রপাত সদৃশ সংবাদ আসিল যে রাণীর পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে;—চল্লিশ দিন গত হইলে শিশু-রাজার রীতিমত রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জ্যেঠা অপেক্ষাও বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধবরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই সঙ্কটে হোলকর সিন্দিয়ার সাহায্য লাভে নিরাশ্বাস হইয়া রাঘোবা ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লালসায় তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট

১৭৭৫ সালে রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয় তাহার নাম সুরাট সন্ধি; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইংরাজেরা রাঘোবাকে সসৈন্য পুণায় পৌঁছাইয়া দিয়া পেশওয়া সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবেন—রাঘোবা ইংরাজদের পুরস্কার-স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন।

রাঘোবার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। সুরাট সন্ধির পর পুরন্দর সন্ধি, এই প্রকার নানা পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর অবশেষে ১৪ই নবেম্বর ১৭৭৮ সালে রাঘোবার সহিত নূতন সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজ ও মারাঠীদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হয়।

প্রথম মারাঠা যুদ্ধ

গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষা না করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বঙ্গের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল এজর্টন। তাঁহার যে একাধিপত্য তাহা নহে, তাঁহার উপর আবার এক যুদ্ধকমিটির অধিকার। এই অল্প সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র গর্ভে প্রবেশ করা যত সহজ মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিষ সৈন্য যত অগ্রসর হয়, মারাঠীরা আশপাশ প্রদেশ অগ্নিসাৎ-করতঃ ততই পিছু হটে। ইংরাজ সৈন্য তলেগাম গিয়া দেখে সকলি ভস্মরাশি—লোকজন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। তুদিন পরে কমিটি হইতে সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের হুকুম আসে। যদিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশমত কার্য্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তোপসকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর ভাগ জিনিসপত্র অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া ব্রিটিষ সৈন্য ফিরিল। কমিটি ভাবিয়াছিলেন সৈন্যেরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে, কেহ কিছু জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে না হইতেই শত্রুদলের গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজ সৈন্যের স্বপ্নভঙ্গ হইল, সন্ধ্যার সময় সে সৈন্য অনেক কষ্টে বড়গাম পৌছে। পর দিন প্রভাত হইতে তাহাদের উপর পুনর্ব্বার গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল—অবশেষে ব্রিটিষ সেনা হার মানিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইংরাজদের এমন হার আর কখন হয় নাই। মারাঠীরা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন, ইংরাজেরা সালসেট প্রভৃতি তাঁহাদের কতকগুলি অধিকৃত প্রদেশ ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্দের ভোগে ভরুচ অর্পণ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধিত হইল।

ইংরাজদের দর্প চূর্ণ।—এই কলঙ্কপূর্ণ বড়গাম সন্ধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন না। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন—তাহা মারাঠীদের অগ্রাহ্য হইল। পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ।

জেনেরল গডার্ড

এই সঙ্কটে জেনেরল গডার্ড বঙ্গে সৈন্যের সাহায্যে আগমন করেন। তিনি তখন বন্দেলখণ্ডে ছিলেন। তথা হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০০ মাইল কুচ করিয়া সুরাটে আসিয়া পৌছিলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কোঙ্কন তাঁহার রণক্ষেত্র। ১৭৮০ সালে তিনি মারাঠীদের উপর জয়লাভ করিয়া বাসীন অধিকার করেন।

পুণা-দরবারে ব্রিটিষ দূত

(২০৩ পৃষ্ঠা)

হাইদর আলি

এই সময়ে হাইদর আলির কর্ণাটক আক্রমণ সংবাদ বম্বে পৌঁছে, হাইদর দমনে ইংরাজদের সমুদয় বল প্রয়োগ করা চাই, মারাঠীদের সঙ্গে বিবাদভঞ্জন তখন প্রয়োজন। সেনাপতির প্রতি মারাঠীদের সহিত সন্ধিবন্ধনের অনুমতি হইল। মনোমত কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পেশওয়াকে ভয় দেখান আবশ্যক এই বিবেচনায় গডার্ড সৈন্যসামন্ত লইয়া বরঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা উপরে খণ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মারাঠীরা তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বোম্বাই ও গডার্ড সৈন্যের মাঝখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। পলায়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড ফিরিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বরং অল্প সৈন্য লইয়া সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা কিন্তু মারাঠীদের কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গডার্ড তাহাই ঠেকিয়া শিখিলেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনে ব্রিটিষ সৈন্যের সমূহ ক্ষতি। দেশী ইউরোপীয় সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬১ সেনা হত কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র শত্রুহস্তে পতিত হইল।

সালবাই সন্ধি

এই দুই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাজ মারাঠীদের মধ্যে দেশের আদান প্রদান হইল। ইংরাজেরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন—তিনি অতঃপর পেন্সনভোগী হইয়া গোদাবরীতীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্য ইউরোপীয় জাতির সহিত মিত্রতাবন্ধন করিবেন না, পেশওয়া এইরূপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা হাইদরের বিপক্ষে অবাধে অস্ত্রচালনা করিবার সুযোগ পাইলেন।

মহাদাজী সিন্দে

সালবাই সন্ধিসাধনে মারাঠী পক্ষে সিন্দে প্রধান উদ্যোগী—মহাদাজী সিন্দে; এই সন্ধিসূত্রে সিন্দিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মহাদাজী প্রথমে সামান্য পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মোড়ল বই নয়—পেশওয়া সরকারে চাকর; এইক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মারাঠী সর্দ্দারদের অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য-বিস্তার হইতে চলিল। এই মহাদাজী সিন্দে মহারাষ্ট্রে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—জাতীয় বীরের মধ্যে ইনি শিবাজীর নিচেই গণনীয়।

মহাদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারকরতঃ পাণিপতের কলঙ্ক মোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অনুকূল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্নচূর্ণ, চতুর্দ্দিকে

অরাজকতা—যার বল তারই জয়, জোর যার মুলুক তার। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও দিল্লী সিংহাসনের উপর লোকের অটল অনুরাগ। দিল্লীশ্বর বীর্য্যহীন, ঐশ্বর্য্যহীন কিন্তু তাঁহার নামে সকলেই মোহিত, তাঁহার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে লোকে উৎসাহিত, তাঁহার প্রদত্ত মানার্জ্জনে মহা মহ' আমীরও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সিন্দিয়াও অবসর বুঝিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম। তাঁহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, এই ঘটনায় উজীর পদের জন্য মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। নজফের উত্তরাধিকারী আফ্রাসিয়াব। মহম্মদবেগ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, এই প্রতিদ্বন্দ্বী দমন মানসে আফ্রাসিয়াব সিন্ধিয়াকে ডাকিয়া পাঠান। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আগ্রায় গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরে আফ্রাসিয়াব শত্রুহস্তে নিহত হওয়ায় রাজ্যবিপ্লব দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ার দিকে তাকাইয়া, সিন্দিয়ার সাহায্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দিয়া দিল্লী প্রয়াণ করিয়া পেশওয়ার জন্য "বাদসাহী উজীর" পদবী আদায় করিলেন,—স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরূপে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোআব প্রদেশ তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। বাদসা সৈন্যমাঝে সঙের মত এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিলেন—সিন্দিয়া মথুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন করিলেন।

সিন্দিয়ার মথুরা প্রবাসকালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট পুণা দরবারে একজন রেসিডেণ্ট বসাইবার চেষ্টায় মহারাজা সিন্দে সন্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। ব্রিটিষ দূত ম্যালেট সাহেব মথুরায় সিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোগল সম্রাট সা আলম তখন সিন্দের ক্যাম্পে, তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ পরিবর্ত্তন! ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মারাঠী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন দিল্লীশ্বরের মহিমামিহিরে দিক্ বিদিক্ ঝলসিত। সেকাল আর একাল! এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সমস্ত মহিমা অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিল্লীসম্রাট এখন বর্গীদের অনুগ্রহ ভিখারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আবদার করিতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, সিন্দের প্রসাদে ব্রিটিষ দৌত্য সফল হইল।

পুণার রেসিডেণ্ট সার জন ম্যালেট

১৭৭৫ সালে ম্যালেট সাহেব ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট হইয়া পুণায় প্রবেশ করেন ও কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত দৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "ছুঁচ হইয়া প্রবেশ, ফাল হইয়া বাহির হওয়া" ইংরাজ নয়-কৌশলের এই যে পরিণতি, পুণার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

পেশওয়া মাধব রাও (২২৩ পৃষ্ঠা)

পেশওয়া রঘুনাথ রাও (২২০ পৃষ্ঠা)

মহাদাজী সিন্দে (২২৩ পৃষ্ঠা)

নানা ফর্ণবীস (২২৫ পৃষ্ঠা)

উত্তর হিন্দুস্থানে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনানন্তর মহাদাজী সিন্দে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি পেশওয়ার হস্তে দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত নূতন পদমর্য্যাদা প্রদান উপলক্ষে পুণায় পদার্পণ করেন। তখন পেশওয়া সওয়াই মাধবরাও। তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। পুণায় এমন ধূমধাম আর কখনো হয় নাই। প্রথমে পেশওয়ার "বাদসাহী উজীর" পদবী গ্রহণ। উৎসবের জন্য সারি সারি তাম্বু পড়িয়াছে। প্রান্তবর্ত্তী তাম্বুতে এক স্বর্ণ সিংহাসন প্রস্তুত, তৎসমীপে বাদসাহী সনন্দ, বসন ভূষণ উপহার সামগ্রী সকল বিরচিত। পেশওয়া সিংহাসনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনবার সেলাম করিয়া শতৈক স্বর্ণ মোহর নজরাণা দিয়া বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। পরে বাদসাহী পরওয়ানা পঠিত হইল। ইহার শেষ ভাগে হিন্দুস্থানে গোহত্যা নিষেধসূচক অনুজ্ঞা ছিল তাহা শ্রবণ মাত্র সভাসদ্‌জনের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তৎপরে আড়ালে গিয়া অভিষেক বসন ভূষণ পরিধান করিয়া দরবারে পেশওয়ার পুনঃ প্রবেশ, সভাস্থ সর্দ্দারের অভিবাদন ও দস্তুর মত নজরদান। অনন্তর তিনি দিল্লীশ্বর প্রেরিত অশ্ব রথ গজ, ঢাল তলবার, বসন ভূষণ, চামর নিশান প্রভৃতি বিবিধ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সভাভঙ্গ করিয়া পেশওয়া যখন সহরে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, বাদ্যধ্বনি, তোপধ্বনি, পৌরজনের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি গগনভেদী গম্ভীর নাদ সমুত্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে সিন্দের বরণ। এই প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় অভিনয় অতীব কৌতুকজনক। পাত্রমিত্র সভাসদ্ সমস্ত লোকে তাঁহার সম্মানার্থে যেমন ব্যগ্র, সিন্দিয়া নিজ পদলাঘব বজায় রাখিতে তেমনি তৎপর। সমবেত আমীর ওমরাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করা, স্বভুজার্জ্জিত উচ্চপদবী সকল তুচ্ছ করিয়া আপনার পাটেল নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা, মোরচল (ময়ূর পুচ্ছের চামর) ধরিয়া পেশওয়ার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে চলা, পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওয়ার পার্শ্বে পাদুকা ধরিয়া দাঁড়ানো, ইত্যাদি বিনয় ভানে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল।

নানা ফর্ণবীস

এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড সমাপ্ত হইবার পর সিন্দে ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পুণা দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। পুণায় থাকিয়া প্রধান মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এই তাঁহার ভিতরকার মতলব। এই সময়ে নানা ফর্ণবীস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মাথা তুলিলেন। পুণা দরবারে নানা একমাত্র দূরদর্শী

চতুর মন্ত্রী ছিলেন, সিন্দের অতিভক্তির তলে যে স্বার্থসাধন অভিসন্ধি ছিল তাহা তলাইয়া বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। নানা ও সিন্দের মধ্যে মহা রেষারেষি,—পেশওয়া বেচারা ভাবিয়া পান না কোন্ দিক্ রক্ষা করেন। দুইজন তাঁহার দুই বাহু। মহাদাজীর প্রভুত্ব নানার অসহ্য হইয়া উঠিল—এমন কি, তিনি রাজ্য কারবার ছাড়িয়া কাশীবাসের সঙ্কল্প জানাইলেন। এমন সময় যমদূত আসিয়া নানার পক্ষ অবলম্বন করিল। সিন্দিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নানার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার প্রভুত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

খর্ডার যুদ্ধ

মহাদাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে পেশওয়া ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম। নিজাম আলি ব্রিটিষ সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। শীঘ্রই যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রীয় মহা মহা বীরেরা পেশওয়ার পতাকাতলে এই শেষবার সম্মিলিত হইলেন। মহাদাজীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্দে তথা তুকাজী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা ভোঁসলাও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন। গোবিন্দরাও গাইকওয়াড় গুজরাট হইতে ফৌজ পাঠাইলেন। রাস্তে ও পটবর্দ্ধন, মালেগাম ও বিঞ্চুরপতি, পন্ত্ প্রতিনিধি, পন্ত্ সচিব, নিম্বালকর, পাট্নকর, ঘাটগে, ডমালে, থোরাত, পত্তওয়ার প্রভৃতি বড় বড় শূর সর্দ্দার জায়গীরদার স্ব স্ব দলবল লইয়া রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। অশ্বপদাতিক সর্ব্বসমেত প্রায় দেড় লক্ষ সেনা একত্রিত। পরশুরাম ভাউ সেনাপতি। আহমদনগর জিলার অন্তর্গত খর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বড় একটা রক্তপাতের প্রসঙ্গ আসে নাই। যেমন গর্জ্জন তেমন বর্ষণ নয়। কোন পক্ষের বিশেষ রণচাতুরীও প্রকাশ পায় নাই। নিজামের অকারণ ভীরুতা ও ভয়ে পলায়নবশতঃ মারাঠীরা সুলভমূল্যে জয় ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। মারাঠীগণ এই যুদ্ধে নিজাম সরকার হইতে দৌলতাবাদ ভূমিখণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয়া বিলক্ষণ এককামড় আদায় করিয়া লইল। নানার গৌরবের আর সীমা রহিল না। কোন বিদেশী রাজার সাহায্য বিনা অমন প্রবল শত্রুর পরাভব, ধন্য নানার নয়কৌশল! দৌলতরাও সিন্দিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তুকাজী হোলকর তাঁহার বাধ্য, রঘুজী ভোঁসলা ও অপরাপর সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। পেশওয়ার রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অনুকূল। এই সমস্ত শুভলক্ষণ সত্ত্বেও কোথা হইতে অতর্কিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া নানার আশা ভরসা বন্যায় ভাসাইয়া দিল।

পেশওয়ার আত্মহত্যা

যে অনর্থপাতের কথা সূচিত হইল তাহা মাধবরাও পেশওয়ার আত্মহত্যা। তাঁহার বয়স যদিও বিংশতি বৎসর, তথাপি নানা তাঁহার সহিত নাবালকের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিতেন না। ইচ্ছামত তাঁহাকে আপনার ভাইদের সঙ্গে মিশিতে দিতেন না।—নানার বড়চক্রে রাঘোবার তিন পুত্র কয়েদ ছিলেন, বাজিরাও তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। এই বাজিরাও শাস্ত্রালাপ, শস্ত্রনৈপুণ্য রূপে গুণে বিখ্যাত ছিলেন। মাধবরাও সর্ব্বদাই তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতে পাইতেন। কিসে তাঁহার কারামুক্তি হয়, তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়, পেশওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত অনর্থের মূল—তাঁহার পুত্রদের প্রশ্রয় দিলে রাজ্যের অনিষ্ট বই ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি এই ভাবে পেশওয়াকে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ তাঁহার ততই আরো বৃদ্ধি হয়। মাধবরাও অবসর বুঝিয়া বাজিরাওকে চরের হাত দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান, এইরূপে গোপনে তাঁহাদের পত্রব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। এক পত্রে বাজিরাও লেখেন "আমরা দুজনেই বন্দী, তুমি পুণায় আমি জুনরে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন—ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। যদি আমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অটল থাকে, আমরা যদি আমাদের পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব।" নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, বাজিরাওয়ের বন্ধন দ্বিগুণিত করিলেন, মাধবরাওকে নানা প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ করিয়া ঘরে বন্ধ হইয়া রহিলেন। বিজয়া দশমীর দিন দস্তর মত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও বাধ্য হইয়া সে উৎসবে যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের কষ্ট নিবারণ হইল না। তিনি জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য উদাস হইয়া উৎসবের দুদিন পরে প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

পেশওয়া বাজিরাও ১৭৯৬—১৮১৭

এই ঘটনায় পুণায় হুলস্থূল বাধিয়া গেল। রাজ-সিংহাসনে কে বসিবে এই এক বিষম সমস্যা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তাঁহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত মাধবরাওয়ের পত্নী যশোদাবাই বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠ চিমনাজীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং চিমনাজীকে পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করা হয়। নানা এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, তাহা

কার্য্যেও পরিণত হইল। এদিকে আবার দৌলতরাও সিন্দে বাজিরাওয়ের পক্ষ গ্রহণ করায় অবশেষে সেই পক্ষেরই জয় হইল। এইরূপে অশেষ উৎপাতের হস্ত এড়াইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৬ সালে বাজিরাও পেশওয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। নানাও বিস্তর ফাঁড়া কাটাইয়া পরিশেষে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া —নানা ফর্ণবীস তাঁহার দেওয়ান।

বাজিরাও পুণার শেষ পেশওয়া। নানা ফর্ণবীস যতদিন মন্ত্রীরূপে রাজ্যের হাল ধরিয়াছিলেন ততদিন রাজ্যতরী নানা সঙ্কটের মধ্যে এক প্রকার নিরাপদে চলিয়াছিল। পুণা দরবারে তিনি একমাত্র বিচক্ষণ কর্ণধার ছিলেন। ইংরাজদের প্রতাপ ও সত্যনিষ্ঠার উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অতবড় প্রবল শত্রুকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংরাজদিগকে সাধ্যমত দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাজিরাওয়ের আমলে নানা ফর্ণবীস রাজ্যের হিতকামনায় পেশওয়াকে নিঃস্বার্থভাবে সৎ-পরামর্শ দিতে সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন। কিন্তু রাজা যখন অব্যবস্থিত ব্যসনাসক্ত দুর্ব্বুদ্ধি, তখন মন্ত্রী আর কত পারিয়া উঠিবেন?

যশবন্তরাও হোলকর

১৮০০ সালে নানার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর অরাজকতা উৎপন্ন হইল। পেশওয়ার শাসন নির্জীব ও অন্তঃসারশূন্য, চতুর্দ্দিকে বিপ্লব, যে যেখানে পারে সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা সাধিয়া লইতে তৎপর। বৎসরেক পরে আর এক নূতন বীর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—ইনি যশবন্তরাও হোলকর। সিন্দিয়া এতদিন হোলকরকে বশে রাখিয়াছিলেন, যশবন্তরাও সহসা স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে সমুত্থানপূর্ব্বক সিন্দের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবন্তের রণকাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এইস্থলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি।

হোলকর বংশ

হোলকর বংশ আসলে ধনগর (গয়লা) জাতীয় মারাঠা। পুণাসন্নিহিত নীরানদী তীরবর্ত্তী হোলগ্রামে তাঁহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের কুলনামের উৎপত্তি। হোলকর বংশের মুখোজ্জ্বলকারী মহ্লাররাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে খান্দেশে তাঁহার মামার মেষপালক ছিলেন।

মহ্লাররাও ১৬৯৩—১৭৬৯

একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় এক বৃহৎ অজগর সর্প তাঁহার মুখের উপর আতপত্ররূপে ফণা ধরিয়া থাকে। এই শুভলক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্য চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি একজন মারাঠী সর্দ্দারের নিকট ঘোড়সোয়ারের কর্ম্ম পান। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ১৭২৪ সালে বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বের অশ্বপতি পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমি সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। ১৭৩২ সালে তিনি পেশওয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে মালবের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাভব করেন। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মালব বিজয়ান্তর সিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়া লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। এইরূপে তাঁহার রাজ্য ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল। পাণিপতের যুদ্ধে যে অল্প কয়েকজন মারাঠী বীর ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, মহ্লাররাও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ঐ যুদ্ধে বড় একটা যোগ দেন নাই—তাহার কারণ এইরূপ রাষ্ট্র যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ পরামর্শ দেন মারাঠী সেনাপতি সদাশিব ভাউ "গয়লার কথা কে মানে" এই বলিয়া সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার পরামর্শ এই—পাঠানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের দলবলকে বিবিধ উপায়ে হায়রাণ করা—বল অপেক্ষা কৌশলে তাহাদের দমন করা—পলায়নচ্ছলে অরিদল আকর্ষণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাহাদের উপর হল্লা করা; "ত্বরায় অনর্থ, বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি" এই তাঁহার উপদেশ। এই সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি তাড়াতাড়ি রণে মাতিয়া গেলেন, শীঘ্রই তাহার বিষম ফলভোগও করিলেন। পাণিপতের যুদ্ধের পর মহ্লাররাও মধ্যহিন্দুস্থানে স্বরাজ্যের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করেন—তাঁহার তাহাতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেননা মহ্লাররাও উদারচেতা, বিনয়ী অথচ দৃঢ়মতি, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব, রাজ্যশাসনেও সেইরূপ তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অহল্যাবাই

মহ্লাররাওয়ের পুত্র খণ্ডেরাও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার পৌত্র মালিরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী। মালিরাও নির্ব্বুদ্ধি ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। মালিরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা খ্যাতনামা

অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকাজিরাও তাঁহার সেনাপতি। উভয়ে মিলিয়া, অশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতাসহকারে ৩০ বৎসর কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তুকাজীর দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সাতপুরা শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশের তত্ত্বাবধান করা, করদ রাজ্য সকল হইতে কর আদায় করা, এ সকল অহল্যাবাই করিতেন। যখন তুকাজী উত্তর হিন্দুস্থান পরিদর্শনে গমন করিতেন, তখন মালব নিমার প্রভৃতি প্রদেশের সমগ্র কার্য্যভার রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত—সমুদায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শাসন বিস্তৃত। রাজকোষ তাঁহার হস্তাধীন—রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব নিয়মপূর্ব্বক রক্ষিত হইত। কোন গুরুতর রাজকার্য্য উপস্থিত হইলে তুকাজী রাজ্ঞীর পরামর্শ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না এবং পররাজ্যে যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিতে হইত, তাহা অহল্যাবাই স্বয়ং করিতেন। তাঁহার অনুপম নয়কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা-গ্রন্থির কোন শৈথিল্য ঘটে নাই। এদিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের সুখশান্তিবর্দ্ধনেও তাঁহার অশেষ যত্ন। এক দিকে অতিরিক্ত করভার হইতে রায়তদের অব্যাহতি দান, অন্য দিকে জমিদারদের স্বত্বরক্ষণ, এই দুই দিক রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্ঞী যেরূপ প্রজাবৎসলা, প্রজারাও তাঁহাকে নীতিপ্রজ্ঞা-মূর্ত্তিমতী জননী সমান শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে আদালত পঞ্চায়ৎ অথবা মন্ত্রীবর্গের বিচারে সঁপিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য দরবারে নিজ হস্তেই ন্যায় বিতরণ করিতেন—যাহার যে কোন আবেদন তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন, শক্তের ভক্ত হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় পীড়ন অনুমোদন করিতেন না, স্ত্রীজন চিত্ততোষী তোষামোদও তাঁহাকে ন্যায়মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজ্ঞী মহারাষ্ট্র দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৭৯৫ অব্দে ষাট বৎসর বয়সে সংসার যাত্রা হইতে অপসৃত হন। সেনাপতি তুকাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু কি করেন—সে বয়সে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না, কিন্তু তাহা না হইলেও তাহাকে মহ্লাররাওয়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। প্রথম মারাঠী সমরে তুকাজী হোলকর ও মহাদাজী সিন্দে উভয়ে মিলিয়া একমনে কার্য্য করেন। শেষাশেষি তাঁহাদের পরস্পর বৈমনস্য ও বৈরভাব সংঘটন হয়। মহাদাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তুকাজী পরলোকগত হয়েন।

তুকাজীর চারি পুত্র। কাশীরাও ও মহ্লাররাও দুইজন পত্নী-গর্ভজাত—যশবন্ত ও বিঠোজী দুই দাসীপুত্র। কাশীরাও মহ্লাররাও দুই ভায়ে রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি; জ্যেষ্ঠের সহায় দৌলতরাও সিন্দে, কনিষ্ঠের পক্ষে নানা ফর্ণবীস। একবার দুই ভায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয় কিন্তু সে চেষ্টার কোন ফল হইল না। যে দিনে দুই

ভ্রাতা তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধন স্থাপন করিলেন, তার পর দিনেই মহ্লাররাও সিন্দিয়ার সৈন্যহস্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহ্লাররাওয়ের পক্ষ ছিলেন, তিনি এই গোলযোগে পলায়ন করিয়া নাগপুর রাজার শরণাপন্ন হইলেন। সেখানে শরণ লাভ দূরে থাকুক তাঁহার ভাগ্যে কারালাভ ঘটিল—দেড় বৎসর পরে বহুকষ্টে পলায়নে মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওয়ের নামে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মারাঠা, রাজপুত, পাঠান, ভিল, পিণ্ডারী প্রভৃতি লোক হইতে ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ইউরোপীয় রণপণ্ডিতদের সাহায্যে এই ফৌজ হইতে রণদক্ষ শিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। আমীর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সর্দ্দারের সাহায্য পাইয়া তাঁহার বল পুষ্ট হইল; দুইজনে মিলিয়া সিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর লুটপাট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরিশেষে ১৮০২ সালে পুণাগগনে ধূমকেতুর ন্যায় সহসা সসৈন্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পুণা আক্রমণের এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বিঠোজী কোন এক বিদ্রোহাচরণে ধরা পড়িয়া দণ্ডনীয় হন, বাজীরাও তাঁহাকে হাতীর পায়ে বাঁধিয়া নির্দ্দয়রূপে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। সিন্দিয়ার রাজ্য লুণ্ঠন স্থগিত রাখিয়া যশবন্তরাও প্রতিশোধ তুলিবার মানসে পুণার দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য পেশওয়া এবং সিন্দে উভয়ে আলিবেল ঘাটে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তিনি আর এক দিক দিয়া ঘুরিয়া সৈন্যহস্ত এড়াইয়া পুণার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে আসিয়া তাম্বু গাড়িলেন। দুই দিন পরে দুই সৈন্যের সংঘর্ষণ। ঘোরতর সংগ্রামের পর যশবন্ত জয়ী হইলেন। সিন্দিয়া কামান ও অন্যান্য জিনিষপত্র ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুণার পথ উন্মুক্ত। পর দিন ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট কর্ণল ক্লোজ সাহেব হোলকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন কর্দ্দমাক্ত ক্ষত বিক্ষত শরীরে অন্ধবীর * এক ক্ষুদ্র তাম্বুতে শয়ান, ঠিক যেন শরশয্যাগত ভীষ্মদেব। হোলকর কর্ণল সাহেবকে পুণায় থাকিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিবার ঔৎসুক্য দেখাইলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ না মানিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। হোলকর তখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ণ অবকাশ পাইলেন এবং মনের সাধে নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।

বাজিরাও হোলকরের বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে

---

* ইতিপূর্ব্বে ঘটনাক্রমে দৈবাৎ বন্দুক ছুটিয়া যাওয়াতে একচক্ষু হারাইয়া ছিলেন।

সিংহগড়, সিংহগড় হইতে রায়গড়, রায়গড় হইতে রত্নগিরির সমীপস্থ সুবর্ণদুর্গ, পরিশেষে ব্রিটিষ পোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে বাসীনসন্ধি।

বাসীনসন্ধি ৩১ ডিসেম্বর ১৮০২

এই সন্ধিযোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল। সন্ধির মর্ম্ম এই, ইংরাজেরা পেশওয়াকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া দিবেন,—পেশওয়া স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিষ সৈন্য পোষণ করিবেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহাতে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হয় এমন ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সন্ধি বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরূপে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া বাজিরাও পুণায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মসনদ প্রাপ্তি ঘোষণার্থে ১৯ তোপধ্বনি হইল। প্রকৃতপক্ষে এ তাঁহার সম্মানার্থে নহে, ইহা ইংরাজদের রাজ্যলোভসূচক জয়ধ্বনি।

বাজিরাও সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়া যে বিশেষ কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। কায়দা নাই, কানুন নাই, কোন প্রকার শাসন নাই—প্রজাদের যে ভয়ানক দুর্দ্দশা তাহা কহতব্য নয়। পুণার আশপাশ পল্লীগ্রাম সকল দস্যু তস্করের আবাস—রাজপুরুষেরা তাহাদের লুটের ভাগী ও প্রশ্রয়দাতা। পেশওয়ার নিজের রাজ্যশাসনের ক্ষমতা নাই। পুণা দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্ত্তারও নাম গন্ধ নাই। বাজিরাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসী ছিলেন, তাঁহার নিজের আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। আদালত নাম মাত্র—যাহার পয়সা তাহারই জয়।

ত্রিম্বকজী

দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিম্বকজী ডাঙলিয়া নামক এক ব্যক্তি আবার তাঁহার মোসাহেব ও দুর্ম্মন্ত্রী আসিয়া জুটিল। যেমন রাজা তার উপযুক্ত মন্ত্রী। যেমনটি চাই বাজীরাও তেমনি ভৃত্য পাইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়াড় সরকারের মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিবাদভঞ্জন কার্য্যে পুণায় আগমন করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রীর আগমন পেশওয়ার মনঃপূত হয় নাই। তাই বাহিরে যতই ভদ্রতাচরণ করুন, ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। বাজীরাওয়ের নিমন্ত্রণে শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই

দুজনের একত্রে পানভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় শাস্ত্রী বিঠোবা মন্দিরে পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পেশওয়ার মধুরালাপে প্রীত হইয়া যেমন তিনি মন্দিরের বাহির হইলেন অমনি জল্লাদের খড়্গাঘাতে ব্রাহ্মণের অপঘাত মৃত্যু হইল। এই ব্রহ্মহত্যার মূল প্রবর্ত্তক ত্রিম্বকজী। কিন্তু পেশওয়া যে নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন তাহা নহে—তাঁহাকেও সত্বর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিরাওয়ের রাজ্যে শমন-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট এলফিনিষ্টন

সুবিচক্ষণ এলফিনিষ্টন সাহেব তখন পুণায় ব্রিটিষ কার্য্যকর্ত্তা। ত্রিম্বকজী এই হত্যা-কাণ্ডের মূলপ্রবর্ত্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এলফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠান। বাজিরাও প্রথমতঃ ইতস্তত করেন, পরে তাড়া পাইয়া অগত্যা প্রিয়তম ত্রিম্বকজীকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন—ত্রিম্বকজী থানার দুর্গে বন্দী রহিলেন। তাহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকি পাহারা। কতকদিন পরে তিনি ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়নপূর্ব্বক পাহাড় পর্ব্বতে অদৃশ্যভাবে ফিরিতে লাগিলেন।

বাজিরাও এইক্ষণে ইংরাজদের তাড়াইবার নানান্ পন্থা দেখিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে সিন্দে হোলকর নাগপুররাজা পিণ্ডারী দস্যুদল, এই সকল লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্য জাতির মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ উদ্দেশে ত্রিম্বকজীকে অর্থ-সাহায্য জন্য পাঠানো হইল। এলফিনিষ্টন সাহেব চরমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন, বাজিরাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতেছেন—রাজ্যকে কি ঘোর সঙ্কটে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। তাহাতে যখন কোন ফল হইল না, তখন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল, "ত্রিম্বকজীকে দেশান্তরিত করিতে হইবে; যদি না কর তাহা হইলে ইংরাজদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে। এই বেলা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দাও এবং এই করারের বন্ধকস্বরূপ দুর্গত্রয় আমাদের হস্তে রাখিয়া দাও নইলে পুণা এখনি সৈন্যবেষ্টিত হইবে।" পরে পেশওয়াকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো কঠোর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। অবশেষে গবর্ণর জেনারেলের আদেশে ক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল।

পুণার সন্ধি ১৮১৭

বাজিরাও ইংরেজদের সঙ্গে বলে পারিয়া উঠিবেন না তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; তাই প্রকাশ্যে কোন শত্রুতাচরণ করিতে পারেন না, গোপনে সৈন্য সংগ্রহে নিবস্ত হইলেন না। বাজিরাও যে মতলবে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া এলফিনিষ্টন তাড়াতাড়ি বোম্বাই হইতে একদল ইউরোপীয় ফৌজ আনাইয়া পুণার ক্রোশ দুই দূরে খিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারম্ভ।

খিড়কী যুদ্ধ ৫ই নবেম্বর ১৮১৭

ইংরাজদের সৈন্যবল সবশুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তন্মধ্যে ৮০০ য়ুরোপীয় সেনা। মারাঠিদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০, পুণা হইতে খিড়কীর পথ পর্য্যন্ত সেনায় সেনায় আচ্ছাদিত। বাপু গোখলে মারাঠী সেনাপতি। গোখলে একদল সিপাহীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছা বাছা অশ্বচালনা করিলেন—সওয়ারেরা মহারোখে হল্লা করিয়া চলিল—সেই সঙ্গে নয়মুখী কামান-ব্যাটারি হইতে গুলিগোলা বর্ষিত হইল। এই অশ্বচাল চালনে আশানুরূপ ফললাভ হইল না, বরং উল্টোৎপত্তি হইল। দুই সৈন্যের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মতন ছিল, কতকজন সোয়ার প্রথম ঝোঁকে তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল, কতক বা গুলি খাইয়া ধরাশায়ী হইল—অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটিয়া গেল। সওয়ারদের পরাভবে মারাঠী সেনারা এমন দমিয়া গেল যে আর কেহই এগোইতে সাহস করিল না। সন্ধ্যার মধ্যে এই বিপুল সৈন্য সশরীরে অন্তর্দ্ধান। ইংরাজেরা রিপুশূন্য সমরক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্য ক্ষতি, মারাঠীদের ৫০০ লোক মারা পড়ে। পেশওয়া সেনামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পার্ব্বতী-মন্দির হইতে খিড়কীর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সূর্য্যোদয়ে তাঁহার সৈন্যদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশপূর্ণ—সূর্য্যাস্তের মধ্যে সে সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

He counted them at break of day,
And when the sun set where were they ?

প্রভাতে গণিয়া সেনা হরষে বিহ্বল,
ভানু যবে অস্তাচলে কোথায় সে বল ?

বাজিরাও-এর গ্রহ মন্দ। ইংরাজদের প্রসাদে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন—ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। ১৫ই নবেম্বর ব্রিটিষ সৈন্যের পুণা অধিকার,

তখন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদের করতলন্যস্ত হইল। নববর্ষারম্ভে পুণার অনতিদূর কোরেগামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজপ্রতাপের দ্বিতীয়বার পরিচয় পাইয়া বাজীরাও সেই যে স্বদেশ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন, আর ফিরিলেন না। দেশ দেশান্তরে তাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি স্যর জন মালকমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং অতঃপর উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত বিঠুরে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রধার দুরাচার নানা সাহেব এই বাজিরাও-য়ের পোষ্যপুত্র। শতবর্ষায়ত পেশওয়া বংশ তাঁহাতেই বিলীন হইল। পুণা ও পুণার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল।

আহমদনগর

আহমদনগর দক্ষিণ প্রদেশের একটি নামাঙ্কিত নগর। মোগল যুগে ইহার পত্তন হয়। বিপ্লবের মধ্যেই ইহার জন্ম ও বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া কিরূপে ইহা ব্রিটিষ রাজ্যের অধীন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনো মোগল যুপ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে আল্লাউদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। ইহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর আহমদনগর গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান রাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু-রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহার বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগলরাজ্য ভুক্ত হয়।

সুলতান বহ্রান নিজাম সার মৃত্যুর পর আহমদনগর দুই দলে বিভক্ত হয়; সুবিখ্যাত চাঁদবিবি তন্মধ্যে একদলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেককাল খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নন। সম্রাটের আদেশক্রমে মোরাদ আহমদনগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন।

চাঁদবিবি

আহ্মদনগর আক্রমণকালে সুলতানা চাঁদবিবি যে অসাধারণ বীরত্ব ও দেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নাম ও-অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার আত্মীয় বিজাপুর সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু সুলতান সময় মত আসিতে পারিলেন না। চাঁদবিবি একলাই তাঁর বিচ্ছিন্ন সৈন্যবল একত্রিত করিয়া মোগলবলের বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে যুবরাজ মোরাদ সৈন্যসামন্তে নগর বেষ্টন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত, কিন্তু রাণী কিছুতেই বিচলিত হইবার নন। প্রত্যহ অশেষ সঙ্কটের মধ্যে কেল্লা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বলাধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন। মোগলখনিত দুইটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৃতীয় আর একটা সুড়ঙ্গ ছিল তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালাইবার পূর্ব্বেই শত্রুগণ তাহা উড়াইয়া দেওয়াতে সেই সঙ্গে অনেক দুর্গপাল বিনষ্ট হইল, প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখা গেল, লোকেরা প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত—চাঁদবিবি কবচ ধারণপূর্ব্বক মুখের উপর একটা ঘোমটা ফেলিয়া খোলা তরবারে সেই স্থানে গিয়া উৎসাহ বাক্যে সকলকে ডাকিয়া আনেন—তাঁহার দৃষ্টান্তে ভীরুও সাহস পাইল, গুলি গোলা তীর যাহা কিছু ছিল শত্রুদের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য পিছু হটিয়া গিয়া সেদিনকার মত নিরস্ত হইল। চাঁদবিবি সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছেন। পর দিন প্রাতে মোগলেরা দেখিতে পাইল প্রাচীরের ছিদ্র অনেকটা বুজিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ, নূতন সুড়ঙ্গ না করিলে আর প্রবেশের পথ নাই। যুবরাজ ভাবিলেন গতিক বড় ভাল নয়, প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যদি বহ্রাড় (Berar) প্রান্ত দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদবিবি বিজাপুরের সাহায্যলাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। যুবরাজ ও অল্পস্বল্প ফললাভে সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। সুলতানা সেবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন কিন্তু সে অল্পকালের জন্য। তাহার দুই বৎসর পরে মোগলেরা ফিরিয়া আসিয়া আবার নগরের উপর হল্লা করিল। এবার রাজ্ঞী আর শত্রুহস্ত এড়াইতে পারিলেন না। তিনি দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু তাহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ; চাঁদবিবি দেখিলেন এবার আর রক্ষা নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী

হইয়া উঠিল। সেই গোলযোগে একজন বিদ্রোহী সৈনিকের হস্তে রাণী প্রাণ হারাইলেন; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইল।

চাঁদবিবি ভারতবীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী—তাঁহার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি সুলতানার নামে যে একটি স্তুতিগীত রচনা করেন তাহা এই স্থলে ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সুরকাননে অপ্সরা—আছে নানা,
নরভবনে রূপবতী—কত আছে।
বিজাপুরের রাণী চাঁদ সুলতানা,
রূপে সবাই হার মানে—তাঁর কাছে॥
সদা সাহস ধ্রুব তাঁর—ঘোর রণে,
গৃহে শান্তি দয়া যেন—শোভমানা।
আহা, করুণা কত তাঁর—দীনজনে,
বিজাপুরের রাণী চাঁদ সুলতানা॥
যথা ফুলের মাঝে চাঁপা—সেরা মানি,
তরু মাঝারে সহকার—সবে জিতে।
তথা রাণীর মাঝে রাণী—চাঁদ রাণী,
কেবা পারে গো তাঁর গুণ বাখানিতে॥
যিনি জননী সম স্নেহে—স্বভবনে,
মোরে বিদেশে পালিলেন—সযতনে।
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম—স্মরি সে কথা,
তাঁর চরণে সঁপিলাম—স্মরণ গাথা॥

আহমদনগর মোগল রাজ্যভুক্ত হইল কিন্তু তাহা দিল্লীশ্বরের হস্তে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। দিল্লীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। মোগল হইতে মারাঠী অধিকার, পরে যখন পেশওয়াকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরাজেরা পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন, তখন আহমদনগরও ইংরাজরাজ্যে আসিয়া মিলিত হইল।

সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুসমাজের সারভূত দুই প্রধান অঙ্গ। হিন্দুসমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ ও হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জা হচ্ছে পৌত্তলিকতা। সমাজ-সংস্কর্ত্তাগণ কাল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে কেহ জাতিভেদ প্রথা, কেহ বা পৌত্তলিকতা এই দুই ভিত্তির উপর সাধ্যানুসারে অস্ত্রাঘাত করে আসছেন। সমাজ-সংস্কারের প্রতি যাঁদের একান্ত লক্ষ্য তাঁহারা জাতিভেদ উন্মূলন করতে ব্যগ্র। ধর্ম্মসংস্কার যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁরা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্। ভারত ইতিহাসে সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের পূর্ব্বাপর একান্ত চেষ্টা দেখা যায় কিন্তু ধর্ম্মবীরেরা অনেক সময় পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর দুর্গ আটে ঘাটে এমনি দৃঢ়বদ্ধ, জাতিভেদের শৃঙ্খল এমনি কঠোর যে তা ভেদ করা কঠিন ব্যাপার। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বাধা দেবার ক্ষমতা প্রচুর, উন্নতির পথে এগোবার শক্তি নেই। এই সমাজে যা কিছু পরিবর্ত্তন, যা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় তার বারো আনা বাইরের সংস্রবে, সমাজের নিজস্ব নৈসর্গিক বলে তা সাধিত হচ্চে বোধ হয় না; সে সবই প্রায় ইংরাজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে। সে যাই হোক্, বিপক্ষ দল যতই বল প্রয়োগ করুক না কেন, হিন্দুসমাজ তার তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ও অগণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে অটলভাবে রাজত্ব করছেন; ওদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর প্রভূত প্রতাপ প্রতিরোধ করতে পারে এমন বল সমাজে আছে কি না সন্দেহ। রাবণ বধের জন্যে রামের মত বীর চাই—তা কোথায়?

সমাজ-সংস্কার

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের নিশ্চেষ্টভাব দেখে কষ্ট বোধ হয়। যে পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হওয়া উচিত তার তৃপ্তিজনক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বোম্বায়ের লোকেরা অনেকে আমাদেরই মত বিবাহাদি গৃহ-অনুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয় করে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়েন, ব্যয় সঙ্কোচের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। কিন্তু বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করা ত সামান্য ব্যাপার, আসল যে দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত সে হচ্ছে বাল্য-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ।

বাল্য-বিবাহ

বাল্য-বিবাহ—এ এক বিষম রীতি। শুধু বোম্বায়ে কেন, বাল্য-বিবাহের বিষম ফল ভারতের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা

মাতা গৃহ থেকে বিদায় করে যে কি স্বর্গসুখ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই না। পুত্রের বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখা যায়। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা, তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করে দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছেড়ে সর্ব্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। বোম্বায়ে বালক বালিকার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভাল বাসতেন তাঁর সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করে খুব ধূমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন--এই সব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। ওদেশে দশ বার বৎসরের বালক সাত আট বৎসরের বালিকা—এইরূপ দম্পতিকে অনেকসময় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে দেখা যায়। মেয়ে পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স বাড়িয়ে না দিলে সমাজের কল্যাণ নেই। পূর্ণ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াতে স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট, সন্ততির পক্ষেও অনর্থকর। এইরূপ বাল্য-বিবাহ হইতে হিন্দু সমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। বিপন্না বালপ্রসূতি, নির্ব্বীর্য্য সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু—জাতীয় অবনতির এই সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের চৈতন্য হয় না—আশ্চর্য্য! অকালপক্ব ফল যেমন সুস্বাদু হয় না, অকালপ্রসূত সন্তানও সেইরূপ নির্ব্বীর্য্য রুগ্ন ক্ষিন্ন হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়।

কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয় এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ত একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন্ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? পাঠকের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন, বিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হবার পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও য়ুরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন--ডাক্তার নর্ম্মান্, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ দেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীরপ্রকৃতি এই সকল বিষয় বিচার করে তাঁরা বলেছেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে, মেয়ের ১৬ কিম্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত নেওয়া যায় তার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এ দেশে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৪ বৎসর নির্দ্দেশ করেন। অন্যেরা ১৪ বৎসরেরও অধিক। এই সকল পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্ত্রীধর্ম্ম প্রাপ্ত হলেই সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়

তা নয়। আরো দুতিন বৎসর অতীত হলে তবে তাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ থেকে প্রমাণ হচ্চে যে আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

যেখানে স্ত্রীর যৌবনাবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করা রীতি আছে (যেমন মারাঠা দেশের কোন কোন স্থানে দেখেছি,) সেখানে অবশ্য বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা খণ্ডন হয় কিন্তু আমাদের দেশে বালক বালিকার বিবাহের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মত একত্র সহবাসের যে নিয়ম আছে তার চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিত নিয়ম আর কী হতে পারে?

প্রথিতনামা ডাক্তার চুনীলাল বসু তাঁহার নব প্রকাশিত 'শারীর স্বাস্থ্য বিধান' বিষয়ক পুস্তিকায় বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার ব্যক্তব্য এই:—

"আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই তত্ত্বটুকু বিশিষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে আমাদের দেশে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণশক্তি, চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? পিতামাতার দেহ পূর্ণতা লাভ করিবার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়সেবাজনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ২৫ বৎসরের ন্যূনে পুরুষের দেহ পূর্ণতা লাভ করে না; ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণদেহ হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। তদুপরি সাংসারিক অসচ্ছলতা হেতু শারীরিক এই অপূর্ণতা আরো অধিক পরিমাণে আমাদিগের যুবকবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বালিকাগণের যে বয়সে বিবাহ হয় এবং যে বয়সে তাহারা জননী-পদগৌরব লাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই সকল দুগ্ধপোষ্য বালিকাদিগের গর্ভ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যে কখন জীবনে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিবে এরূপ আশা করা বাতুলের কার্য্য মাত্র। আমাদের দেশে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা যত অধিক, পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মত এই যে, অপরিণত পিতামাতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এই সকল শিশুদিগের জীবনীশক্তি এত অল্প এবং সামান্য কারণেই উহারা রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও কোনরূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রম না করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"আমাদের বালিকাগণ অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে অথবা তজ্জনিত ব্যাধি হইতে আজন্ম কষ্ট পাইতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এ দেশীয় চিকিৎসকদিগের অগোচর নাই। অথচ আমরা এমনি অল্পবুদ্ধি যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগেব কন্যা ও ভগিনীগণকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।

"অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালকদিগের বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত। সাধারণতঃ ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতেও এই বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিত। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে বালকের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যতীত আরো অনেক সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বিবাহ হইলে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে পুত্র কন্যা জন্মিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে হয়, অর্থের প্রয়োজন হেতু জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে স্বপ্নে পরিণত হয় এবং অবস্থাবৈগুণ্যে সামান্য উপজীবিকার জন্য পরেব দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মসম্মান ও মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলীকে চিরবিদায় প্রদান করিতে হয়। সুশ্রুতের মতে পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষেব এবং ষোল বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রথা আমাদের সমাজে পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের জাতি যে অর্থসামর্থ্য ও পূর্ব্বগৌরব লাভেব অধিকারী হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

বালক বালিকার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ সঙ্ঘটন যদি প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তবে এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পিতামাতার এত আগ্রহ কেন? অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকন্যার উপর এইরূপ অধিকার খাটিয়ে তাঁরা ভাল কাজ—মা বাপের উপযুক্ত কাজ করেন কি? যে বয়সে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা পরিস্ফুটিত হয় না—নিজের মতামত দেবার ক্ষমতা জন্মে না, সে বয়সে চিরজীবনের মত তাদের উদ্বাহশৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে কি তাঁরা সুবিবেচনার কার্য্য করেন? আমি একথা বলছি না যে, পুত্র কন্যার বিয়েতে পিতামাতার অধিকার নেই—হস্তক্ষেপ করবার আবশ্যক নেই। আমি বলি নিদেন এইটুকু বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, যে বয়সে মেয়ে পুরুষ আপনারা জেনে শুনে বিবাহ করতে পারে, বিবাহে আপনার ইচ্ছানিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। যে বয়সে তারা বিবাহের মর্ম্ম বুঝতে ও নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে অসমর্থ, সে বয়সে তাদের বিবাহ ঘটিয়ে দেওয়া অন্যায়। কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাক্ না কেন তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব—ঘটী বাটীর মত

ব্যবহারের জিনিষ নয়। তার স্বাধীনতাটুকু যতদূর বজায় রাখা যেতে পারে তা করা কর্ত্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে না অথবা যার প্রভাবে তা সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে না।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ত্ব বলতে চাই, তার প্রতি সমাজপতিদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম এই যে, স্ত্রী পুরুষের যোগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করা; দ্বিতীয়, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণের সামর্থ্য বুঝে দারপরিগ্রহ করা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের বিবাহপ্রণালী এই দুই মূলসূত্রের উপরেই কুঠারাঘাত করে।

এই যে বিষম কীট, যা আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্রমিকই অবসাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এর উচ্ছেদের একটা উপায় না করলে আমাদের আর নিস্তার নেই। ব্যাধি যে সাঙ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আশু চিকিৎসার প্রয়োজন, সময় প্রতীক্ষা করে থাকলে চলবে না। গৃহকর্ত্তারা এ বিষয়ে মনোযোগ করুন, বিশেষতঃ আমাদের ছাত্রবৃন্দ সচেষ্ট হোন, তাঁদের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা,—তাঁরা দল বেঁধে দাঁড়ালে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির আর কালবিলম্ব হবে না।

বিধবা-বিবাহ

বিধবা-বিবাহের ন্যায়ান্যায় আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। আমার মতে সামাজিক অনুশাসনে বিধবা-বিবাহ বন্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়; অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত। পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের বেলায় কি করেন? বহুদারগ্রস্ত বিলাসীর মুখে সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যেরূপ বিসঙ্গত, তাঁদের উপদেশও কতকটা সেইরূপ। উপদেষ্টাগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যতই সমর্থন করুন না কেন, তাঁরা যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নববধূর পরিণয়ে একটুও ইতস্ততঃ করেন না, তখন তাঁদের কথার মূল্য কি? স্ত্রী পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে কি বিধাতানির্দ্দিষ্ট এতই প্রভেদ? বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে ব্রহ্মচারিণী আদর্শ-সতী অনেকে আছেন স্বীকার করি, তাই বলে বিধবার উপর জোর জবরদস্তী করে ব্রহ্মচর্য্য চাপানো—এটা কি ঠিক? প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণে কি সুফল প্রত্যাশা করা যায়? এ থেকে আমাদের সমাজে যে ভ্রূণহত্যাদি কুফল ফলছে, হে ভণ্ডতপস্বি, তা কি তুমি দেখেও দেখবে না? একবার ভেবে দেখ, বালবিধবার চিরবৈধব্য কি মমতাহীন নিষ্ঠুর বিধান!

বোম্বায়ে সাধারণ হিন্দুসমাজ যে বিধবা-বিবাহের বিরোধী তা নয়। এমন অনেক

জাতি আছে যাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যের অনুকরণশীল জাতিবর্গেই এই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুপ্রথা আবহমান কাল চলে আসছে—সে কি না বিধবার মস্তক-মুণ্ডন। বঙ্গ বিধবাদের অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়,—এক সন্ধ্যা আহার, নির্জলা উপবাস, অলঙ্কার বর্জ্জন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার উপর শিরোমুণ্ডন প্রথা নেই। বোম্বায়ে বিধবা রমণীদের এসব ত আছেই, তার উপর বেশীর ভাগ ঐ এক উৎপীড়ন। ভবিষ্যতে বিধবা স্ত্রীদের অদৃষ্টে যে সকল জ্বালা যন্ত্রণা আছে, পতিবিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তার পূর্ব্বাভাস। যাতে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কার্য্য করা না হয়, তাঁদের সম্মতিপ্রকাশের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, সমাজ-সংস্কারকদের তাহা বিবেচ্য। আমি জানি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রয়োগ করবার উদ্যোগে ছিলেন, কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছিলেন বলতে পারি না।

দেবদাসী

এই প্রসঙ্গে অপ্রৌঢ়া বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে 'নায়িকা' নামে একদল বারাঙ্গনা আছে (অন্য নাম দেবদাসী), তারা দেবমন্দিরে নর্ত্তকী-রূপে নিযুক্ত। তাদের বিবাহ হয় না, বেশ্যাবৃত্তিই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই কার্য্যে দীক্ষিত হবার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে—তাকে বলে 'সেজ।' সে অনুষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র। বরের ঠিকানায় একটা খড়্গ রাখা হয়, তার উপর ফুলের মালা সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে এবং বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্য্যে ও আনুষঙ্গিক অকার্য্যে তার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। বোম্বাই মফস্বল কোর্টে এইরূপ অত্যাচার-সম্পর্কীয় মকদ্দমা কখন কখন উপস্থিত হয়, আমি কারওয়াবে থাকতে এইরূপ মকদ্দমা আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। অসামীর বক্তব্য এই—"এ আমাদের চিরন্তর প্রথা, মেয়েকে আমাদের কুলধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে দোষ কি?" কিন্তু দেশাচার যাই হোক্, যারা কিশোর বয়স্ক বালিকাদের মতিভ্রষ্ট ও আজীবন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে তাদের বিধিমতে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তার আর কোন সন্দেহ নেই। এই অত্যাচার নিবারণ উদ্দেশে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উঠেছে তা আমার মতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হোক্ কিম্বা প্রচলিত আইনের পরিবর্ত্তনই হোক্, যে কোন উপায়ে সুকুমারমতি বালিকাদের প্রতি

এই অত্যাচারের প্রতিকার হয় তাহাই প্রার্থনীয়। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক রটনা করছেন তা কি বোঝেন না?

আমি দেখতে পাই দক্ষিণে জাতিভেদের নিয়ম নিরতিশয় কঠোর, আমাদের জাতীয় একতাবন্ধনের পথে বিষম কণ্টক! এক এক জাতির ভিতরে যে কতগুলি শাখা তার অন্ত নেই। এক ব্রাহ্মণবর্ণ দেখ, স্থান ভেদে তার মধ্যে কত শাখা ভেদ, এমন কি নদীর এপার ওপার হলে পরস্পর আদান প্রদান বন্ধ। মারাঠী ব্রাহ্মণের প্রধান তিন শাখা—দেশস্থ, কোকনস্থ ও কহ্রাড়। জাত একই, কেবল মূল নিবাস আলাদা। তাদের পরস্পর পান ভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, আমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্র যেমন। পেশওয়াদের আমলে একবার এই দলাদলি ভাঙবার চেষ্টা হয়েছিল, কেননা দেখা যায় যে বালাজী বাজিরাও পেশওয়া যদিও কোকনস্থ ব্রাহ্মণ, তবুও দেশস্থ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এই তিন শাখার একত্রীকরণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা যায় না, কেননা এই আন্তর্জাতিক বিবাহ যে প্রচলিত দেশাচাব বিরুদ্ধ, তা অস্বীকার করা যায় না। সমাজ-সংস্কার সভা সমিতিতে এই শাখাত্রয়ের ঐক্যবন্ধন একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বোম্বাই অঞ্চলে সেনই বা সারস্বত নামে এক জাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন। সুবিখ্যাত জষ্টিস্ তেলঙ্গ এই জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইক্ষণকার হাইকোর্ট জজ চন্দবারকরও সারস্বত ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের জাতিতে আমিষ ভক্ষণ, বিশেষতঃ মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। উচ্চকুলাভিমানী ব্রাহ্মণেরা সেনইকে আমিষাশী আচারভ্রষ্ট বলে অবজ্ঞা করেন, তাদের চোখে সেনই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়। আমাব একটি সেনই বন্ধু কোন মফস্বল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে একবার কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন, "এ অঞ্চলে আমার স্বজাতীয় কেহই নাই, এক প্রকার নির্ব্বাসন যন্ত্রণা ভোগ করছি। কথনো কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী নেমন্তন্নে যেতে হয়, গিয়ে দেখি তাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মহিলারা আমার স্ত্রীকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন, তাকে যেন ছোঁয়াতেও দোষ। ভোজনে আমাকে সমান পংক্তিতে বসতে দেন না, আমার স্বতন্ত্র আসন. স্বতন্ত্র বাসন হতে পরিবেশন। নেমন্তন্নে গিয়ে এরূপ অপমান সহ্য হয় না। তাই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বামন বাড়ীতে আর নেমন্তন্ন খাওয়া নয়।" এই উদাহরণ হতে ও-দেশের জাতিভেদের কঠোরতা উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু বোম্বায়ে জাতিবন্ধন যতই কঠিন হোক্ না কেন, কালের স্রোতে তার বাঁধন

অনেক শিথিল হয়ে আসছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে ঘটনার স্রোত বলবত্তর, তাই দেখা যায় তার ভাঙ্গন-দশা আরম্ভ হয়েছে। শৌচাশৌচ বিচার, ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর প্রীতিভোজন ইত্যাদি অনেক বিচারে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কুসংস্কারবর্জিত স্বীকার করতেই হবে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আচারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি বাহিরের ঘটনাও এই পরিবর্ত্তনের অনুকূল। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস তাঁর চিরন্তন মন্তব্যগুলি বৎসরান্তে একবার আবৃত্তি করে আমাদের পোলিটিকাল উন্নতি কতদূর সাধন করেছেন বলতে পারি না কিন্তু সেই একক্ষেত্রে নানাজাতির একসূত্রে মেলামেশার অবশ্য একটা উপকারিতা আছে। তার ফলে হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্, অন্ত্যজ জাতি-সমস্যার প্রতি আমাদের কৃতবিদ্য যুবকদের মন পড়েছে, এ একটা শুভলক্ষণ বল্‌তে হবে। আমরা আমাদের রাজপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্যে চীৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে তুলছি কিন্তু আমাদের ভাইদের মধ্যে যে অসংখ্য লোক হিন্দুসমাজের পদদলিত ঘৃণিত ত্যাজ্য পুত্র হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি না, একি সামান্য লাঞ্ছনার বিষয়? এই হীন জাতির উদ্ধারের জন্যে আর্য্যসমাজের উদ্যমশীলতা দেখে আশ্বাস হচ্ছে যে এখনো আমাদের প্রাণ আছে; এই সাধু দৃষ্টান্তে যদি সমগ্র হিন্দুসমাজ জাগরিত হয়ে এই সকল দীনহীন পতিত সন্তানদের স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তুত হন, তবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা বলতে হবে আমাদের সমাজ আত্মশ্লাঘার করে আত্মঘাতী হতে চলেছেন, তাঁর অধঃপাতের আর বিলম্ব নেই। আমি যে জাতির হয়ে ওকালতি করছি তাদের স্থান হিন্দুসমাজের অধঃস্তরে—এর উপরের স্তরও নানাকারণে বিলোড়িত হচ্ছে দেখা যায়। শূদ্রেরা আপনাদের মধ্যে উচ্চতর আসন অধিকার করতে ব্যগ্র, কায়স্থকুল ক্ষত্রিয়বংশীয় বলে আপনাদের পরিচয় দিয়ে উপবীত ধারণে তৎপর, কেহই হীনতা-পঙ্কে পড়ে থাকতে রাজী নয়।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আমাদের সমাজে যে কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তা আমরা অনেকে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ তাঁরা একবার আপনাদের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে দেখুন, সেকাল আর একালের প্রভেদ বুঝতে পারবেন। আমার একটা সহজ দৃষ্টান্ত মনে হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি, এককালে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। তাঁরা বহুপত্নী নিয়ে কেমন দিব্য আরামে ঘর করতেন, পালায় পালায় এক এক পত্নীগৃহে গিয়ে কি সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করতেন। কুলীন মেয়েদের কি দুর্ভাগ্য! কারো কারো যোগ্য পাত্রের অভাবে চিরজীবন হয়ত আইবড় অবস্থায়

কাটাতে হ'ত, অনেকের পতি জীবিত থাকতেও কি দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত, জীবনে একটিবারও তাদের ভাগ্যে স্বামীর মুখদর্শন ঘটত না—যেখানে সেখানে এইরূপ কুলীনকুল-কলঙ্ককাহিনী শোনা যেত। আমার বেশ মনে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয় নিয়ে কত আন্দোলন করতেন, পারিবারিক শান্তিহর এই অনর্থকর প্রথা উচ্ছেদের কত উপায় চিন্তা করতেন, বলতেন যে বহুবিবাহ নিবারণী রাজবিধি প্রচলন ভিন্ন এ রোগের ঔষধ নেই। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে বিনা আইনে বহুদারব্যবসায়ী কুলীনদের অন্ন মারা গিয়েছে—বহুবিবাহ প্রথা আপনার ভারে আপনি চাপা প'ড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে।

যেমন বাঙ্গলা দেশে বোম্বায়ে তেমনি জাতিবিপ্লবের লক্ষণ অল্প-বিস্তর দেখা যাচ্ছে। উপরে আর্য্যসঙ্ঘের কথা বলেছি, জাত ভাঙ্গবার চেষ্টাই তাঁদের এক ব্রত। কিছুদিন হ'ল তাঁরা যে সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে প্রায় ৭৮০ লোক উপস্থিত হয়েছিল এবং প্রায় ১৫০ ব্যক্তি জাতের বাধা না মেনে একত্রে পরস্পর প্রীতিভোজনে যোগ দিয়েছিলেন। আর একটা দৃষ্টান্ত বলি—সমুদ্রযাত্রা। বিলাতযাত্রা আগেকার কালে কি ভয়ানক ব্যাপারই ছিল, আর এখন অপেক্ষাকৃত কত সহজ হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাব সুবিখ্যাত গুজরাটী 'রিফরমার' করসনদাস মূলজীর জীবনবৃত্ত থেকে আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনে বিলাতযাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে স্রোত কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না। সমাজের শাসনও অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছে। শিক্ষা, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রীয় অনুরোধে এই যে কত কত হিন্দুসন্তান বিলাত বেড়িয়ে দেশে ফিরে আসছেন তাঁদের জাতে ওঠবার বিহিত ব্যবস্থা করা হয় এ একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। রীত রক্ষার জন্যে কোন রকম সহজ প্রায়শ্চিত্ত নিলেই তাঁরা জাতে উঠতে পারেন, এখন কেবল প্রায়শ্চিত্ত বিধানটা একেবারে উঠে গেলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কেননা ভেবে দেখলে এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াটাই হীনতা স্বীকার। পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত—তার একটা অর্থ আছে; কিন্তু বিনা দোষে লোক দেখান প্রায়শ্চিত্ত, য়ুরোপ প্রবাসের পাপকলঙ্ক ধুয়ে ফেলবার জন্যে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা—এতে কি আপনার কাছে আপনাকে খাট করা হয় না? এই কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের কার্য্য?

এই বিদেশ ভ্রমণে ব্যক্তিগত যা কিছু উপকার হচ্ছে, এর ফলভোগী যে সমাজ, কে না স্বীকার করবে এবং এর সুদূর পরিণাম কি দাঁড়াবে কে বলতে পারে?

বিদেশে ভ্রমণে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, আমরা য়ুরোপীয় সমাজ থেকে নূতন রীতিনীতির সংস্পর্শ লাভ করি, নূতন সমাজতন্ত্র —সাম্য স্বাধীনতা একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আসি। অল্প লোকের মনোগত ভাব-তরঙ্গ ক্রমে দূরে দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে।

এই পূর্ব্বপশ্চিমের যোগে নবীন প্রাচীনের সংঘর্ষে আমাদের সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। এই সংঘর্ষের ফলে সকলি যে ভাল, সকলি উন্নতি হচ্ছে তা বলা যায় না; ভালর সঙ্গে মন্দও প্রসূত হচ্ছে মানতেই হবে। আমাদের জীবন কতকটা দ্বিধাভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—ঘরে এক বাহিরে এক ;—নকলের যে সমস্ত কুফল, কতকটা কৃত্রিমতা এসে পড়ছে—আমাদের মধ্যে য়ুরোপ সমাজের বিলাসিতা কতকটা প্রবেশ করছে। সে যাই হোক্, মোটের উপর বলা যেতে পারে এই ভাল মন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ থেকে জাতিভেদের দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন; একালে আমরা নূতন শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে সেই প্রাচীর ভাঙবার পন্থা অন্বেষণ করছি--দেখছি ভাঙ্গা কি অসামান্য কঠিন ব্যাপার!

ধর্ম্ম-সংস্কার

শিক্ষিত মণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট; সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান কিন্তু কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে সে বিষয় লইয়াই মতভেদ। কাহারো মত এই যে জোর জবরদস্তি করিয়া জাতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেল—সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকেরা বলেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা আগে লোকের মনকে প্রস্তুত কর, সমাজ-সংস্কার আসিতে কালবিলম্ব হইবে না—মূলে কুঠারাঘাত কর ক্ষমা আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। অন্য কথায়, তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম-সংস্কারের সোপান দিয়া সমাজ-সংস্কারে আরোহণ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সমাজ-সংস্কারের বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তাহা ত বলা হইয়াছে, এখন ধর্ম্ম-সংস্কার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কার-বার্ত্তা বলিতে গেলে ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষদিগের জীবন-চর্চ্চা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র ধর্ম্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় যে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া একালের আর আর ধর্ম্মবীরের চরিত-চিত্র অল্পাধিক মাত্রায় দেওয়া যাইবে, সেই সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণীও যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

শঙ্করাচার্য্য

মারাঠা দেশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু বলিয়া পূজিত। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রগণ্য। তাঁহার জীবনবৃত্ত যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সন্তোষজনক বলা যায় না। আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে শঙ্করের জীবনী এত প্রকার অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত যে সত্য মিথ্যা পৃথক করা সহজ নহে। শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণবৃত্তান্ত তাহার নমুনাস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ সংকল্প মনে মনে পোষণ করেন। কিন্তু জননীকে তাঁহার অভিলাষ জানাইলে জননী একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, কিছুতেই তাঁহার অনুমতি পান না, অথচ মাতৃ আজ্ঞা না পাইলেও নয়। কথিত আছে, একদা তিনি তাঁহার গৃহসমীপবর্ত্তী নদীতে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময় এক কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে জননীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "কুমীর আমার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মা আমাকে শীঘ্র রক্ষা করুন।" জননী কি উপায়ে সন্তানকে বাঁচাইতে পারিবেন ভাবিয়া পান না। তখন শঙ্কর বলিলেন, "আমার জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। যদি আমি সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই কুম্ভীর এখনি আমার পা ছাড়িয়া দিবে। আপনার অনুমতি পাইলেই আমার জীবন রক্ষা হয়।" মাতা অগত্যা পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। কুম্ভীরও আপন গ্রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইরূপ বিচিত্র দৈব ঘটনাযোগে তাঁহার জীবনকথা অনুরঞ্জিত। ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা শঙ্করচরিত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। কেরল-প্রান্তে (মালাবার) ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম। অনতিকাল মধ্যে তিনি অলোকসামান্য প্রতিভাবলে পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাশী, কাঞ্চী, কর্ণাট, কামরূপ প্রভৃতি নানা দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক সে সময়কার প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন। এই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শঙ্কর দিগ্বিজয় বলিয়া ঘোষিত। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন এবং তত্রত্য প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শারদাপীঠে অধিরূঢ় হয়েন। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত কেহ সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন না। দেবীর গৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটি মণ্ডপ আছে। * "প্রাচ্য পণ্ডিতেরা

* শঙ্করাচার্য্য—শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য (২৪৮ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকের মণ্ডপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ পশ্চিমদ্বার এবং উদীচ্য পণ্ডিতগণ উত্তরদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক পশ্চিম ও উত্তরদিগ্বর্ত্তী মণ্ডপে বিরাজমান। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি দেবীর দক্ষিণদ্বার উন্মোচন করিতে পারেন। সুতরাং দেবীর দক্ষিণদিকের দ্বার চিরকাল রুদ্ধ আছে।" শঙ্কর সেই দ্বার খুলিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়া প্রবেশের অনুমতি নাই। শঙ্কর নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত—নৈয়ায়িক সাংখ্যতত্ত্ববিৎ, বৌদ্ধ, জৈন সকলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া সমাদৃত হইলেন। কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ তখন স্বয়ং মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শঙ্করের প্রবেশপথ মুক্ত করিয়া দিলেন। শঙ্কর কাশ্মীর হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হিমালয়স্থিত কেদারনাথে গিয়া নির্বিকল্প সমাধিযোগে ৩২ বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন।

শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদমূলক অদ্বৈতবাদ পোষণ করিয়া বেদান্তদর্শন, উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা শাস্ত্রাদির ভাষ্যরচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তি তর্কের নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যদিও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ তাঁহার প্রকৃত মত ও নির্গুণ উপাসনা প্রচার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি তিনি গৌণভাবে সাকার উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। যে জড়বুদ্ধি লোকেরা নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানের অনধিকারী, তিনি তাহাদের ধারণার উপযোগী সাকারবাদের স্থূলভমার্গ প্রদর্শিত করিয়াছেন। এক দিকে যেমন জ্ঞানিগণ মধ্যে প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ, অন্য দিকে প্রাকৃত সাধকের মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু দেখা যায় যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার প্রতি গুরুভক্তি প্রকাশ করে। তাঁহার নাম "ষণ্মতস্থাপক।"

বেদান্ত শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। মহীশূরস্থ শৃঙ্গিরি (শৃঙ্গগিরি) মঠ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শৃঙ্গগিরি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মঠের যিনি অধিস্বামী তিনি মারাঠীদের 'পোপ';—শৃঙ্গিরি মঠ হইতে তিনি তাঁহার অনুশাসন সমস্ত জারী করেন। শঙ্করাচার্য্যের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পরিগণিত। মারাঠা দেশে শঙ্করাচার্য্যের মানমর্য্যাদার সীমা নাই। যখন অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন আচার্য্যদেব শৃঙ্গিরি হইতে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যান। দক্ষিণে প্রবাসকালে আমি শঙ্করাচার্য্যের প্রভুত্বের দুই একবার পরিচয় পাইয়াছি। আমি যখন পুণায় কর্ম্ম করি, শুনিলাম যে সমাজ-সংস্কার কাজের অগ্রগণ্য কয়েকজন খ্যাতনামা মারাঠী যুবক কোন মিসনরি বন্ধুগৃহে চা পান করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাদের সমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। শেষে সাব্যস্ত

হইল শঙ্করাচার্য্যকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মানা হয়। শঙ্করাচার্য্যের বিধান সংস্কারকদের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তিনি বিচার করিয়া কোন একপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অপরাধীগণ গুরুজীর আদেশানুসারে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে কিরূপ হাস্যাস্পদ হন ও নিজের পক্ষকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেন তাহা এ পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই। বাঙ্গলা দেশে ওরূপ ঘটনা সম্ভবপর নহে, কেননা সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের মাথার উপর ও-রকম কোন পোপের উপদ্রব নাই।

বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী

আঠার শতাব্দীর শেষভাগে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক উন্নতচেতা মহাপুরুষ বোম্বায়ে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি যেমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র সাধুপুরুষ ও আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। এদিকে শিক্ষাবিভাগে তিনি উচ্চপদারূঢ় কর্ম্মচারী, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির সম্মান, অথচ তাঁহার শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহার নম্র স্বভাব ও বিনয় গুণে তিনি সকলেরি চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার চেহারা বেশভূষাতে কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—তাঁহার আন্তরিক মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে ? এ বিষয়ে একটা কৌতূহলজনক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি তাঁহার গুণকীর্ত্তনে মোহিত হইয়া পরিচয় লাভের উদ্দেশে বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ডেস্কে ভর দিয়া কি এক দুরূহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময় সেই ব্যক্তি গিয়া উপস্থিত। লেখকটিই যে বালশাস্ত্রী তাঁহার ভাবসাবে বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কখন্ সাক্ষাৎ হইবে ?" তিনি তখন কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, সময় নষ্টের ভয়ে উত্তর করিলেন, আর কতক ঘণ্টা বিলম্বে আসিলে অমুক সময়ে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগন্তুকের প্রস্থান ও যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ প্রবেশ। বালশাস্ত্রী সেইখানেই বসিয়া—কেবল সামনে গ্রন্থ কাগজ কলম নাই। আগন্তুক ব্যক্তি যখন জানিতে পারিলেন যে এই সামান্য বেশধারী খর্ব্বকায় ব্যক্তিই সেই বালশাস্ত্রী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। বালশাস্ত্রীর যত্নে বোম্বায়ে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। মফস্বলের নানাস্থান হইতে বিদ্যার্থী আহরণ করা—নিজ গৃহের নিকট তাহাদের বাসা ভাড়া করিয়া দেওয়া—তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদান ও সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বাবধান করা, এই সকল বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। এই সকল বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষাদান, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সমাজ-সংস্কর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন না ও সমাজ বিপ্লবকারী সেকালের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গেও যোগ দিতেন না। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অল্পে অল্পে সমাজ-সংস্কার করা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য (২৫০ পৃষ্ঠা)

তিনি বলিতেন ধর্ম্ম ভিত্তির উপর সমাজ-সংস্কার স্থাপন কর, নতুবা স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা নাই। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য। তিনি এত সাবধানে কার্য্য করিয়াও গোড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। জাতিতে কহ্লাড় ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহার কারণ এই যে জাতির অনুরোধে কর্ত্তব্য পালনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত, রেভরেণ্ড নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রীপাদ শেষাদ্রি অকারণে জাতিচ্যুত হন। জাতে উঠিবার আবেদন করিলে একদল গোঁড়া হিন্দু তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন, এই বিবাদে হিন্দুসমাজে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাণপণে পতিতোদ্ধারের সাহায্যে তৎপর হইলেন এবং নিজে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া শ্রীপাদের বহিষ্কার-কলঙ্ক মোচনে কৃতকার্য্য হয়েন। ও-দেশে কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার উপর জয়লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বালশাস্ত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন—তিনি ১৭ই মে ১৮০০ অব্দে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কারের যে ইচ্ছা—সে মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমাজ-সংস্কারের বিস্তর হানি জন্মে—সে ক্ষতি পূরণ করে আজ পর্য্যন্ত এমন অল্প লোকই দেখা গিয়াছে।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ

বালশাস্ত্রীর মৃত্যুর পর শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে আর এক নূতন দল উঠিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙের ভ্রাতা দাদোবা পাণ্ডুরঙ এই দলের দলপতি। বাঙ্গলার যেমন কৃষ্ণবন্দ্য বোম্বায়ে তেমনি দাদোবা পাণ্ডুরঙ। এই দুই ব্যক্তি একই ধরণের লোক। উভয়েই সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, উভয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব বিশারদ। উভয়েরই ধর্ম্মভাব প্রবল—প্রভেদ এই, কৃষ্ণবন্দ্য খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত সমুদায় বন্ধন ছেদন করিলেন। দাদোবার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন—কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক দাদোবার উৎসাহ-তাঁহার বশীকরণ শক্তি, সামাজিক অনীতি অত্যাচারের উপর জ্বলন্ত বিদ্বেষ, এই সকল বিষয়ে তিনি কৃষ্ণবন্দ্যের সমতুল্য ছিলেন ও ইনি যেমন কলিকাতায়, তিনি তেমনি বোম্বায়ে কতিপয় শিক্ষিত যুবকের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দাদোবা পাণ্ডুরঙ বোম্বাই নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই তাঁহার অবসর—সেই স্কুলের বার জন প্রধান ছাত্রকে তাঁহার কাজের উপযোগী হাতিয়ার পাইলেন এবং নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অপরাপর বিদ্যালয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা ও তৎসম্বন্ধীয়

অন্যান্য কুরীতির উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশ্যে এক সভার সৃষ্টি হইল, তাহার সভ্যগণ ফ্রীমেসনদের ন্যায় গোপনে কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই সভার নাম পরমহংস সভা।

পরমহংস সভা

বোম্বাই অঞ্চলে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা সময়ে সময়ে যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার শিরোভাগে পরমহংস সভা ধরা যাইতে পারে। ১৮৪১ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। হংস যেমন জলীয় ভাগ ফেলিয়া দিয়া দুধ বাছিয়া লয়, সেইরূপ সমাজের মন্দের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভালটা বাছিয়া গ্রহণ করা এই সভার উদ্দেশ্য; জন্মিয়াই হিন্দু সমাজের উপর বাণবর্ষণ ইহার প্রথম উদ্যম। বাহিরের লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত বিজনস্থানে অকুতোভয়ে সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন তাহার উপযোগী স্থান চাই—অনেক খুঁজিয়া সভ্যেরা একটা বাড়ী স্থির করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাহাদের দিতে প্রস্তুত কিন্তু একটি ভাড়াটে ব্রাহ্মণ তাহাতে বাস করিতেন তিনি আততায়ীদের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া যাইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর বাসন্দা এক ফন্দী করিলেন। তিনি তালা চাবি দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন তাঁহার দেব দেবীর বিগ্রহ সকল ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত। পরমহংসগণ তাহাতে নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের বল ও সাহসের পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সেই লোকটির অবর্ত্তমানে তালা চাবি ভাঙ্গিয়া প্রতিমাগুলি এক কোণে সরাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর দখল করিয়া লইলেন। এখানে কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই, গিরগামের এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহে শীঘ্র উঠিয়া যান। প্রতি সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার সময় অধিবেশন হইত। ঈশ্বর প্রার্থনার পর কর্ম্মারম্ভ, এই যা ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য সামাজিক। কোন ব্যক্তি সভ্যপদে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, পরে পাউরুটির টুকরা মুখে করিয়া আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইত, তদনন্তর সভার রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মুসলমানের হাতে জলগ্রহণ করিবারও বিধান ছিল।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ রাম বালকৃষ্ণ এইরূপ কতকগুলি লোকের যত্ন ও উৎসাহে ক্রমে সভ্যদল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুণা, আহমদনগর, খানদেশ, বেলগাম প্রভৃতি মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমহংস সভার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইল। সভ্য সংখ্যা কত ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য তথাপি সভার শ্রীবৃদ্ধিকালে অন্যূন পাঁচ শত আন্দাজ বলা যাইতে পারে।

রাম বালকৃষ্ণ (২৫২ পৃষ্ঠা)
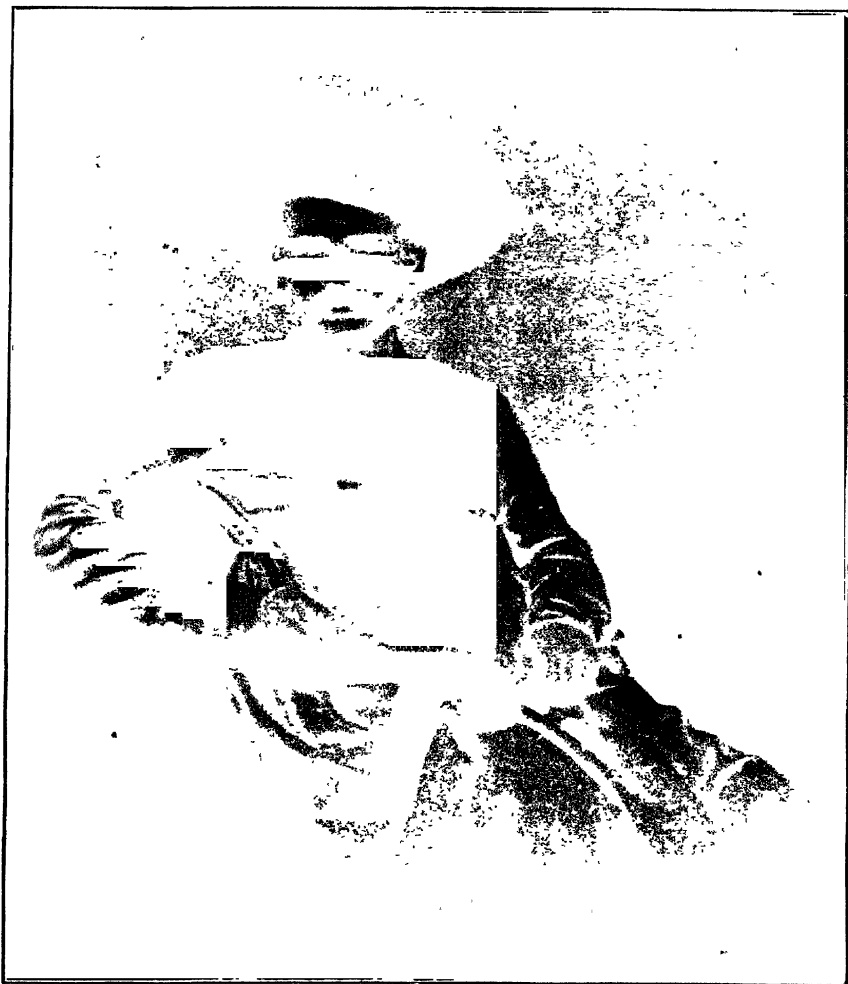
এই সভা প্রায় বিশ বৎসর কাল জীবিত ছিল। যদিও ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে গোপনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তথাপি সময়ে সময়ে সভ্যদের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়াছে। একবার তাঁহাদের মধ্যে জন কতক যুবক কেল্লার এক রুটিওয়ালার দোকানে পাঁউরুটি কিনিয়া সেই রুটি হস্তে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে চলিয়া আসেন। তাঁহাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে দীক্ষা ও তর্ক বিতর্ক ভিন্ন আর বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হইত না। কেবল বার্ষিক প্রীতিভোজন এই সভার এক বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। সেই সময়ে মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে পরমহংসদল সমবেত হইয়া জাতি নির্ব্বিশেষে একত্রে পান ভোজন করিতেন।

কিন্তু এইরূপে অধিক দিন যায় নাই—পরমহংস মণ্ডলীর শীঘ্রই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন সহজ নহে। এক সামান্য ঘটনা হইতে এই বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি (খুব সম্ভব সভ্যদের মধ্যে একজন) সভার খাতাপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে সভার যত গুহ্য কথা—সভ্যদের নাম ধাম, তাহাদের জাতিভঙ্গের প্রতিজ্ঞা যাহা কিছু ভিতরকার কথা সকলি বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। যতদিন পর্য্যন্ত সভার গোপনীয় কথাসকল প্রকাশ হয় নাই, ততদিন হিন্দুসমাজ সন্দেহ করিয়াও তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই। গুপ্তকথা সকল ফাঁস হইয়া সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। হিন্দুসমাজের কাছে তাহারা বমাল ধরা পড়িলেন। তাঁহারা ভয়ে একে একে সরিয়া পড়িলেন—পলাতকের দৃষ্টান্তে যথার্থ বীরের হৃদয়ও দমিয়া গেল। সভা ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইল।*

আর্য্য-সমাজ

প্রার্থনা-সমাজের সহযোগী আর্য্য-সমাজের উল্লেখ না করিলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের জন্মদাতা। ইনি একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ। দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মভূমি কাঠেওয়াড়। দয়ানন্দের পিতা একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন, আপন পুত্রকেও শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু এই অন্নে তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতার অসারতা শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। মূর্ত্তিপূজার প্রতি কিরূপে তাঁহার বিরাগ জন্মিল তাহার বৃত্তান্ত তাঁহার জীবনীতে যাহা আছে তাহা এই:—একদিন শিবরাত্রির জাগরণে তিনি

* ইন্দু প্রকাশ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ১৮৬৫ সালে ২রা মার্চ্চ হইতে কতিপয় সংখ্যায় Political Rishi স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত

মন্দিরে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তাঁহার পিতা ও আর সকলে নিদ্রামগ্ন, একমাত্র তিনি জাগরিত ছিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, ইন্দুরেরা মিলিয়া ঠাকুরের উপর মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে—বাদাম মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহা কিছু ভোগের সামগ্রী ছিল তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ ভোগ চলিতেছে, ঠাকুর না আপনাকে আপনি সামলাইতে পারেন, না অন্যকে ডাকিয়া তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন। তাঁহার সহজে মনে হইল, যিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম তিনি কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর হইতে পারেন? এই ঘটনা হইতে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এক ভগিনীর সহসা অকাল মৃত্যুতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদয় হইল। পিতার ইচ্ছা তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গার্হস্থ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন—তিনি সেই বন্ধনভয়ে গৃহত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করিলেন। অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনের পর তাঁহার সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, ব্রাহ্মণ উপনিষদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্তিসঙ্কুল, কেবল খাঁটি সত্য বেদ—বেদভিত্তির উপরেই হিন্দুধর্ম্মের পত্তন করা বিধেয়। বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই—একেশ্বরবাদই বেদমন্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম—অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সেই একংব্রহ্মের নামভেদ মাত্র। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বমত স্থাপন ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বেড়াইতেন—যেখানে যাইতেন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও বেদের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতেন—তাঁহার বুদ্ধি বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মতে বেদবাক্য অভ্রান্ত সত্য কিন্তু ভাষ্যকারেরা যেরূপ বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। এই হেতু তিনি স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া 'বেদার্থ প্রকাশ' নামে বেদভাষ্য রচনা করিয়া যান, ইহাই আর্য্য-সমাজের ভিত্তিভূমি। তাঁহার মতে পৌত্তলিকতা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সুতরাং তাহা পরিহার্য্য। তাঁহারি যত্নে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বেদসত্যসমর্থনকারী আর্য্য-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বায়েও এই সমাজের এক শাখা আছে কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে আর্য্য-সমাজের যেরূপ প্রতিপত্তি, বোম্বায়ে সেরূপ কিছুই নহে। কি বোম্বাই কি বাঙ্গলা, এই দুই দেশেই, কেন জানি না, আর্য্য-সমাজ হতাদর হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষ কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—মূল আর্য্যাবর্ত্তই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

প্রার্থনা-সমাজ

পরমহংসমণ্ডলী ধ্বংস হইবার পর তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ 'প্রার্থনা-সমাজ' নাম ধারণ করিয়া উত্থিত হইল। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ ও তাঁহার

নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর (২৫৫ পৃষ্ঠা)

স্থায় আর কতকগুলি সজ্জনের প্রযত্নে ১৮৬৭ সালে এই সমাজ স্থাপিত হয়। জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কু-রীতির উচ্ছেদ-সাধন মানসে সমাজ কার্য্যারম্ভ করেন। পরে সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন সামাজিক বিধানে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ করায় কোন ফল নাই। যেখানে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের আশা নাই সেখানে আক্রমণের অন্যতর কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-সংস্কারের উপর দাঁড়াইয়া সমাজ-সংস্কার সহজসাধ্য, এই বিবেচনায় পৌত্তলিকতা পরিহারপূর্ব্বক একেশ্বরবাদ প্রচার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দুই একবার বোম্বাই আসিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা লোকের মন উত্তেজিত করিয়া যান। ক্ষেত্র প্রস্তুত, উপযুক্ত সময়েই বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। ১৮৬৭ সালে সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৭২ সালে উহার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আসিয়া ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সুবিখ্যাত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে সমাজের প্রথম সম্পাদক-পদ গ্রহণ করেন, পরে বামন আবাজী মোদক সেই পদে নিযুক্ত হন।

সমাজের প্রথম অবস্থায় শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা তাহার উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ হইতে ঐ সমাজ বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। সভ্যগণের যত্ন ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, শ্রমজীবিদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, এই কয়েকটি শুভকার্য্য-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়।

১৮৮২ সালে নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর * (এইক্ষণে যিনি নাইট উপাধিধারী বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি) প্রার্থনা-সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। বর্ত্তমানকালে তিনিই সমাজের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্য্য। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বগুণে প্রার্থনা-সমাজ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল উভয় পক্ষেরই হৃদয়গ্রাহী। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত জষ্টিশ চন্দবারকরের কতক বিষয়ে সহানুভূতি দেখা যায়, কিন্তু আদি সমাজ যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, তিনি সেরূপ নহেন। সমাজ-সংস্কার সাধনে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ এবং অনুরাগ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; সেই সকল শাস্ত্র হইতে যাহা কিছু সদুপদেশ ও সুশিক্ষা লাভ করা যায় তাহা গ্রহণ ও প্রচার করিতে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর। অথচ আবার এই নবযুগে আমাদের এই জাতিবিমর্দ্দিত সমাজ-সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক্ অনুভব করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে সকল অংশ এ কালের অনুপযোগী—যাহা জাতীয় একতাবন্ধনের বিরোধী তাহা সংশোধন করা হয় এই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়,

* ইনি সম্প্রতি ইন্দোরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রের সহযোগিতা চাই, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বনে আত্মমত সমর্থন করা সুসাধ্য নহে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্রের যে সার শিক্ষা - যে শিক্ষা বলে সাম্য মৈত্রী মনুষ্যত্ব প্রশ্রয় পায়, যাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতাবন্ধনের সাধনীভূত, সেই বলপ্রয়োগ করিয়া তিনি সমাজ-সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন। সেই তন্ত্র ধারণ করিয়া জাতীয় বন্ধন স্থাপন উদ্দেশে তিনি আর্য্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া জাতীয় সমিতি আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার এই সাধু চেষ্টা অভিনন্দনীয়। তিনি এই কার্য্যে জয়যুক্ত হউন এই আমার একান্ত কামনা।

আর্য্যসঙ্ঘের আমন্ত্রণপত্র নিম্নে পাদটীকায় প্রকাশিত হইল :—

THE ARYAN BROTHERHOOD.

AN ANTI CASTE CONFERENCE

The following has been issued by the Aryan Brotherhood of Bombay' of which Mr. Justice Chandavarkar is the President.

It is generally felt by the enlightened portion of the Hindu community, and even the orthodox section of it have come to realise, to some extent, that a more sustained and organized effort than has up to now been attempted must be made to correct the evils of certain social customs, which either under cover of Shastras or of immemorial usage, have retarded the progress of the community, and checked the growth of a spirit of union and fellow-feeling among the numerous castes which compose it. Religious bodies and Social Reform Associatians have indeed borne their share in propagating the principles of social reform suited to the requirements of the present times ; and it is due to them, and to the enlightening character of British Rule, that public opinion in the Hindu community regards social reform with greater sympathy now than was the case 20 or 25 years ago.

The main cause of the weakness of the Hindu community is its institution of caste in the form in which it has existed for centuries. On this point no doubt a serious difference of opinion still prevails, but the more thoughtful of Hindus perceive that owing to its innumerable congeries of castes, the community has suffered from disintegrating forces that have sapped its energy and vitality.

This is the root of the social evil ; and it is to it mainly that the propaganda of social reform must now be directed.

With this view the Aryan Brotherhood has been established. By bringing together members of different castes of the Hindu community and setting a practical example in the matter of caste reform, it has initiated a work which, it is hoped, will materially further the cause of solid progress. Towards that end the Aryan Brotherhood has resolved to hold in Bombay a Conference of those Hindus who have recognized the evil of caste and attempted to re-

প্রার্থনা-সমাজের অধীনে শ্রমজীবিদিগের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, মিলের নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতি শ্রমজীবি লোকদের রাত্রে শিক্ষাদান করা এই বিদ্যালয়গুলির কার্য্য। এইরূপ আটটি নৈশ-বিদ্যালয় সহরের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ৩০০র অধিক ছাত্র মারাটী গুজরাটী ইংরাজিতে শিক্ষালাভ করিতেছে।

অন্ত্যজ-জাতীয়দের শিক্ষাদান

এই প্রসঙ্গে অন্ত্যজ-জাতীয় বালক বালিকাদিগের (depressed classes) শিক্ষোপযোগী যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের কথা না বলিলে এই কার্য্য বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকে। সিন্দে যিনি পূর্ব্বে প্রার্থনা-সমাজের প্রচারক ছিলেন, তিনি এই মিশনের প্রধান উদ্যোগী। তিনি ও তাঁহার দুই ভগিনী, যনাবাই, মুক্তবাই, এই শুভকার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় চারিটি; ও বালক বালিকা মিলিয়া বিদ্যার্থীর সংখ্যা চারি শত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আকোলা, অমরাবতী, ইন্দোর প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আহ্লাদের বিষয় যে বোম্বাই অঞ্চলে এই মিসন সভার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে এই সভা তাহার সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং এই অল্পকাল মধ্যে ইহার কার্য্যক্ষেত্র নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার আর্থিক অবস্থাও সন্তোষজনক। স্বর্গীয় ওয়াডিয়া সম্পত্তির ট্রষ্টীগণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই সভায় বার্ষিক ৬০০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ সাহায্যে অধ্যক্ষগণ পারেলে একটি শিল্প-বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুণাক্ষেত্রেও বোর্ডিং শিল্প-বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সভার অধীনে সবশুদ্ধ ২৭ বিদ্যালয়, ১২,০০০র অধিক ছাত্র এবং ৫৭ জন বেতনভূক শিক্ষক আছেন। ছাত্রগণ ছয় ছয় বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। স্থানে

---

form the institution on modern lines by the light of the sacred and humanising principles which form the soul of the teaching of the Vedas, the Upanishads and the *Bhagawad Gita*. These, well-studied and dearly cherished, are fitted more than any other to give the message of *Brotherhood* and *Humanity* needed by the times.

The conference will be held on the 9th November. Leading members of the communty in sympathy with the object of the Conference will be invited to take part in its deliberations. It will consider only the question of caste, its attendant evils and the measures to be adopted for their removal,

স্থানে ভজন-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সাপ্তাহিক উপাসনা ও সময়ে সময়ে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

গত বর্ষে পুণায় এই সকল জাতির একটি প্রাদেশিক সমিতি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ১৭ বিভিন্ন মারাঠা প্রদেশ হইতে অন্ত্যজ-জাতির পঞ্চশাখাভুক্ত সবশুদ্ধ ৩০০ লোক সমবেত হইয়া এই সভার কার্য্যে উৎসাহপূর্ব্বক যোগদান করেন। দুই দিন এই সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে পুণায় নারীমণ্ডলীর যে একটি সভা হয়, শ্রীমতী রাণাডে-পত্নী তাহার অধ্যক্ষতা করেন। তথায় অন্ত্যজ-জাতীয় প্রায় দুই শত স্ত্রীলোক এবং শতাধিক উচ্চকুল-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই সমবেত বিমিশ্রবর্ণ নারীকুলের পরস্পর সদ্ভাবে মেলা মেশা ও মিষ্টালাপ— ইহা পুণা-সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। সাতারায় এইরূপ আর একটি সমিতি আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইতেছে ও সেখানকার প্রার্থনা-সমাজের সভ্যগণ এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী।

এই সভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সর্ব্বসমেত ৮৫০০০ টাকার প্রয়োজন; তাহার মধ্যে মহারাজা তুকোজী হোলকর প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাই হোলকরের নামে পুণায় একটি অন্ত্যজ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। অতিরিক্ত যে টাকার প্রয়োজন বোম্বায়ের ধনকুবেরগণ স্বীয় ধন-কোষ মুক্ত করিয়া সে অভাব মোচন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রার্থনা-সমাজ যদিও 'ব্রাহ্ম' নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তথাপি ইহার মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই অনুযায়ী। সমাজের কোন দীক্ষিত উপাচার্য্য নাই, সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সুবক্তা ও ধর্ম্মোপদেশে সক্ষম তাঁহারাই অবকাশমতে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের শাখা প্রশাখা প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে বিস্তৃত দেখিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইত। আহমদাবাদ যেখানে আমি প্রথমে যাই, সেখানকার সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন ভোলানাথ সারাভাই। মহীপত রাম রূপরাম তাঁহার সহযোগী। মহীপত রাম ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করেন, বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি হিন্দুসমাজ হইতে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিলেন; ভোলানাথ ভাই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া এই সকল অত্যাচার নিবারণে সাহায্য করেন। এই দুই বন্ধু মিলিয়া সমাজের কার্য্যারম্ভ করেন এবং অন্যান্য কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম সেই কার্য্যে যোগ দেন। আমি যখন আহমদাবাদে ছিলাম, দেখি ভোলানাথ ভায়ের যত্নে ও উৎসাহে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজ খুব জমকিয়া উঠিয়াছে। আমিও তাহাদের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিয়া তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনে সচেষ্ট ছিলাম। উপাসনার সময় ভোলানাথ প্রণীত প্রার্থনা-

লালশঙ্কব উমিয়াশঙ্কর (২৫৯ পৃষ্ঠা)

মালা ব্যবহারে আসিত ও তাঁহার রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইত, আর আমাদের বাঙ্গলা সঙ্গীত অনুবাদ করিয়া গাওয়া হইত। আমার মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় আমার ওখানে গিয়া দিন কতক ছিলেন। সমাজে আমরা দুই ভায়ে মিলিয়া সমস্বরে গান করিতাম। ১৮৮৬ সালে ভোলানাথ ভাই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, যেন নগরের একটি উজ্জ্বল দীপ নির্ব্বাণ হইল। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আহমদাবাদ হইতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যুর পর মহীপত রাম সমাজের সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। মহীপত রাম পরলোকগত হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রমণভাই ও পুত্রবধূ সমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মহাত্মার নাম উল্লেখযোগ্য—লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর। ভোলানাথ ভায়ের পর ইনি আহমদাবাদ প্রার্থনা-সমাজের নেতৃদলের মধ্যে গণ্য। সম্প্রতি তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। লালশঙ্কর একজন স্বদেশের পরম হিতৈষী সাধুপুরুষ ছিলেন। দেশহিতকর এমন কোন সৎকার্য্য ছিল না যাহার অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহের সহিত যোগ না দিতেন। তিনিই পণ্ডরপুর অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্ম-সমাজের অগ্রণী, সুরাপান নিবারণী সভার প্রধান উদ্যোগী, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনে তিনি সতত যত্নবান ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদবশতঃ যদিও হিন্দুসমাজ তাঁহাকে স্বীয় গণ্ডীর ভিতর স্থান দিতে সঙ্কুচিত হইত তথাপি তিনি সকলকেই তাঁহার ভ্রাতৃ-আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র জাতিনির্ব্বিশেষে এত প্রসারিত ছিল যে তিনি আপামর সকল লোককেই আপনার জালে আকর্ষণ করিতেন, কাহাকেও আপনা হইতে দূরে রাখিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা সরল সাধু-চরিত্রগুণে সকলেরই চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না, সকলকেই তিনি মিত্ররূপে বরণ করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে প্রার্থনা-সমাজ, এমন কি গুজরাটের সমগ্র হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গুজরাটে যে ব্রহ্মোপাসনার বীজ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতেছে; কালক্রমে ফলবান্ বৃক্ষরূপে সমুত্থিত হইবে, এরূপ আশা করা দুরাশা নহে।

সাতারা, যেখানে আমার সর্ব্বিসের শেষ ভাগ অতিবাহিত হয়, সেখানেও একটি প্রার্থনা-সমাজ ছিল। সেখানকার কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিয়া সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ও তাহার সাম্বৎসরিক উৎসবে বোম্বাই পুণা প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরের লোকেরও সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে একটি সুগায়ক ইহুদী-ব্রাহ্মকে আমার বেশ মনে পড়ে। চিন্তামণ নারায়ণ ভট, আমার একটি বন্ধু, এই সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেন। সমাজ-সংস্কার-ব্রতী উন্নতিশীল যুবকবৃন্দের তিনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।

শুধু মুখে নয়, অনুষ্ঠানেও তিনি তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। হায়, তিনিও আর এক্ষণে নাই।

পুণা প্রার্থনা-সমাজের অধিনায়ক আমাদের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক, ডাক্তার ভাণ্ডারকর। তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তবলে সেখানকার সমাজ উন্নতির মার্গে পরিচালিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডারকর যতদিন হাল ধরিয়া আছেন, ততদিন সে সমাজের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনা নাই। এক দিকে যেমন ভাণ্ডারকর, অন্য দিকে তেমনি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পত্নী স্ত্রী-মণ্ডলের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। পুণা-সমাজে তিনি তাঁহার মৃত পতির সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী। উচ্চশ্রেণী বালিকা-বিদ্যালয়, বিধবাশ্রম প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান স্ত্রীদিগের শিক্ষা ও উন্নতির কল্পে পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া যোগ্যতাসহকারে কার্য্য চালাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে এমন কোন সৎকার্য্য নাই যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন।

সিন্ধু দেশেও ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। হাইদ্রাবাদে তাহার গোড়া পত্তন করেন—নবলরাও আড়বাণী। আমি সে সময়ে হাইদ্রাবাদে ডিষ্ট্রিক্ট জজের কর্ম্ম করি এবং নবলরাওকে তাঁহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করি নাই। তাঁহার বিনয় নম্রতা ও সাধুতাগুণে সিন্ধিরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। জেলের কয়েদীদের মধ্যে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার অনুমতি আনাইয়া তিনি প্রতি সপ্তাহে জেল পরিদর্শনে যাইতেন। সেখানে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনাদির সুফলও ফলিয়াছিল। নবলরাওয়ের পরবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার ভ্রাতা হীরানন্দ। ইনি কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস ও নববিধান শাখার সংস্রবে আসিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইহার ন্যায় পরোপকারী সেবাপরায়ণ নির্ম্মল চরিত্র সাধুপুরুষ ঐ প্রদেশে অতি বিরল। সাধু হীরানন্দের স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত ও-অঞ্চলে জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যক্ষেত্র করাচীতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধ্যাপক বসওয়ানী কিয়ৎকাল করাচী-সমাজের কার্য্য করেন, সম্প্রতি তিনি পঞ্জাবে দয়ালসিং কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া লাহোর গিয়াছেন। মোটের উপর সিন্ধু দেশে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে।

বোম্বায়ের প্রার্থনা-সমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে ওখানকার আধুনিক ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার চেষ্টা কিছু কিছু জানা যাইতেছে। প্রার্থনা-সমাজ অবশ্য আপন সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিতেছে কিন্তু বিরাট হিন্দুসমাজে তাহা বিন্দুমাত্র। তাহার প্রভাব কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদ্র বলিয়া তাহা হেয় নহে। কোন

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

(২৬০ পৃষ্ঠা)

রমাবাই রাণাডে
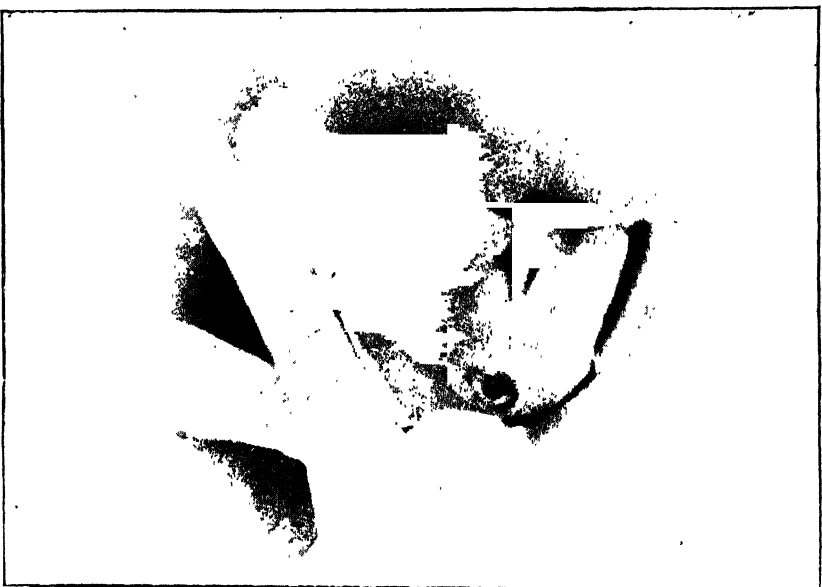
অল্পসূত্র হইতে কি বৃহৎ কার্য্য প্রসূত হয় তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিয়তই পাঠ করা যায়। আমরা অদূরদর্শী, বিশ্ববিধাতার কার্য্যপ্রণালীর সকল দিক্ দেখিতে পাই না, সুদূর পরিণাম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেবল এ কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় যে ঈশ্বরের রাজ্যে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, যাহা সত্য মঙ্গল তাহা স্থায়ী, যাহা অসত্য শীঘ্রই হউক্ বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই তার পতন। যেমন গীতা বলিয়াছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" যাহা অসৎ তাহা নশ্বর—যাহা সৎ তার বিনাশ নাই।

বোম্বাই সমাজে যে সকল শক্তি অলক্ষিতভাবে কার্য্য করিতেছে, প্রার্থনা-সমাজ তাহার অন্যতর। আর আর শক্তির কার্য্য কতক আমাদের বোধগম্য, কতক বা দৃষ্টিবহির্ভূত। যাহা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা ভারতের সর্ব্বত্রই সমান—সে হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষ, পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোক-কিরণ, এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। এই শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কত না পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভবিষ্যতেও কিরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইবে তাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার মনে হয় আমাদের সকল প্রকার সামাজিক রোগের মহৌষধ—নরনারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। আমাদের গোড়ার অভাব সেই শিক্ষার অভাব। লোক সাধারণে শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা—বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ-সংস্কার চেষ্টা সর্ব্বৈব ব্যর্থ হইতেছে। শিক্ষা চাই, শিক্ষা চাই, এই আমাদের আর্ত্তনাদ। যাহা হইয়াছে তাহা অল্পই, আরো অনেক দরকার। এই কারণেই হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। তবে এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই হিন্দু য়ুনিবার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা যেন সব দিক দেখিয়া উদারভাবে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারা যদি কালস্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, যে সকল কুসংস্কার হইতে আমরা বহু তপস্যায় মুক্তি লাভ করিয়াছি, সে সকলকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন, যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম আমাদের জাতীয় একতার বিরোধী, জাতীয় উন্নতির প্রত্যবায়—সে সমস্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে এই য়ুনিবার্সিটি স্থাপনের ফল হিতে বিপরীত হইবে। ঘড়ির কাঁটা উল্টা দিকে ফিরাইতে গেলে ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এই য়ুনিবর্সিটি চালাইবার ভার লইবেন তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে শাস্ত্র অপেক্ষা সত্য গরীয়ান্, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যেন সত্যের অবমাননা না হয়, ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামি প্রশ্রয় না পায়।

বোম্বাই ও বাঙ্গলা দেশ

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমি বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আমার কর্ম্মস্থান কেন পছন্দ করিলাম? তাহাব উত্তর এই যে বঙ্গদেশ নির্ব্বাচনের অধিকার আমার আদৌ ছিল না। পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদের মধ্যে যে শ্রেণীতে যাহার নাম সেই অনুসারে তাহার নির্ব্বাচন ক্ষমতা; আমার নাম যেখানে পড়িয়াছিল তাহাতে আমার বাঙ্গলা দেশ লইবার অধিকার হইল না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই দুয়ের মধ্যে বাছিয়া লওয়া, এইটুকু আমার অধিকারের সীমা, এই দুয়ের মধ্যে আমি বোম্বাই বরণ করিলাম। তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার বিশ্বাস যে বাঙ্গলা দেশের তুলনায় বোম্বায়ের আবহাওয়া উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্মকালে দুই তিন মাস যা গরম ভোগ করিতে হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য যেখানে আমি অনেক বৎসর ধরিয়া বাস করিয়াছি সেখানে সকল ঋতুই উপভোগ্য। বর্ষার ত কথাই নাই। গ্রীষ্মকালও কষ্টদায়ক নহে। তা ছাড়া বোম্বাই মফস্বল কোর্টের গ্রীষ্মাবকাশের যে নিয়ম তাহাতে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহকাল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে অনায়াসে দূরে থাকা যায়। বোম্বায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া ধার্য্য। শীতের সময় নিজ বোম্বাই সহর, বর্ষায় পুণা, গ্রীষ্মে মহাবলেশ্বর—গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপুরুষেরা এই তিন স্থানে পালায় পালায় অধিবেশন করেন। আমরা অনেক সময় গ্রীষ্মকালে মহাবলেশ্বর পাহাড়ের আশ্রয় লইতাম। সে অতি মনোরম স্থান। পশ্চিমঘাট শ্রেণীর মধ্যে অনেক সুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয় কিন্তু মহাবলেশ্বর সকলের সেরা। এই পর্ব্বতের শিখর পঞ্চনদীর আকরস্থান। তথায় মহাবলেশ্বর নামে শিব মন্দির আছে, তাহা হইতেই এই পাহাড় স্বনাম গ্রহণ করিয়াছে। এই পাহাড় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিহার ভুমি, ইহা ৫০০০ ফীট উচ্চ বৈ নয়। আসামের শৈলনিবাস সিলঙ যত উঁচু এও তার সমান উঁচু; সম্ভবতঃ এই দুই পাহাড়ের শোভা-সৌন্দর্য্যও এক প্রকার। আমি নিজে সিলঙ দেখি নাই কিন্তু সে দিকে বেড়াইতে গিয়া আমার কন্যা সিলঙের যা বর্ণনা করিয়াছেন তা মহাবলেশ্বরেও ঠিক খাটে। তিনি লিখিতেছেন, "ছোট খাটোর মধ্যে সবই বেশ নিট্‌নাট্ ফিট্‌ফাট্ যেন বড় মানুষের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির বিরাট বা দুর্দ্দান্ত ভাব নেই, এখানে তিনি গৃহিণীরূপে মানুষের মত ঘরকন্না সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। দৃশ্যের খুব গাম্ভীর্য্য না থাক্ সৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে। লাল লাল রাস্তা বেড়াবার বেশ সুবিধা। পাঁচ হাজার ফীট উঁচু সুতরাং বেশী ঠাণ্ডাও নয়।" মহাবলেশ্বরের ভাবও অবিকল এইরূপ। দেখিতে যেমন সুন্দর, বেড়াইবার স্থানও

মহাবলেশ্বর (২৬২ পৃষ্ঠা)
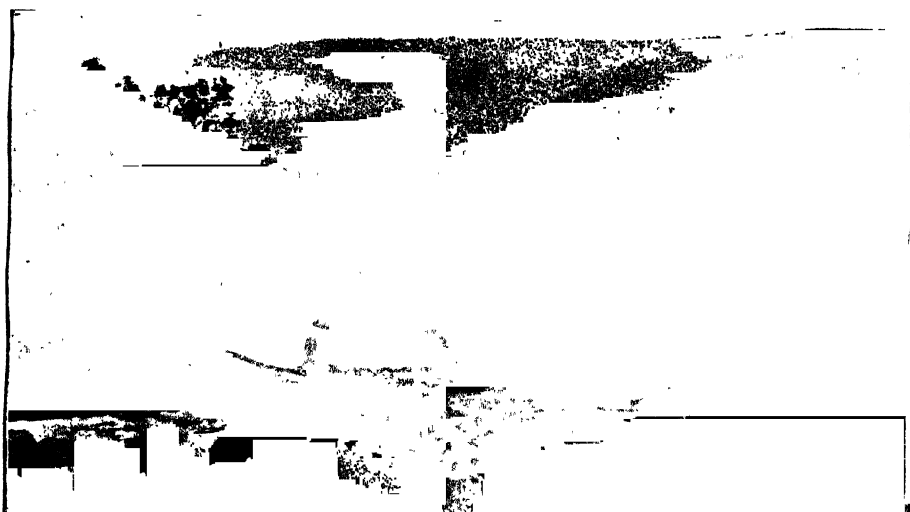
অপর্য্যাপ্ত পড়িয়া আছে। গাড়ী চলাচলের কোন বাধা নাই, আবহাওয়া শীতোষ্ণের মাঝামাঝি। সুন্দর লাল রাস্তা, বিপণি, বাঙ্গলা, উদ্যান পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া আছে। উপরে সমান জমি এত আছে যে ঘরে থাকিয়া পাহাড়ে বাস করিতেছি মনেই হয় না। পাহাড়ের শোভা দেখিতে গেলে এক এক প্রান্তে গিয়া দেখিতে হয়—এক এক Point যেমন Tiger point, Sidney point, Elphinstone point ইত্যাদি এক এক কোণ হইতে পার্ব্বত্যশোভা নব নব মূর্ত্তি ধারণ করে। কোনখানে গাছপালা-শূন্য কঠোর পর্ব্বতশ্রেণী। কোন পাহাড় "বপ্রক্রীড়া পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়।" কোন কোন পাহাড় দুস্তর বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাতালে নামিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে প্রতাপ-গড়ের পাহাড় বনরাজির মধ্য হইতে গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের উপর শিবাজী রাজা দুর্গ বাঁধিয়া বাস করিতেন। মহাবলেশ্বরের মত সুন্দর সুগম স্বাস্থ্যনিবাস এদেশে অল্পই পাওয়া যায়, কেবল বৃষ্টির আধিক্যবশতঃ বর্ষায় কয়েক মাস উহা বাসযোগ্য নহে।

আমাকে অনেকে খোঁটা দিতেন, বিদেশে সমস্ত জীবনটা চাকরী করে কাটানো কি ঝকমারি,—তার চেয়ে স্বদেশে কেরানীর কাজ করাও ভাল।" কিন্তু বিদেশে চাকরী করিবার যেমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, তেমনি সুবিধাও বিস্তর। আত্মীয় স্বজন হইতে সুপারিসের দরখাস্ত আসে না, সেই এক মহৎ লাভ। বিচ্ছেদের পর মিলনের আনন্দ সে কি কম? স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র স্থাপন করিবার অবসর পাওয়া সেও কি সামান্য লাভ? যতদিন আমি ওদেশে ছিলাম, মনে হইত বোম্বাই বাঙ্গলা যেন একটি যোগসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে আমার পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্য হইতে একটা লোকের স্রোত একটানা বহিতেছিল, তাহাদের যাওয়া আসার বিরাম ছিল না। ইহাতে এই দুই দেশের লোকদের পরস্পর সখ্যবন্ধন হইবার দিব্য সুযোগ হইত। আমি ও-দেশে থাকিয়া বোম্বাই বাসীদিগের যে সকল সদ্‌গুণ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম—আর আমার যা দিবার তা দিতেও সক্ষম হইলাম। আমি যেখানেই কর্ম্ম করিতাম, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চার হয়, সে বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটি করি নাই। আমার এইরূপ কর্ত্তব্য সাধনের যে পুরস্কার তাহাও যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, আমার আত্মপ্রসাদ আর লোকের প্রসাদভাজন হওয়া এ দুইই আমার লাভ হইয়াছিল। কালক্রমে বোম্বাই আমার নিজের দেশ হইয়া গেল—সেখানকার অধিবাসীদের আতিথ্যসৎকারে তাহা আমাদের বিদেশ বলিয়া মনেই হইত না।

উপসংহার

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে সিবিলিয়ন ও অপরাপর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব ও হৃদ্যতার অভাব ছিল না। ইংরাজমহিলাদের সঙ্গেও আমাদের সর্ব্বদা দেখাশুনা মেলামেশা হইত। একসঙ্গে টেনিশ খেলা, ভোজনগৃহে একত্র মিলন, মফস্বল ষ্টেশনে ইংরাজদিগের যে সমস্ত সমাজ-বন্ধনের নিয়ম, আমরাও সেই গণ্ডীর অন্তর্ভূত ছিলাম। ইহারা কেহই আমার সম্বন্ধে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি ভদ্রব্যবহারের ক্রটি করেন নাই। ইংরাজি-ক্লবের প্রবেশদ্বার আমার জন্য মুক্ত ছিল—এমন কি সোলাপুর ক্লবের প্রেসিডেণ্টরূপে আমি কয়েক বৎসর কার্য্য করি। কিন্তু এই যে দেশী ও ইংরাজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এ কেবল আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। সাধারণতঃ দেশী ও আঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ তেমন সন্তোষজনক বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে যে বৃহৎ প্রাচীর পরস্পরকে বিযুক্ত রাখে তাহা উল্লঙ্ঘন করা সহজ নহে। তার অনেকগুলি কারণ আছে :—

প্রথম।—যা কথায় বলে East is East, West is West—পূর্ব্ব সে পূর্ব্ব, পশ্চিম সে পশ্চিম; তাদের বিধাতাদত্ত প্রকৃতিগত যে পার্থক্য তাহা ঘোচাইতে পারে কাহার সাধ্য? তাছাড়া ইংরাজেরা রাজার জাতি, আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। তার উপর 'এক গোরা এক কালা'। আবার এই বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম্ম সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বৈদিককালে আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণে যে বিষম বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, বেদের মধ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়।—ইংরাজেরা এদেশে চারিদিনের যাত্রী। অর্থোপার্জ্জনের জন্য এদেশে আসা এবং টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাওয়া। তাঁহাদের শরীর এক দিকে, মন অন্য দিকে। বিশেষতঃ ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের এমন সুবিধা হইয়াছে যে, তাহাতে এদেশের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। আগেকার কালে দেশীয়দের উপর এক একজন ইংরাজের সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত। তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিককাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আর সেভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বিহরে সুখে প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।"

তৃতীয়।—ইংরাজের স্বভাব কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। তাঁহারা আপনাদের
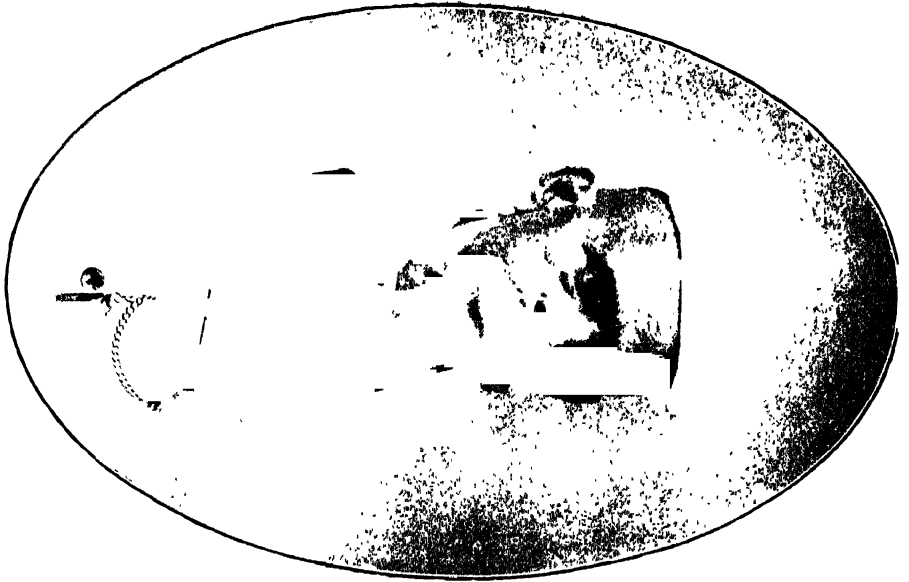
জাতীয় ঔদ্ধত্য—John Bull ভাব কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের কবি যেমন স্বজাতির বর্ণনায় বলিয়াছেন তাঁহাদের দেখিয়া কাহার না মনে হয়—

চলন গরবে ভরা, ধরা সরা গণে,
পৃথিবীর পতি যেন চলে উৰ্দ্ধাননে !

Goldsmith.

আর এক কথা এই এখানকার অধিকাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কৰ্ম্মচারী, তাঁহাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুবিধা হয় না। বোম্বায়ের মত সহরে যাহাই হউক, মফস্বল ষ্টেসনে ওরূপ হওয়া অসম্ভব। এই সকল নানা কারণে আমাদের উভয়তঃ যে বিচ্ছিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা অপসারিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমাদের সম্রাট জর্জ যুবরাজ থাকিতে যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তিনি ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছিন্নভাব দর্শন করিয়া ব্যথিত হন, ও দেশে ফিরিয়া গিয়া বলিয়া পাঠান যে সহানুভূতি (Sympathy) ব্রিটিশ রাজনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এই Sympathy কি কেবল কথার কথা, কাৰ্য্যত কখনই দেখা দিবে না? তাহা কে বলিবে? এক সময় আমাদের যাহা অসাধ্য মনে হয় বিধাতা তাহা কালেতে সুসাধ্য করিয়া দেন। কালক্রমে এই দুই জাতির অধিকতর চেনা পরিচয় হইলে কি হয় কে বলিতে পারে? ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই সংঘটন করিয়াছেন। ইহা শুধু শক্তির লৌহবন্ধন না হয়—প্রীতির বন্ধন হওয়াই সৰ্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু এই উদ্দেশে উভয় জাতিরই যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। উভয়ের পরস্পর সহানুভূতি ও সাহায্য চাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা যেন মনে রাখেন যে তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন, আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। প্রেমদান করিলেই তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়। যেমন উদারচরিত Andrews সাহেব বলিয়াছেন :—

"একটি বড় আশ্চৰ্য্যের বিষয় এই,—আমি নিজের মনেও এখনো পৰ্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা সত্য যে, কোন কোন অসাধারণ মনীষী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, যাঁহারা এদেশের জীবনের মৰ্ম্মস্থলে তৎক্ষণাৎ যেন সহজ জ্ঞানের দ্বারা প্রবেশ লাভ করেন, প্রেমের দ্বারা তাহার সহিত এক হইয়া যান। এই যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়ের উদ্রেক তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। ভগ্নী নিবেদিতা এই দলের একজন ছিলেন; চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত রথেনষ্টাইন আর একজন। ভারতবাসীগণও তৎক্ষণাৎ এই সহজাত প্রীতির প্রতিদান

করেন। প্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রেমের আহ্বানে সায় দেয়। এই যে প্রচ্ছন্ন ভালবাসা এক মুহূর্তেই জ্বলিয়া উঠিতে প্রস্তুত, ইহা সুষুপ্ত মনের কোন্ গভীর প্রদেশে থাকে? মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম! কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপের মূলগত ঐক্য ইহা দ্বারা সূচিত হয়, এবং ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে আমাদেব পূর্ব্বপুরুষগণ এক বংশজাত ছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এমন অবিলম্বে, এমন অভূতপূর্ব্বভাবে এই আত্মীয়তা অনুভব করিয়া থাকি।"*

ভারতবর্ষের প্রতি প্রেম ও মমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগেকার কালে ডেভিড হেয়ার ও একালে অ্যালেন হ্যুম এই দুই মহাত্মারও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; একজন আমাদের বিদ্যাগুরু, অন্যজন রাজনৈতিক মন্ত্রদাতা। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল সহৃদয় মহাত্মা আমাদের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করেন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইয়া আত্মীয়ভাবে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত। ভারতবন্ধু হ্যুম সাহেবের মৃত্যুতে আমাদের হৃদয়ের গভীর শোকোচ্ছ্বাস কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে না? তাঁহার ন্যায় উদারচেতা মমতাবান্ কর্ম্মবীরেরাই এই বাঞ্ছনীয় মিলন ঘটাইবার পক্ষে অনেক করিতে পারেন। নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, কেননা পূর্ব্বপশ্চিমে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে এমন একটা স্থান আছে যেখানে এই সমস্ত ভেদাভেদ বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা এই শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥

এ নিজ এ পর লঘুচেতাদের এইরূপ গণনা; উদারচরিত যাঁহারা, তাঁদের আত্মপর নাই, বসুধাই তাঁহাদের কুটুম্ব সমান।

---

* With Ravindranath in England—Modern Review for January 1913.